রামনাথের পৃথিবী

শ্যামসুন্দর বসু

প্রথম প্রকাশ ঃ অগাস্ট, ১৯৯৭

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

লেজার টাইপসেটিং ঃ
কম্প-অ্যাক্ট
সল্ট লেক সিটি
কলকাতা ৯১

মুদ্রক ঃ
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭২

উৎসর্গ

এই গ্রন্থের সকল প্রেরণার উৎস

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে—

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথকে আমরা বলি বিশ্বপথিক। ঠিকই বলি। তবু তিনি একা নন, আর একজন বাঙালীও ছিলেন তাই। তিনি বলতেন, 'নূতনের পূজারী আমি, লক্ষ্য শুধু পথ।' এই পূজারী-পথিকের নাম রামনাথ বিশ্বাস। মনে দুর্জয় সাহস আর বাহন হিসেবে একটি সাইকেল নিয়ে তিনি পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরেছেন। সেই ভ্রমণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তাঁর অনেকগুলি বইয়ে। কামাল পাশা যে অভিনব তুরস্ক গড়ে তুলেছিলেন, তার পরিচয় বাঙলা ভাষায় প্রথম পাই রামনাথ বিশ্বাসের 'তরুণ তুর্কি' বইয়ে। আজ যে চীন ১৯৪৯ সাল থেকে দাপটে নতুন রাজ্য গড়ে তুলেছে, সারা পৃথিবী যার দিকে পরম বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় তাকিয়ে আছে, তার সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ওই রামনাথ বিশ্বাসই; তার 'মরণ বিজয়ী চীন' এবং 'লাল চীন' নামক দুখানি বইয়ে।

এই জীবনী গ্রন্থের লেখক শ্যামসুন্দর বসু প্রচুর পরিশ্রম করেছেন রামনাথ বিশ্বাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে। তিনি বিভিন্ন উপাদান নানা সূত্র থেকে সংগ্রহ তো করেছেনই, উপাদানের সঙ্গে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন নানা ক্ষেত্রে। এমনকি লেখক বিশ্বাস মশায়ের জন্মভূমি সিলেটের বানিয়াচং গ্রামেও গিয়েছেন নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। এই গ্রন্থ রচনায় লেখক যে পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় দেখিয়েছেন, তা অতুলনীয়। পথিকৃত এই বিশ্ব ভ্রমণকারীকে আমরা ভুলতে বসেছি। লেখক বহু অজ্ঞাত তথ্য বিপুল পরিশ্রমে সংগ্রহ করে আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই উপহার আজকের বঙ্গবাসী সানন্দে গ্রহণ করবে এ আমার স্থির বিশ্বাস।

অমিতাভ চৌধুরি

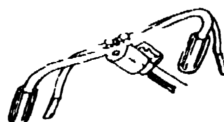
লেখকের কথা

কিছুমাত্র না চেনা না জানা রামনাথ বিশ্বাসকে খুঁজতে নেমে কেমন করে যেন টের পেয়ে গিয়েছিলাম সমুদ্র-বিশাল রত্নখনির। চাপা পড়া সেই বিস্ময়কর দ্যুতিকে মেলে ধরবার অসম্ভব জেদ আমাকে তাড়া করে ফিরেছে প্রায় তের বছর ধরে। কারণ, সহজে পাওয়া তথ্যের একান্ত অভাব। এই দীর্ঘ সময়ে হারিয়েছি জীবনের অনেক মূল্যবান কিছু। হেলায় অবজ্ঞায় ফিরিয়ে দিয়েছে বহু মানুষ। আমি কেবল যা থেমে পড়িনি। হতে পারে এই বাধাই আমার সঙ্কল্পকে করেছে আরও জোরদার। পরে মনে হয়েছে, দুঃখের কিছু নেই। কেননা, কাজের গুরুত্ব অনুভব করে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক হলেও, কয়েকজন তো বুকে জড়িয়ে ধরে সাহায্য করেছেন, অকৃপণভাবে। চিরঋণী রইলাম উভয় পক্ষের কাছেই।

মূলতঃ যে পাঠাগারগুলি আলোর কিরণে তিলে তিলে সাহায্য করেছে - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জাতীয় গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরী, রামমোহন লাইব্রেরী, হাওড়া ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী ও ঢাকা বাঙলা একাডেমী। এছাড়া 'বনিয়াচং' গ্রামবাসীদের মন ভুলানো প্রাণ জুড়ানো সরলতায় ভরা সেই সহযোগিতা কি ভোলা যায়!

'রামনাথের পৃথিবী' মূলতঃ জীবনমূলক হলেও এর ধরণটা যেমন আলাদা, বহুমুখী ভাব বৈচিত্র্যও তেমনি লক্ষণীয়। এখন সব ঠিক্‌ঠাক্‌ তারে বাঁধা হোল কি না, এবং তার থেকে যথাযথ রস-সমৃদ্ধ সুরঝঙ্কার বেজে উঠতে পারল কি না, সে বিচারের ভার অবশ্যই সহৃদয় পাঠক পাঠিকা ও মহাকালের হাতে। আমি কেবল ফলশ্রুতির অপেক্ষায় থাকতে পারি।

শ্যামসুন্দর বসু



এই ধরাধামে মানুষ একে অপরের খোজ খবর নিয়ে জানতে চায় তার পরিচিতি। উৎসুক হয় আরও বেশ কিছু ব্যাপার স্যাপারে। কিন্তু পৃথিবীর সাথে জানপহচান করার অন্তরঙ্গতা দেখায় ক'জনা? যারা তা চায়, ভ্রমণের নেশা তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে পাগল করে তোলে। দুর্দমনীয় সেই জিদ্দিবাজ ডাকাবুকোরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে দুনিয়াদারির ছড়ি হাতে। দেখা ও দেখানোর গুণে আমাদের চোখে হন বরণীয়, পূজনীয় ও স্মরণীয়।

—"যা আমরা জানি না বা জানতে চেষ্টাও করি না, তাই হয় রহস্য এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা। বিষয়টা ঠিকভাবে জানতে পারার পরে কোনো রহস্যই আর রহস্য থাকে না। সেটি ততক্ষণই রহস্য থাকে, যতক্ষণ তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবিত ও উন্নতিশীল জাতির প্রাণশক্তির লক্ষণই হল, সমস্ত ব্যাপারকে খুঁটিনাটি করে জানবার প্রবল ইচ্ছা ও চেষ্টা। আর যে জাত ধ্বংসোন্মুখ ও জড়তাপ্রাপ্ত, সেই জাতের মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা মরুভূমিতে পরিণত হয়। কোনো সন্দেহ নেই, অলস মুমূর্ষু জরাগ্রস্ত জাত আপনার অচলায়তনে চুপচাপ বসে থাকে।

আমার ঘর থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল, দু'চোখ ভরে পৃথিবীকে দেখা, নিজের দেশকে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করা এবং হাজারো মানুষকে নানা কোণ থেকে জানার প্রবল আকাঙ্খা। এই মহৎ কাজে অসংখ্যভাবে দমে যাওয়ার পরিবেশ তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত অদম্য ইচ্ছার কাছে সকলি পরাভূত হয়। পর্যটন আরম্ভ করে যিনি মতিভ্রষ্ট হন, তাঁর মাঝ দরিয়ায় নৌকা ডুবিয়ে ঘরে ফিরে আসা ছাড়া কিছুমাত্র উপায় থাকে না এবং স্বাভাবিকভাবেই মিথ্যার বেসাতি করতে প্রবৃত্ত হন। সত্যিকারের পরিশ্রমের কাছে সকলেই মাথা নত করতে বাধ্য হয়। মনেপ্রাণে যে কাজ

করা যায়, তাতে শত্রুও সায় দেয়।" পৃথিবীর উদার আঙিনায় দাঁড়িয়ে, দ্বিধাহীনচিত্তে একথা ঘোষণা করতে পেরেছিলেন—সীমাহীন জিজ্ঞাসু, মুক্তমনা ও দুঃসাহসিক বাঙালি বীর রামনাথ বিশ্বাস।

প্রাচীন প্রবাদ, বড়ো মাপের মানুষ জন্মাবার সময় আকাশ থেকে ধেয়ে আসে উল্কা বা তারার অংশ, পৃথিবীর মাটিতে। শেকসপীয়রও একথার সদ্ব্যবহার করেছেন। রামনাথের জন্মের দিন তারা খসেছিল কি আকাশে ধুমকেতু দেখা দিয়েছিল, এ তথ্য অবশ্য জানা নেই। তবে ধরিত্রীদেবী বোধহয় ঘোষণা করেছিলেন, 'ঐ আসে বাঙলার কৃতি এক উপহার।'

হেমন্তের মিষ্টি-মধুর ছোঁয়ায় গ্রাম বাঙলার ঘরে ঘরে চলছে তখন উৎসবের প্রস্তুতি। ঝকমকে রোদ প্রকৃতির বুকে মেলে ধরেছে তার অফুরন্ত আলো। তারিখটা ছিল ২৯ শে পৌষ, শুক্রবার বাংলা ১৩০০ সন। এমন দিনে সৃষ্টি রহস্যের পদ্ম মেলে ধরল তার দল। পুরোপুরি সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে মঙ্গলধ্বনির মধ্যে জন্ম নিল বড়ো আশ্চর্য রকমের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার মানুষটি। বাংলা মতে শুক্রবার হলেও জন্মসময় রাত্রি গতে ভোরের বেলায় হওয়ার জন্যে ইংরাজি অনুযায়ী হবে শনিবার, ১৩ই জানুয়ারি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ।

শনিবার। ১৮৯৪ এর ১৩ই জানুয়ারি। একশ বছরের বেশি আগেকার এই জন্মদিনটিকে স্মরণ করতে অতীতের ধূলিমলিন পৃষ্ঠা থেকে খুঁজেপেতে আনা যাক কিছু ঘটনা। আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি 'ধান ভানতে শিবের গীত' মনে হলেও আসলে তা ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সেই সময়ের, সেই দিনটির মূল্যবান দলিল—সাক্ষ্য।

এই দিনের অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় শিরোনামা ছিল : —

"THE OFFICIALS AND HINDU RIOTS"

পরের বক্তব্যটুকু বাংলা করলে দাঁড়ায়—

"সচরাচর যা হয়ে থাকে, অধস্তন মিঃ চার্লস ক্রস্‌থওয়েট এর নিকট হতে একপেশে সারমর্ম গ্রহণ করে আগ্রাতে বক্তৃতা দেন মহামান্য 'ভাইসরয়'। যে বক্তৃতায় তিনি উত্তর-পশ্চিম রাজ্য সরকারের 'অ্যান্টি হিন্দু পলিসি'কে সমর্থন করেন তথাকথিত নিরপেক্ষতাব অসাব যুক্তি দিয়ে। এই সরকারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কুকীর্তিকে সমর্থন ক'রে এবং হিন্দুদের সবরকমে নিন্দা ক'রে তাঁর ভাষণের সংক্ষেপিত রূপ ইংলন্ড পর্যন্ত পাঠানো হয়। কিন্তু গত মঙ্গলবার স্যার চার্লস এলিয়টের যে সার্কুলারটি আমাদের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি, অকুণ্ঠভাষায়। কেন? কারণ, স্যার চার্লস ক্রস্‌থওয়েটের নীতি যেখানে ভারতবর্ষের সামন্ততন্ত্রকে চিরস্থায়ীত্ব দিতে পারে; সেখানে, স্যার চার্লস এলিয়টেব পরামর্শ পালন করলে বাংলাদেশে বরাবরেব জন্য জাতিদাঙ্গা বন্ধ হতে পারে।

উত্তর-পশ্চিম রাজ্যে এর মূল কারণটাকে লুকোবার চেষ্টা করা হয়েছে; বাংলায় তা শুধু খুঁজে বার করার চেষ্টাই হয়নি, অপসারণের জন্য উঠেপড়ে লাগা হয়েছে। উপরোক্ত রাজ্যে অপরাধীকে সমর্থন করে নিরপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হয়। অথচ, বাংলায় মূল অপরাধীদের ধরে নিরীহ জনসাধারণকে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা। এইভাবে একই দেশের দুই রাজ্যের রাজ্য শাসন প্রণালীর পার্থক্য দেখা যায়। বসন্তপুর জাতি দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে উপরোক্ত রাজ্য খুবই চেষ্টা চালায় যাতে বাংলা তাদের পথ অনুসরণ করে। তা কিন্তু হয় নি। এখানে সমুচিত শাস্তিমূলক ন্যায়বিচার নেমে আসে ষড়যন্ত্রকারীদের ওপর। নিরপরাধরা পায় নিরাপত্তা এবং মানবিকতার হয় জয়। সভায় গৃহীত ষষ্ঠ সিদ্ধান্তের সমর্থনে বাবু এ.সি. মজুমদার নবম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যে বক্তব্য রাখেন, তা এদিনের সংবাদপত্রগুলিতে বের হয়।"

এসময় মূলতঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা আইন-আদালতের খবরে সংবাদপত্রগুলির একটি পাতা গরম হয়ে থাকত। তেমনই একটি, হাওড়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ওঠা 'তারকেশ্বর ধনদৌলত চুরি কেস' নামে খ্যাত। হাওড়া থেকে রেলযোগে তারকেশ্বর যান পিয়াসারার জমিদারবাবু রামপদ সরকার। ওঠেন গিয়ে তারকেশ্বরের মহন্ত সতীশচন্দ্র গিরির বাড়িতে। ক'দিন পরে মহন্ত'র মা স্থান-বিশেষে যাওয়ার জন্য তারকেশ্বর থেকে হাওড়াগামী ট্রেনে ওঠেন। তিনটি সিল ট্রাঙ্ক ও একটি কাঠের বাক্সসমেত বিশাল লটবহর নিয়ে যাওয়ার সময় রক্ষাকবচ হিসেবে তিনি ফিরতি পথে রামপদকে সঙ্গীযাত্রী হওয়ার অনুরোধ জানালে রামপদ স্বচ্ছন্দে অনুগামী হন। পথে ঘটল বিপত্তি। বাক্স প্যাঁটরা থেকে খোয়া যায় নগদে মোট বত্রিশ হাজার টাকা ছাড়াও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস। এবং তা নাকি সরকার বাবুর হেপাজতে থাকাকালীন। মহন্ত রামপদ সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ এনে মামলা করলে অনেকের সাথে সাক্ষ্য দিতে ওঠেন হুগলী জর্জ কোর্টের উকিলবাবু ক্ষীরোদচন্দ্র বিশ্বাস। যিনি আবার রামপদর সহযাত্রীও ছিলেন।

জলপাইগুড়ি 'COW-RIOT CASE'-এ অভিযুক্ত হন হিন্দু গ্রামের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত নেতা মিঃ পুঘ্। তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডের সাথে ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্য হলে পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানিয়ে বলেন, তিনি ঐ গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দুদের সম্মানীয় নেতা বলে তাঁর প্রতি বরাবর অন্যায়-আপত্তিকর ব্যবহার কবা হয়ে থাকে। এবং একই রোষানলে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। সব শুনে মহামান্য বিচারক কেসটি নতুন করে বিবেচনার জন্য অভিযুক্তকে 'বেল' দেন।

বড়বাজারের ঘি-বিক্রেতা শ্যামাচরণ কোচকে বিচারক ডঃ এন. এন. মিত্র ১৫.০০ টাকা জরিমানা করেন। অভিযোগ—ঘি'য়ে ভেজাল দেওয়ার।

জোড়াবাগানের সহোদরীর ঘরে বে-আইনীভাবে ঢুকে পড়ার অভিযোগে মহামান্য আদালত শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র দাসকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে দু'মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে পাঠিয়েছেন।

পাঠক পাঠিকাদের জানা থাকতে পারে, সেইসময়ে এখনকার প্রযুক্তি গর্বের

'হাওড়া ব্রীজ' ছিল না। ছিল, নদীর বুকে ভেসে থাকা কাঠের সেতু। নাম—'হুগলী ভাসমান সেতু'। নৌকা ইত্যাদি জলযান যাতায়াতের জন্য সেতুর মাঝখানে কিছুটা অংশ খুলে ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকত। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের সুবিধায় জলযান এপার-ওপারের সময়-সূচি বিজ্ঞাপিত হোত. আগেভাগে। এমনই, উক্ত শনিবারের প্রচারিত একটি আগাম নোটিশ :

HOOGLY FLOATING BRIDGE

Special Opening

Sunday, the 14th January, 1894. Traffic across stopped from 7-15 A.M. to 8-15 A.M.

R.A. DONNITHORNE

Secretary to the Bridge Commissioners

পেশাদার থিয়েটারে তখন স্বর্ণযুগ। রমরম করে চলছে বেশ কয়েকটি। বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় ঐদিন রাত ৯টায় বিডন স্ট্রিটের 'মিনার্ভা থিয়েটারে' হবে গিরীশ ঘোষের 'জনা'। পরের দিন রবিবার ঐ সময় মোমবাতির আলোয় মঞ্চস্থ হবে 'কমলে কামিনী'। ঠনঠনিয়া 'সিটি থিয়েটারে' ঐদিন রাত ৯টার অনুষ্ঠান জাতীয় ভাবধারায় সিক্ত গীতিমুখর 'আনন্দলহরী অথবা হরিলীলা'। পরের দিনে একই সময়ে বিয়োগান্ত 'প্রফুল্ল'। 'স্টার থিয়েটারে' তখন হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। বিচিত্র বিজ্ঞাপনে সজ্জিত হয়ে সেখানে চলছে দেখি : —

Amritalal Bose's highly appluded new society sketch.

"BABU"

The Babu	–	political
The Babu	–	ultra-Religious.
The Babu	–	reformer.
The Babu	–	scientific.
The Babu	–	ultra Moralist.
The Babu	–	tomed.

The Babu : - "who doesn't know what he is" Merry Training School.

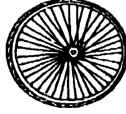
Humorous (Real) Higher Education.

BABU BABU BABU BABU

Infantile specimens of the would be Heroes of Diarrhoeagung & Malariapore.

BABU. BABU. BABU. BABU HA HA HA / songs BABU BABU. Ho Ho Ho Dances · BABU

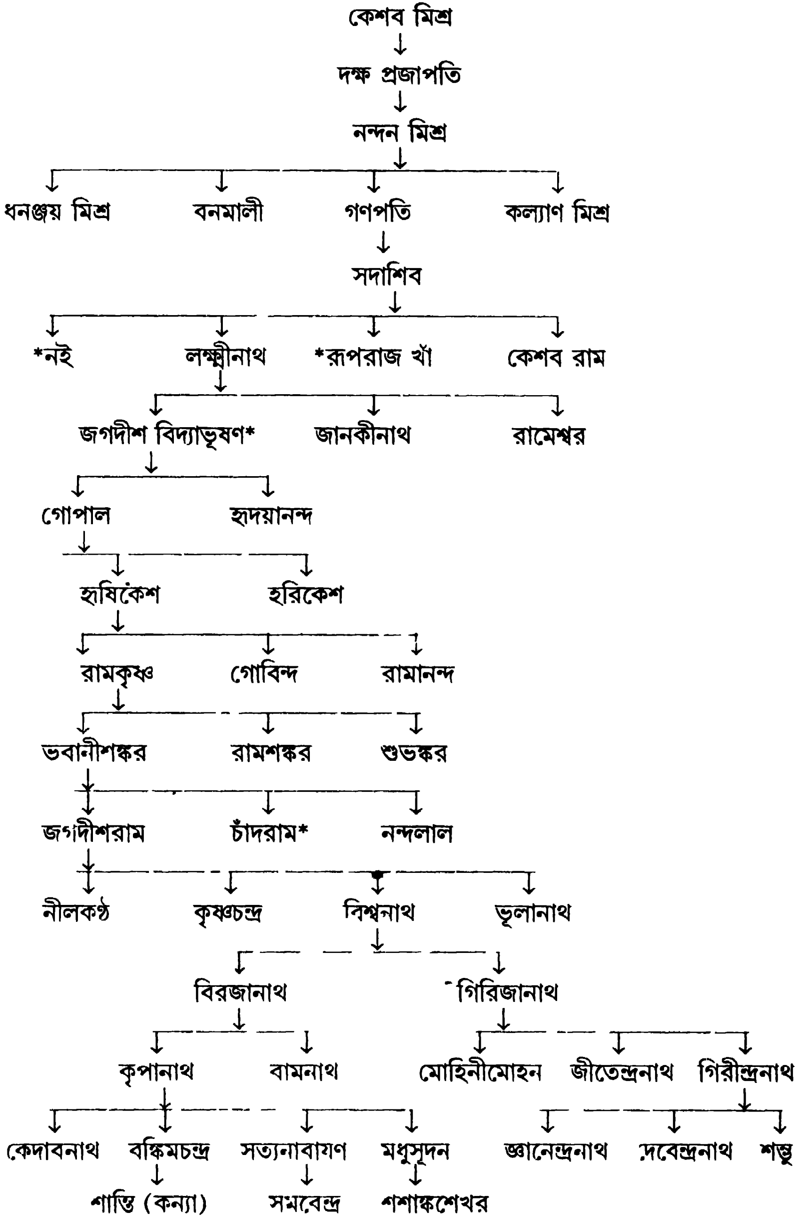
Amrita Lal Bose
Manager



ফিরে আসা যাক ভূপর্যটকের কথায়। সার্থক জনম এই বঙ্গ সন্তানের। যদিও জীবন পথটি তাঁর ফুলে ফুলে বিছানো ছিল না মোটেই। বরং উলটোপূরাণ। কষ্টের প্যাঁচ কষা রাস্তাতেই মূলতঃ চলাফেরা। যে কষ্ট স্বপ্নের অতীত। একটু একটু করে নিঙড়ে দিয়েছেন নিজেকে পৃথিবীর পথে। নীলকণ্ঠ হতে হয়েছে। তবু, মৃত্যুর পূর্ণচ্ছেদের আগে জীবনে কখনও ছেদ পড়তে দেননি। কি কর্মে, কি মননে। লক্ষ্যে চিরস্থির—বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরিয়ে তুলবেন ক্ষুধার্ত ঝোলাটি। আর তা অকাতরে বিলিয়ে যাবেন দেশের মানুষকে, বিশেষতঃ যুব সমাজকে। দৃপ্ত ভঙ্গিতে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শুধু এগিয়ে চলেছেন, আর একটি একটি করে কুড়িয়ে নিয়েছেন অমূল্য অভিজ্ঞতার রত্নখণ্ডগুলি, ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের জন্যে।

রামনাথকে নিয়ে লেখা-লেখির কাজ প্রায় কিছুই হয়নি। উপরন্তু হারিয়ে যাওয়া এই মহৎ মানুষটির কোনও অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই আজ আর বেঁচে নেই। কেবল ধুকধুক করে এখনও বেঁচে আছেন মেজ ভাইপো বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী প্রিয়লতা দেবী। উপায়ান্তর না পেয়ে যাঁকে রামনাথের মুখাগ্নি করতে হয়েছিল, একমাত্র কাছে থাকা স্বজন হিসেবে। বর্ধমানে মেয়ে জামাইয়ের কাছে থাকা বৃদ্ধা এখন বিচ্ছিন্ন স্মৃতির পথ হাতড়াচ্ছেন। তবু যা হোক, স্নেহধন্যা তো বটে। এনাকে সামনে রেখে শুরু হয় ব্যাপক অনুসন্ধান। ধাওয়া করি বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা জেলা পর্যন্ত। তারই ফসল হিসেবে সংগ্রহ করা গেছে মূল্যবান এই সমগ্র বংশ পরিচয় :

কুলপঞ্জী


কেশব মিশ্র
দক্ষ প্রজাপতি
নন্দন মিশ্র
ধনঞ্জয় মিশ্র
বনমালী
গণপতি
কল্যাণ মিশ্র
সদাশিব
*নই
লক্ষ্মীনাথ
*রূপরাজ খাঁ
কেশব রাম
জগদীশ বিদ্যাভূষণ*
জানকীনাথ
রামেশ্বর
গোপাল
হৃদয়ানন্দ
হৃষিকেশ
হরিকেশ
রামকৃষ্ণ
গোবিন্দ
রামানন্দ
ভবানীশঙ্কর
রামশঙ্কর
শুভঙ্কর
জগদীশরাম
চাঁদরাম*
নন্দলাল
নীলকণ্ঠ
কৃষ্ণচন্দ্র
বিশ্বনাথ
ভূলানাথ
বিরজানাথ
গিরিজানাথ
কৃপানাথ
বামনাথ
মোহিনীমোহন
জীতেন্দ্রনাথ
গিরীন্দ্রনাথ
কেদাবনাথ
বঙ্কিমচন্দ্র
সত্যনাবাযণ
মধুসূদন
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
দেবেন্দ্রনাথ
শম্ভু
শান্তি (কন্যা)
সমবেন্দ্র
শশাঙ্কশেখর

রামনাথ বংশের আদি বাসস্থান—কান্যকুব্জ। গোত্র—কাত্যায়ন। শ্রেণী—বৈদিক। প্রবর—অপ্সার, নৈধ্রুব, কাত্যায়ন। শাখা—কান্ব।

*তারকাচিহ্নিত নামগুলি অনুসারে রামনাথের জন্মস্থান বানিয়াচং-এ এখনও পাড়া বর্তমান। এছাড়া এই বংশের অপর শাখার ভবানন্দ খাঁর নামেও একটি পাড়া আছে। যে শাখার অন্তর্গত বিখ্যাত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন সম্পর্কে রামনাথের কাকা। পণ্ডিতমশাই আবার খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় চুনী গোস্বামীরও দাদু হতেন।

কথিত আছে, বংশের আদি পুরুষ কেশব মিশ্র সুদূর কান্যকুব্জ (কনৌজ অর্থাৎ উত্তর প্রদেশের ফারুখাবাদ জেলায় গঙ্গার দক্ষিণ কূলে অবস্থিত প্রাচীন নগর। বহু সাম্রাজ্যের এবং রাজবংশের উত্থান-পতনের সাক্ষী। সংস্কৃতির পীঠস্থান এই কান্যকুব্জের সেকালে রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।) থেকে পাথরের কাত্যায়নী (কূলদেবী) নৌকা করে আনছিলেন। আজকের বানিয়াচং তখন চতুর্দিকে শুধু জল আর জল। রাত হয়ে যাওয়ায় বিরতি দিতে যাত্রাপথে একজায়গায় নোঙর করলেন। রাতে স্বপ্নাদেশ হয়, মা বলছেন,—'আমাকে আর অন্য কোথাও নিয়ে যাসনি বাপু। এখানেই প্রতিষ্ঠা কর।' সকালে জেগে উঠে কেশব বিস্ময় বিমূঢ় চোখ কচলে দেখেন, দেবীর অলৌকিক প্রসাদে সামনেই জেগে উঠেছে চর। যেখানে কাল সন্ধ্যাতেও ছিল কূলহারা থৈ থৈ জল। মহামায়ার ইচ্ছা বুঝতে আর বাকি রইল না। তাড়াতাড়ি নেমে মঙ্গলশঙ্খে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ধীরে ধীরে বাসের যোগ্য করে তুললেন, ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। নাম হোল কালীকাপাড়া। কয়েক পুরুষ পরে জাতিগত ও ধর্মগত জিগীরের চাপে পড়ে বংশধরেরা বাসস্থান তুলে দিয়ে একটু দূরে বসাবার ব্যবস্থা করেন। যা আজকের বিদ্যাভূষণ পাড়া। নব উদ্যমে মূর্তিসহ কাত্যায়নী মন্দির প্রতিষ্ঠা হল বসতবাড়ির উত্তর-পশ্চিম দিকে।

শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ) হবিগঞ্জ সাব ডিভিশনের অন্তর্গত গ্রামটির নাম বানিয়াচং। বিশাল তার আয়তন। তৎকালীন আসামের (সিলেট জেলা অবিভক্ত ভারতে আসামের মধ্যে ছিল) লেঃ গভর্নর বানিয়াচংকে পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন।

শাসনকার্যে ভারসাম্য আনার জন্য সম্প্রতি হবিগঞ্জকে সম্পূর্ণ জেলায় পরিণত করা হয়েছে, ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং আলোচ্য গ্রামটিও রয়ে গেছে এই জেলার মধ্যে। আমরা ভূগোলে পড়েছি, কটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন হয়। এখানে বিপরীত ব্যবস্থা। ৪টি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে বানিয়াচং গ্রাম। যার লোকসংখ্যা এখন প্রায় এক লক্ষ। রামনাথের সময়ে ছিল ৪০ হাজারের বেশি। উল্লেখিত বিদ্যাভূষণ পাড়াটি ২নং উত্তর-পশ্চিম ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত। এখানে কয়েকটি বাড়ি মিলে হয় ১টি হাটি। সেরকম ৫টি হাটিতে হাজারের কিছু কম নিয়ে বিদ্যাভূষণ পাড়া। হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা যথাক্রমে ৮০% ও ২০%। ২৪.২২ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯১.২৪ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত প্রাচীনতম বানিয়াচং গ্রামটিতে বর্তমান শিক্ষার হার শতকরা

বারো। মুসলমান ও হিন্দু ধর্মীয় সংখ্যার হার যথাক্রমে শতকরা ৮৮ ও ১২ জন। থানাটির ব্যাপার-স্যাপার আরও বিশাল। ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে ১৮৯ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বানিয়াচং থানার লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ।

বালি ও কাদামিশ্রিত পাললিক মৃত্তিকার বানিয়াচং—ইতিহাস খুঁজতে গেলে তৎকালীন সিলেট বা শ্রীহট্ট জেলার দ্বারস্থ হতেই হয়। 'বানিয়াচং' সিলেট জেলার ইতিহাসের মধ্যে মিলেমিশে একাকাব হয়ে গেছে। কাজে কাজেই 'সিলেটে'র স্লেটে আঁক কষে পৌঁছান যাক অতীতের পাতায়। উত্তরে খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড় এবং দক্ষিণে ত্রিপুরা পার্বত্য অঞ্চলের মাঝে প্রকৃতির নিখুঁত সৌন্দর্যে মোড়া সিলেটের তথ্যভিত্তিক আদি ইতিহাস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু কিছু পাওয়া গেছে। প্রায় ৭০০ বছর আগেকার কথা। সেসময় উত্তর সিলেটের বিশাল গৌর অঞ্চলে রাজত্ব চালাত ছোট ছোট হিন্দু রাজা। এদের সর্বশেষ রাজা গৌরগোবিন্দর রাজবাড়ি ছিল জেলা শহরে জিন্দা বাজার এলাকায় বর্তমান জেলা জজের বাংলো সন্নিহিত অঞ্চলে। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে এই রাজার রাজত্ব উল্টে যাওয়ার মূলে ছিল নির্যাতন স্বভাব। তার উপরে, মুসলমানদের উপরে ছিলেন বড়ই বিরূপ। একবার হয়েছে কি, বোরহানউদ্দিন নামে এক মুসলমান তার ছেলের জন্ম উপলক্ষে 'আখিকা' উৎসবে গরু উৎসর্গ করে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা চিল সাঁ করে ধেয়ে এসে মাংসের টুকরো ছোঁ মেরে নিয়ে পালায়। দুর্ঘটনাক্রমে. সেটিকে ফেলল গিয়ে এক ব্রাহ্মণের ঘরে। আর যায় কোথা! রাজার কানে এখবর যাওয়া মাত্র ঘোষণা করলেন, এক্ষুণি শিশুটিকে হত্যা করে পিতার হাত কেটে দিতে। মানুষটি অপরাপব মুসলমানদের সাহায্য চাইলে সিকান্দার শাহ একদল সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ফল হল না। তখন বাংলার রাজা শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ'র নির্দেশে সেনাপতি সঈদ নাসিরুদ্দীনের নেতৃত্বে আসে দ্বিতীয় সৈন্যদল। নাসিরুদ্দীনকে সাহায্য করতে দিল্লী থেকে এগিয়ে এসে শিষ্য দল সহ হাত বাড়িয়ে দেন বিখ্যাত সন্ত হজরত শাহ জালাল। এই ফকির জন্মগ্রহণ করেন এশিয়ায় তুর্কী দেশের কোনিয়া অঞ্চলে। সেখানে এর কাকা ভাইপোর হাতে এক টুকবো মাটি দিয়ে নির্দেশ দেন, 'হিন্দুস্থানে যেখানে এই মাটির অনুরূপ দেখতে পাবে, সেখানেই বসবাসের ব্যবস্থা করবে।' তুর্কীব কোনিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে দিল্লী-সিলেট অভিযানের সময় ভক্ত-শিষ্য বাড়তে বাড়তে ৩৬০ জনে দাঁড়ায়। যাদের প্রত্যেকেই ইসলাম ধর্মের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সকলের 'করব নয় মরব' প্রতিজ্ঞাকে কাজে লাগায় হজরতের নেতৃত্ব। গৌর গোবিন্দ সহজেই পরাভূত হয়ে আশ্রয় নেন বানিয়াচং এ। যুদ্ধ মিটে যেতেই শাহ জালাল আবিষ্কার করলেন কাকার দেওয়া মাটির সঙ্গে সিলেট জেলার মাটির হুবহু মিল। অতএব এখানেই পাকাপোক্ত থাকার ব্যবস্থা হয়। মুসলমান ধর্মীয়দের প্রসার সেই থেকে।

এইসময় দেশের প্রশাসন সিকান্দার শাহ'র হাতে আসে। তিনি ধর্মযুদ্ধের এই প্রকৃত সৈনিক-সন্তের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মসজিদ তৈরি করে দেন হজরত শাহ জালালের নামে। সংলগ্ন টিলার সমাধিতে মহান সন্তের দেহাবশেষ আজও মহা

শান্তিতে শায়িত। তাঁর তরবারি ও বস্ত্রাদি সমেত পবিত্র কোরাণ মসজিদ-এর মধ্যে সযত্নে রক্ষিত আছে। জনশ্রুতি, হজরত সাধন বলে রাজা গৌর গোবিন্দের অনুগামীদের মাগুর ও শিঙি মাছে পরিণত করেন। যারা এখনও পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে ঘুরে ফিরে দর্শক মনোরঞ্জন করে থাকে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ক্রমে অসংখ্য ভক্ত দর্শকের সমাগমে শহরের মধ্যে অবস্থিত মসজিদ প্রাঙ্গণটি তীর্থে পরিণত হয়ে ওঠে।

১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কোচ রাজা নরনারায়ণের ভাই চিলারাই তৎকালীন সিলেটের রাজাকে পরাজিত করেন। তাইপের রাজা অমরমাণিক্য ১৫৮১তে পাঠান শাসক ফতে খাঁকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন।

'আইন-ই-আকবরি'-তেও আলোচ্য জেলা সম্বন্ধে পাওয়া যায় টুকরো টুকরো খবর। সেখানে কমলালেবু জাতীয় এক অতি সুস্বাদু ফলের সুখ্যাতি করা হয়েছে। আকবরের সময় সিলেট বা শ্রীহট্ট ছিল বিদ্রোহী পাঠান প্রধানের অধীন। আসাম সরকার প্রকাশিত 'বাহারিস্তান ঘাইবি' পুস্তক থেকে জানতে পারা যায়, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় থেকে অঞ্চলটি মুঘল অধীনে আসে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের অধীনস্থ ইসলাম খাঁর প্রেরিত সৈন্যদল পাঠান নেতা ওসমানকে পরাভূত করে দখল নেয়।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ। সিলেটের অনেকটা অংশ তখন জৈন্তিয়া পরগণার মধ্যে। মেজর ইল্লেরকার-এর মাধ্যমে ইংরেজ এই প্রথম লোলুপ দৃষ্টিতে হানাদারি শুরু করে, পরগণার রাজার বিরুদ্ধে। ষড়যন্ত্রের জাল ক্রমশঃ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াতে থাকে। অবশেষে, 'রাজা কিছু ব্রিটিশ প্রজাকে অপহরণ করে দেবী কালীর সামনে বলি দিয়েছে' এই অভিযোগে অভিযুক্ত করে ১৭৩৫-এ সমগ্র জৈন্তিয়া রাজ্যটাই ব্রিটিশ ফ্রন্টিয়ারের সাথে জুড়ে দেয়।

১৭৬৫ তে সিলেটের বাকি অংশ চলে আসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে। ইংলন্ড থেকে ব্রিটিশ সিংহ'র প্রথম প্রতিনিধি হয়ে আসেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক থ্যাকারসের দাদু মিঃ থ্যাকারসে। যাঁর উত্তরাধিকারী সূত্রে ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে আসেন মিঃ রুবার্ট লিন্ডসে, 'কালেক্টার' পদে আসীন হয়ে। ইনি প্রশাসন পরিচালনায় অত্যন্ত যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ধীরে ধীরে দেশের সর্বত্র ইংরেজ আইন চালু হতে থাকল। এ বিষয়ে কলকাতা এবং ঢাকা থেকে কালেক্টারগণ নির্দেশাদি পেতেন। ক্রমে আসাম রাজ্যের জেলায় পর্যবসিত হল 'সিলেট'। অস্বীকার করা যাবে না, আজ বাংলাদেশের চা-রাজধানী যে 'সিলেট' হতে পেরেছে, তার পিছনে অবদান আঠার শতকে ইংরেজদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। দেশের গর্ব, জেলায় মোট ১৫০টিরও বেশি চা-বাগানের মধ্যে পৃথিবীর বৃহত্তম ৩টি চা-বাগানও এখানে অবস্থিত। চোখ জুড়ানো মন ভুলানো সবুজ কার্পেট বিছানো 'শ্রীমঙ্গল' অঞ্চলে একবার প্রবেশ করলে অতি বড় প্রকৃতি বিরূপও ফিরবেন তাঁর মনোরাজ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে।

১৮৫৭-র বিদ্রোহের সময়ও সিলেট চুপচাপ থাকে নি। ডিসেম্বরে চিটাগাং থেকে একদল স্বাধীনতাকামী দক্ষিণ-সিলেট দিয়ে ঢুকে সুর্মা উপত্যকা হয়ে মণিপুরের দিকে

এগিয়ে চলল। শুধু মানুষের সহযোগিতা নয়, জেলার কিছু যুবকও যোগ দিয়ে সে দলের শক্তিবৃদ্ধি করে। খবর পেয়ে জেলা শহরের সৈন্যবাহিনী থেকে একটি 'লাইট ইনফ্যান্ট্রি' দল মেজর বায়াং-এর নেতৃত্বে ধেয়ে যায় প্রতাপগড় হয়ে শেষ পর্যন্ত 'লাটু' অঞ্চলে। মুক্তিকামী যোদ্ধারা তাদের সাধ্যের শেষ বিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে হেরে যায়। মরণপণ সে যুদ্ধে পক্ষে প্রাণ হারায় ২৬ জন। বিপক্ষে মেজর সমেত ৫ জন।

১৯২৯ সালের বিধ্বংসী বন্যায় জেলাটি চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শস্য ও জীবনহানির ক্ষেত্রে সে বৎসর ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে। সরকারী ও বেসরকারী সর্বস্তরের মানুষের কাছ হতে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন মিঃ জে.এ. ডাউসন।

পরবর্তীকালে দেখা গেছে, জেলার মানুষেরা তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানায় পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি। ১৯৪৭-এ গণভোটের পরে জেলাটি পাকিস্তানের অংশ হয়। করিমগঞ্জ সাব ডিভিশনের একটা মুখ্য অংশ ছেঁটে র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড সিলেটের সঙ্গে জুড়ে দেন। বাকি অংশটুকু হয় ভারতের। সেই থেকে সিলেট শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগে ক্রমশঃ উন্নতির পথে।

এবারে চলে আসা যাক রামনাথের জীবনবেদ-এ। বাবা বিরজানাথ ছিলেন গোঁড়া কাত্যায়ন ব্রাহ্মণ। নানা উপচারে নিত্য পূজা হোত কুলদেবী কাত্যায়নীর। বর্ধিষ্ণু বনেদী বংশ। যথেষ্ট পরিমাণ জমির উপস্বত্ব থেকে সব কিছু চলে যায়, খোস মেজাজে। আশেপাশের মানুষজন তাঁকে জমিদারতুল্য সম্মান জানাত। দক্ষ সরকারী কর্মচারী হলেও বিরজানাথ প্রকৃতপক্ষে একজন তেজস্বী ও স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন। একবার স্বদেশী পোশাক ছেড়ে শুধু বিদেশী ইউনিফর্ম পরে কাজ করতে হবে শুনে তখনই সেই কাজে ইস্তফা দেন। রামনাথের তেজস্বিতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও দেশাত্মবোধ বিকশিত হয়েছে পিতৃরক্তের সহজাত সূত্রেই। কি নিজভূমিতে, কি বিদেশের পথে প্রান্তরে, বলিষ্ঠ চেতনায় দেশমাতৃকার বন্দনা গান গেয়েছেন জীবনভোর। সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন জননী গুণময়ী দেবীর নম্র স্বভাব ও পরকে আপন করার শক্তি। দাদা কৃপানাথ একজন হৃদয়বান চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতনামা। এ গ্রামে যিনি প্রথম 'ভিলেজ কোর্ট' চালু করেন, তিনি হলেন রামনাথের কাকা গিরিজানাথ। দাপটদার লোক ছিলেন। সকলে সম্মান দিয়ে বলত 'রায় সাহেব'। বিদ্যাভূষণ পাড়ায় অবস্থিত বসতবাড়িটিকেও তাই বলা হোত রায় সাহেবের বাড়ি। তাঁর স্ত্রী ঐ বাড়ির মধ্যে বালিকা প্রাইমারী স্কুল বসিয়ে চালাতেন একাই। অতএব দেখা যাচ্ছে, 'বিশ্বাস' বংশ-কৌলিন্য ছিল রীতিমত মর্যাদাকর।

প্রচলিত প্রবাদ "একা এসেছি একা যাব" প্রবাদটির বড়ো নিষ্ঠুর প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর ক্ষেত্রে। জীবনভোর শুধু একাকিত্বের বোঝা বয়ে বেড়িয়েছেন। তবু কি আশ্চর্য তাঁর হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও সহনশীলতা। কখনও বড়ো করে দেখেননি সে সমস্ত ব্যথা-বেদনা-কষ্টকে। বরং হেলায় হারিয়ে সে সবকে করেছেন তুচ্ছতম ব্যাপার-স্যাপার। অনায়াসে হতে পেরেছেন ব্যথা বিজয়ী। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন পৃথিবীর মহত্তর পথিকরূপে। সেই কোন ছোটবেলায় মাত্র দুই বৎসর

বয়সে হন মাতৃহারা। মায়ের গঙ্গাপ্রাপ্তি কাশীধামে এবং সৎকার হয় মণিকর্ণিকা ঘাটে। প্রথমে টাইফয়েড ও পরে কলেরা রামনাথের শিশু জীবনকে করে তোলে নাস্তানাবুদের একশেষ। পাঁচ বছর দেখতে দেখতে পার হল। লেখাপড়ায় উপযুক্ত বুদ্ধির দরজা আর খোলে না। সকলেই চিন্তিত। আরও ক'বছর পরে হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করা গেল সরস্বতী সে দরজা দিয়েছেন মুক্ত করে। গুটি গুটি করে আট বছর বয়সে শুরু হল পাঠ জীবন। কিন্তু শুরুতেই যে শেষের ধাক্কা। চোখের সামনে দেখতে হয় শেষ অবলম্বন বাবার মৃত্যু। একমাত্র স্নেহের কোল পেয়ে মানুষ হতে থাকে দাদা-বৌদির কাছে। গাঁয়ের লোকের অভিযোগের অন্ত নেই। অনেকে বলে "ওটা একটা আস্ত অমানুষ।" পড়ার চেয়ে ভাল লাগে ডানপিটেমী পাঠশালার পড়ুয়া হতে। যে ছেলে দুষ্টুমীতে ভয়শূন্য, তার কি পড়া হয় সুষ্ঠুভাবে? নাকি বসতে পারে একদণ্ড স্থির হয়ে, আগ্রহ-একাগ্রতা নিয়ে? তার ওপরে আর এক আপদ—এমন গোঁড়া প্রাচীনপন্থী ঘরের ছেলে হয়েও কিছুই মানবে না। সেকালের গ্রামবাংলা। কি হিন্দু, কি মুসলমান, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী চলতে অভ্যস্ত। অথচ, 'রামা'র সাফ কথা, "ধর্ম আবার কি? ওতো গরিব মানুষকে দাবিয়ে রাখার গ্যাঁড়াকল"। ঐ বয়সে "বিশ্বাস" খোকার এমনতরো বিশ্বাস! বুঝুন ঠেলা। সেই কোন ছোটবেলা থেকে খাদ্যাখাদ্যে ছিল না কোনওরকম বাছবিচার, মৃত্যুকাল পর্যন্ত। গরু-শুয়োর তো কোনও ব্যাপারই না। তৎকালীন গ্রামীণ সমাজ বলে কথা। মেনে নেবে কেন? কোনও ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠানে রামা'র প্রবেশ ছিল নিয়ন্ত্রিত। ফলে, বাড়িতে ও পাড়ায় বেপরোয়া রামনাথের মাঝে-মধ্যেই একঘরে অবস্থা। অনেক রাত কাটাতে হয়েছে স্কুল বা গাছতলায় শুয়ে। ভাবী জীবনের জন্যে প্রকৃতিদত্ত হাতেখড়ি আর কি!

ব্যতিক্রমধর্মী মানুষেরা এ সমাজের চালু ফাঁকিগুলি কেমন যেন সহজাতভাবে ধরে ফেলে। 'রামা'ও সবরকমে তাই। ধর্মের আড়ালেই হোক বা শাসনের বেড়াজালেই হোক, মানুষের প্রতি কোনওরকমের বঞ্চনা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। জীবনের শুরু থেকেই স্বাধীনচেতা। তেরো সংখ্যাটি অনেকের কাছে অশুভ ঠেকলেও তাঁর কাছে শুভ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। জন্মই তো ১৩০০ বাংলা সালে। দিনটি ছিল ইংরেজির ১৩ই জানুয়ারী। আবার ঐ ১৩ বছর বয়সে হরিশ্চন্দ্র হাইস্কুলে (যেটি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এম.ই. স্কুলের সাথে যুক্ত হয়ে নাম নেয় লোকনাথ রমন বিহারী উচ্চ বিদ্যালয়) ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রাবস্থাতেই স্কুল ছাড়েন। এবং তেরোতেই রাজনীতির হাতেখড়ি। যোগ দেন বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির অন্তর্গত সুশীল সেনের শাখায়। অল্পদিনের মধ্যেই সে শাখা পরিদুষ্ট হয় রামার স্বাতন্ত্র্যে। অবশ্য পরবর্তীকালে নীতিগত কারণে সহযোগী বিপ্লবী দল যুগান্তরকে সমর্থন করতে একটুও দ্বিধা হয়নি। জীবনের শুরু থেকেই অন্যায়ের সাথে আপোষহীন সংগ্রামে অভ্যস্ত। এই সময় ইংরেজ সরকার একটি আইনের বলে পতিত জমির ওপর কর ধার্য করলে, জনসাধারণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে রামা সকলকে একজোট করে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের সামিল করে। মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত চলে

গ্রামবাসীদের পক্ষে রায় গেলে রামা'র জয়জয়কার পড়ে যায়। এর পরে আরম্ভ হয় স্কুলে স্কুলে বিভিন্ন অন্যায় জুলুমবাজির বিরুদ্ধে ছাত্র ধর্মঘট। যার নেতৃত্বে থাকে রামা। ফল—স্থানীয় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের নিকট নিজেদের ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

দেশজ কীর্তন, রামপ্রসাদী ও শ্যামাসঙ্গীতে যথেষ্ট দখল থাকলেও এই সময় তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল সম্প্রীতিমূলক স্বদেশী আন্দোলনের গান—'রাম রহিম না জুদা কর ভাই, দিলকো সাচ্চা রাখজী।' এসবের মাঝেই, সকলের একান্ত অনুরোধে গয়া চললেন। সর্বান্তকরণে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দিলেন, পিতৃ-আত্মার মুক্তিকামনায়। বছরটি ছিল ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ।

বিশ্বজয়ী তাঁর চলমান জীবনে তথাকথিত 'আনলাকী নাম্বার' এর সাথে পাঞ্জা কষেছেন, বারংবার। এবং সে খাতায় কোথাও লেখা নেই নতিস্বীকার। বরং জানতে পারি, স্রেফ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ, সব শেষের দিকে প্রাণাধিক দাদা কৃপানাথের মৃত্যু সংবাদ পান ১৩ই অক্টোবর। এর মাত্র উনিশ দিন পরে নিভে যায় তাঁর জীবন প্রদীপ। মৃত্যুর ঠিক সময়টি ছিল, বাঙলা মতে ১৩৬২ সালের ১৩ই কার্তিকের শেষ রাত্রি। এমনি করেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ১৩ সংখ্যার রঙবাহারি হোলি খেলেছেন, অনিবার্যভাবে। কি অভাবনীয় সহাবস্থান!

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ। বেজে ওঠে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণডঙ্কা। আর রামা নয়। এবার শুরু হল রামনাথের অভূতপূর্ব দ্বিতীয় জীবন। বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে যে বাঙালী পল্টন ও লেবার কোর সংগঠন করা হয়, বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে তাতে অফিসের বড়বাবু হিসেবে যোগ দেন। বিধি বাম; অসুস্থতার কারণে, শরীরের ওজন নিয়ম অনুযায়ী ১০০ পাউন্ডের নিচে হয়ে যাওয়ায় 'ডিসচার্জড' হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন।

কিন্তু যে মানুষ সারাটা জীবন ধরে কর্ম বিমুখতার মূর্ত প্রতিবাদ, তাঁর দ্বারা কি কখনও চুপচাপ ধরে বসে থাকা ধাতে সয়? অন্তরাত্মা উঠল হাঁফিয়ে। তারই ফলশ্রুতি—১৯১৭ সালে সৈন্য বিভাগের জন্য শিক্ষিত কেরানি ও অফিসার স্কুলের ট্রেনিং-এ যোগ দেন 'কুমটি'তে।

১৯১৮ থেকে শুরু হয় পরোক্ষভাবে ভূপর্যটন। কেননা ট্রেনিংপ্রাপ্ত ঐ সৈন্যজীবনের চাকরীর সুবাদে সুদূর আফগানিস্থান পারস্য, রাওয়ালপিন্ডি ও বেলুচিস্তান পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ঘুরতে হয়। এই দেশভ্রমণই তাঁর পরবর্তী বিশ্বভ্রমণের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল অনেকখানি। তখন মোটর ট্রাকের পথ হয় নি। 'এরোপ্লেন' রেওয়াজের দেরি আছে। দৈনিক ত্রিশ মাইল (৪৮.২৮০২০ কি.মি.) পর্যন্ত মার্চ করে যেতে হয়েছে। ওরই মাঝে দুষমণের সঙ্গে যুদ্ধ করে আবার যাত্রা। এমনই অসহ্য হয়ে উঠেছিল, মৃত্যু তখন মধুর কাম্য মনে হোত। তার উপরে ডিসিপ্লিনের নামে ক্রীতদাস হয়ে দু'হাতে সেলাম ঠোকায় স্বাধীনচেতা রামনাথ হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। সুযোগ করে দিল ম্যালেরিয়া। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। মিলিটারী কায়দায় স্যালুটের বদলে হাঁফ ছেড়ে 'GOOD BYE' জানিয়ে বেলুচিস্তান থেকে অসুস্থ অবস্থায় ফিরলেন বাড়ি।

সেবারে ম্যালেরিয়া খুবই কায়দা করে ফেলেছিল বটে শরীরটাকে। তবে মনটিকে নয়। সে আর কদিন? বাইরের ডাক যাঁর অন্তরে ঘড়ির কাঁটার মত 'টিক টিক' করে বেজে চলেছে অহরহ, তাকে কি ঘরে রাখা যায়? যাওয়া হবেই 'ঠিক-ঠিক।'

ওদিকে সংসারের দায়-দায়িত্বও কিছুটা বর্তেছে। যদিও নিজে চিরকুমার। কোনওরকমে সুস্থ হয়ে বেরিয়ে পড়লেন ঐ একই ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের একেবারে শেষ বরাবর। মালয় দেশের সিঙ্গাপুর পৌঁছে প্রথমে সাময়িক কাজ নিলেন সে দেশের টিনখনিতে। ক্রমে সুযোগ পেলেন আরও অনেক বড় এবং সম্মানের চাকরী। জাহাজী আদালতে চারটি ভাষায় (ইংরেজি, মলয়, চিনা ও হিন্দী) অভিজ্ঞ 'সুপারভাইজার'-এর পদ। 'মেসার্স মার্টিন করোপস্ অ্যান্ড কোম্পানী'র অধীন। মেরিন কোর্টে রোজই বেলা এগারোটার সময় হাজিরা দিতে হত। ম্যাজিস্ট্রেটকে কেস-এর 'চার্জ ফ্রেম' তৈরিতে সাহায্য করা ছিল মূল কাজ। খসড়াটা পুলিশ করে দিলেও তার সংশোধন অন্তে সম্মতি ও স্বাক্ষর তিনি করতেন। পুলিশের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক ছিল বলে কারো নামে হুলিয়া বের হলেই তাঁকেও লোকটার ফটো সমেত এক কপি দেওয়া হোত। কর্মশেষে 'তাঞ্জাম পাগাড়' পল্লীর বাসায় ফিরে কিছু নাকে মুখে গুঁজে ছোটখাটো আড্ডা দিতেন 'টেররিস্টদের' সঙ্গে। আর একটু রাত হলে বেরিয়ে পড়তেন আমোদ-আহ্লাদ, চিত্ত এবং দেহ-বিনোদনের জন্য 'নিউ ওয়ার্লড' অথবা 'হ্যাপী ভ্যালী'তে। মাসের অনেকগুলি তারিখেই ফিরতেন নিশুতি রাতে। আবার পরের দিন সকালে চাকরী রাখার তোড়জোড়।

সিঙ্গাপুরে চাকরী রামনাথের জীবনে এক চরম এবং পরম সন্ধিক্ষণ। একথা আক্ষরিক সত্যি, রক্ত সূত্রে ইনি আদৌ পরিব্রাজকীয় মানসিকতা পাননি। সম্ভবত প্রকৃতিদত্ত আশীর্বাদ ছিল, ভবঘুরে হতে। সেজন্য লক্ষ্য করা গেছে, ছোটবেলা থেকেই কেমন একটা ঘরছাড়া, লাগামছাড়া ও ছন্নছাড়া মনোভাবের ক্ষ্যাপা বাতাস সব সময় ঘুরপাক খাচ্ছে, তাঁর মধ্যে।

মোটা মাহিনার নিশ্চিন্ত চাকরী এবং 'দিল-দিওয়ানা' ফুর্তিতে বেশ ভালই কাটছিল দিনগুলি। মাঝে মধ্যে বিপ্লবীরা এসে সুখস্বপ্ন-র রেশ ভেঙে দিলেও তাদের সস্নেহ প্রশ্রয় দিতেন অন্তর্নির্হিত নিজ স্বভাবের কারণে। বাড়িতেও কিছু মাসোহারা পাঠিয়ে দিতেন, নিয়মিত। এই সময়, বহতা স্বপ্নালু জীবনে ধেয়ে আসে আকস্মিক বাধা। প্রিয়তম ভাইপো কেদারনাথ (দাদা কৃপানাথের প্রথম পুত্র) অকালে দেহ রাখলে তিনি শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। সংসারের প্রতি আর এক দফা গৈরিক রঙ চড়ল। অবশ্যই তা বৈরাগ্যের।

আমরা জেনেছি, প্রথম জীবনে অনুশীলন পার্টির সূত্রে রামনাথের পূর্বকাজ ও মন ছিল বিপ্লবী তারে বাঁধা। তাদের কিছু কাজ নীতি বিগর্হিত, এই ধারণা পোষণ করে মনের অমিলে পরে যোগ দেন 'যুগান্তর' দলে। তার ওপরে বাসায় নোয়াখালির গৌরীশচন্দ্র সিংহরায়, বজরঙ্গী, মহতাব, অশনি ও উপল প্রমুখ বিপ্লবীরা একে একে আসা-যাওয়া শুরু করল। ক্ষয় ও থাইসিস রোগাক্রান্ত বহুদর্শী এই গৌরীশ তাঁর

সিঙ্গাপুরের জীবনে ছিল পরিচারক, সখা, ম্যানেজার ও অভিভাবক, কি নয়? একাধারে সবকিছু। এদের সহযোগী ভগৎ সিং, বটুক দত্ত, মাতাজী প্রমুখেরা সকলে ছিল হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের আন্ডার গ্রাউন্ড সদস্য। নেতা পাঞ্জাবের যতীন চাটুজ্যে। পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে দলের আর একটি নাম ছিল—"ফ্রি বেঙ্গল ব্রিগেড"। স্বাধীন ভারতের কাঙ্খী সব। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য যে কোনও মূল্যে আত্মত্যাগী। গৌরীশ ছাড়াও এদের মধ্যে 'মহতাব' নামে এক সভ্য অবনী ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করার পোকা হয়ে তাঁর মাথায় জেঁকে বসে। ছেলেটি উৎকলবাসী কুলির ছদ্মবেশে এবং নিখুঁত ওড়িয়া বাচনভঙ্গীতে প্রথম আলাপেই তাঁর হৃদয় জয় করে নেয়, অতি কৌশলে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের পরিচয় থেকেই বিশ্বপর্যটনে বেরিয়ে পড়তে এরা সকলে মিলে আগুন ধরানোর চেষ্টা করছিল, রামনাথের অন্তরে। কিন্তু সে অন্তরের কাঠ তখনই ছিল ভিজে। ওরা একটু একটু করে তাপ দিয়ে সেই ভিজে কাঠ শুকনো করতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিল ভূ-পর্যটনের পথে পথে রামনাথকে "পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী দলের সর্বাদি রাষ্ট্রদূত" রূপে যোগাযোগ ব্যবস্থা কায়েম করতে। তাহলে তাঁর মারফত প্রাচ্যের অনেকগুলি দেশের আন্ডারগ্রাউন্ড দলের সঙ্গে আদান-প্রদান চালানো যাবে। অজয় নামে গৌরীশের এক সাকরেদ সভ্য, যে আবার পুলিশ-গোয়েন্দার কাজ করেও পুলিশকে ধোঁকা দেয়; সেই আগ বাড়িয়ে খবর গুঁজে দিয়ে এল, রামনাথ 'হেন-তেন' ভাবে বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ চাকরী থেকে ছিনিয়ে স্প্রিং দেওয়া খেলনার মতো পথের ধুলায় ছেড়ে দেওয়ার জম্পেস চক্রান্ত। ব্যস! সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় ও অর্থ সাহায্য করার অপরাধে চাকরী 'নট'। নিজ সম্মান বাঁচাতে বড় সাহেবের পরামর্শে 'রেজিগ্নেশান' দিতে বাধ্য হলেন।

আবার পথে। মানসিক প্রস্তুতি চলতে থাকল, সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণের। বয়স তখন ৩৫ শেষ হতে চলেছে। নতুন লোক পাওয়ার অভাবে আরও একমাস অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তারপর মুক্তি। তবে, সঙ্গে পাবেন তিন মাসের পুরো বেতন। ছট্‌ফটে রামনাথ হাঁফিয়ে উঠেছেন, বেরিয়ে পড়ার তাগিদে।

এমন সময় ঘটল সেই অঘটন। বৈদ্যুতিক তারের 'নেগেটিভ' এবং 'পজিটিভ' মিলনস্থলে বারুদ দিয়ে 'সুইচ অন' করলে চকিত বিস্ফোরণ ঘটে। তাঁর জীবনেও ঘটল এমন তরঙ্গায়িত ঝলকে ওঠা ঘটনা, যা তাঁকে দাউ-দাউ করে জ্বালিয়ে দেয়। 'রেজিগনেশান' জমা দেওয়ার দিন কুড়ি পরে হবে। সেদিন 'অন ডিউটিতে' আছেন। বেলা তখন এগারোটা। 'মেরিন কোর্টের' কাঠগড়ায় বুক চিতিয়ে দুই স্পেনীয় যুবক। বিনা টিকিট ও বিনা পাসপোর্টের জন্য অভিযুক্ত। বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা হেলায় ছুঁড়ে দেয়—"আমাদের এমন পয়সা নেই যে টিকিট কিনে পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারি। স্থল পথে না হয় হাঁটা চলে, কিন্তু জলপথে অন্য উপায় কি? আর পাসপোর্ট আমরা পাইনে এজন্যে যে, আমরা সাধারণতন্ত্রের পক্ষপাতী। ....আমরা মনে করি দেশ ভ্রমণ না করলে, মনুষ্যত্ব অর্জন হয় না। আর ভ্রমণের অধিকার মানুষ মাত্রেরই

জন্মগত।...পৃথিবী ভ্রমণ না করলে জন্মই নিরর্থক, আমাদের এই মত।" যেটুকু বা উৎসাহ উদ্দীপনার বাকি ছিল, তাও এদিনের ঘটনায় জাঁকিয়ে বসল দশগুণ হয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিজেকে বিশ্বপর্যটক হিসেবে উপযুক্ত করে তুলতে।

৭ই জুলাই, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ। মঙ্গলবার। অনেকদিনের লালন করা স্বপ্ন সফলতার মুখ দেখতে চলেছে। সকাল থেকে রামনাথের 'আত্মাপুরুষ বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে।' যাত্রা শুরু হবে কুইন স্ট্রীটের বাঙালি মসজিদ থেকে, দুপুর দুটোয়। তার আগে হবে মহতী বিদায় সভা। দুরু-দুরু বুকে একটার সময় কুইন স্ট্রীটে গিয়ে দেখেন, শুভেচ্ছা জানাতে 'সাগরের ঢেউ যেন বয়ে যাচ্ছে জনতায় জনতায়'। সে সমুদ্রে হিন্দু, মুসলমান, চিনা ও জাপানী ছিল। তবে সব চাইতে বেশি ছিল শ্রীহট্টের বাঙালি মুসলমান ভাইয়েরা। ফলে 'বন্দেমাতরম্' ইত্যাদি ছাপিয়ে আকাশে বাতাসে ধ্বনি উঠল 'আল্লা হো আকবর'। গাঁটরির মধ্যে সাইকেল সারানোর টুকিটাকি, বিশ্বের বিদগ্ধজনের কাছ থেকে অটোগ্রাফ নেওয়ার খাতা (বই-এর আকারে এই খাতাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ সংরক্ষিত আছে), একটি খদ্দরের চাদর এবং মশারী। এগুলি ঢুকল গিয়ে পিছনে কেরিয়ারের উপর রাখা কালো বাক্‌সে। বাড়তি পোশাক কিছুই নেই। গায়েরটাই যথেষ্ট। অনেক বছর ঘুরতে হবে। রোজগারের কিছুটা পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর মুখ চেয়ে থাকা সংসারে। বাকি সঞ্চয়ের সবটাই সিঙ্গাপুরে ভারতীয় বেকার ও বিপ্লবীদের সাহায্যার্থে দান করে গেলেন। পকেটে পাসপোর্ট ছাড়া কানাকড়িও নেই। নিঃসম্বল অবস্থা। জনতার বাঁধভাঙা উল্লাসের মধ্যে মুক্ত আনন্দে চালিয়ে দিলেন সাইকেল—পৃথিবীর পথে।

এরপর মালয়ের রাজধানী কুয়ালালামপুর, জিত্রা, চিয়াংলুং-এর ধুলা উড়িয়ে প্রবেশ করলেন শ্যামল মাটির শ্যাম (থাইল্যান্ড) দেশে। শ্যাম থেকে ইন্দোচীন। এখানকার ফরাসী সরকারের গোয়েন্দারা কি জাহাজে, কি মাটিতে, একেবারে আদাজল খেয়ে তাঁর পিছনে লেগেছিল, হেনস্থার একশেষ করতে। ইন্দোচীন থেকে জাহাজে চিনের দিকে পাড়ি দেন ১৯৩১ এর ২০শে ডিসেম্বর। হংকং-ক্যান্টন-নানকিন-সাংহাই হয়ে ঐতিহাসিক রাজধানী পিকিং। পৃথিবী পর্যটনে রামনাথের সবচাইতে প্রিয় দেশ চিন। ঘুরেফিরে ৩ বার এসেছেন। যেমন বিপদে পড়েছেন ঘন ঘন, মৃত্যু-মহারাজকে শিয়রে দাঁড়িয়েও ফিরতে হয়েছে বার বার, তেমনি উজাড় করা স্নেহ ভালবাসা পেয়েছেন। ফলে তিল তিল করে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ভরে উঠেছে। তবে মনে রাখতে হবে, সে যুগে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশটিতে এমন ব্যাপক ভ্রমণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল মূলতঃ প্রগতিশীল বা স্বাধীনতাকামী কমিউনিস্টদের আন্তরিক সহযোগিতায়।

পিকিং থেকে মাঞ্চুকো মুকদেন ও সীমান্ত শহর আন্তং হয়ে ঢুকে পড়লেন কোরিয়াতে। কোরিয়া প্রণালী পার হয়ে জাপানের 'কোবে' বন্দরে পা রাখলেন ১৯৩২ এর ৫ই সেপ্টেম্বর। দূরন্ত উন্নতিশীল দেশটিকে গভীর পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে প্রশান্ত পারে আমেরিকা অভিলাষী হলেন অক্টোবরে। কিন্তু বাধ সাধল কানাডা

সরকার। গরিব ও পরাধীন ভারতবাসী হওয়ার জন্য ইমিগ্রেশান বিভাগ বন্দী করে। তারা নিয়ম বেঁধে দেয়, আগে ১০০০ স্বর্ণ ডলার (এখনকার কাঁচা টাকার মত) জমা দিতে হবে। পরে কানাডায় ঘুরতে বা থাকতে পারার ব্যাপার ভাবা যাবে। কিন্তু ভবঘুরের পকেট তখন শোচনীয় বেহাল। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে, সর্বসাকুল্যে ভিক্ষের ধন ২০০ ডলারও যে হচ্ছে না।

"মিঃ বিশ্বাস এখানে থাকতে আসেনি; ঘুরে-দেখে শীঘ্রই চলে যাবে"—ভ্যাঙ্কুবার-এর স্থায়ী হিন্দু বাসিন্দারা এমন বন্ড গ্যারান্টি দিলেও সবই নিষ্ফল হয়। অনাহূত অতিথির শাস্তি হিসেবে স্থান হয় 'ভারকোডার' জেলখানায়। কালান্তক ২৯টি দুঃসহ কালরাত্রি! এমনিতেই ছটফটে মানুষ। অথচ সেলে'র মধ্যে কাটাতে হচ্ছে সীমাহীন নির্জনতায়। যা করে তুলেছে অসহ্য, প্রাণান্তকর। হঠাৎ একদিন এল দুর্দান্ত বিস্ময়ের ধাক্কা! লক্ষ্য করলেন, দেওয়ালে বড় বড় অঙ্কের আঁক কষা। আর তা কোন্ ভাষায়? সোজাসুজি বাংলায়। একাকীত্ব মাথায় উঠে চোখ ছানাবড়া। কৌতূহলী হয়ে পরে খোঁজ নিয়ে দেখেন, বিখ্যাত অঙ্কবিদ সোমেশ বসুও একবার অর্থাভাবে (একই কারণে) এই সেলে'র বাসিন্দা হয়ে এমন করে হেলায় হারিয়ে ছিলেন বন্দীর নিঃসঙ্গ জীবনকে। এই শিক্ষা তার পরবর্তী ভ্রমণ জীবনে দারুণ রকমের শক্তি যুগিয়েছিল। এহেন পর্যটককে নিয়ে কানাডার সংবাদপত্রগুলিতে সাড়া পড়ে যায়। 'ভেংকোভার স্যান' এ বাড়তি সংস্করণ—

CYCLIST THWARTED

HINDU YOUTH WHEELS AROUND THE WORLD

Ramnath Biswas, a Hindu youth with ambition to cycle around the World alone and make the trip pay for itself, may disappointed and unhappy at what happened to him in Vancouver, but he is determined to keep on going, even if not in Canada or the United States.

Arriving in Vancouver on Sunday from Japan on the Heian-Maru (জাহাজটির নাম), he ran into difficulties with immigration authorities of two countries.

CAN'T GET PERMIT

Neither Canada nor U.S.A. would let him proceed east or south on his bicycle, the official explanation being that he was unable to comply with immigration requirements and there was no assurance of his being able to continue his journey to some other land.

Ramnath Biswas has decided to take ship to Panama and ride his wheel through central and south America. Perhaps he may get back to Canada he says. This is his first trouble since he left home,

he declares, and he has records to show that he has been through the Malaya-peninsula, Siam, Indochina, China, Manchuria, Koria, and Japan.

PLANNED TO CROSS CANADA

He claims to have been the first man to make the journey from Canton to harbin by bicycle. He had planned to cross Canada and take boat to England. He left Singapore, where he was a clerk in the Marine court on July, 1931.

Claiming to have been born a British subject—he does not quite understand why he is not allowed to cross Canada Vancouver Hindus, he states, have endeavered to raise cash to post a bond guaranteeing that he would not remain in Canada but he has decided to go to Panama. Meantime he is a guest of the immigration department at the Detention Building.

কানাডা সরকার ৩০ দিনের দিন 'হিয়েঁমাক' নামক 'জাপ' জাহাজটিতেই আবার তুলে দেয়। তাদের ধরণ-ধারণ ছিল 'যথা ইচ্ছা তথা যাও' গোছের। যাই হোক, 'হিয়েঁমাক' ফিরে চলল জাপানের দিকে। ১২ দিন পর ইয়োকোহামা বন্দরে পৌঁছলে বন্দীমন মুক্তির আনন্দে নেচে ওঠে। কিন্তু খোশমেজাজ ক্রমে নিরানন্দে পরিণত হয়, যখন শোনা গেল জাপান সরকারও কানাডার দেখাদেখি নতুন প্রবেশপত্র দেয়নি। তাঁর ধারণা, সম্ভবত বৃটিশ সরকারকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই উভয়দেশ এই কর্মটি করেছিল। চারদিন ব্যর্থ অপেক্ষার পর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, চিনা বন্দর সাংহাইতে। অসম্ভব জেদ, প্রচণ্ড একরোখা, দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি ও পুরুষকারে বিশ্বাসী রামনাথকে আমেরিকা বা জাপান সরকার ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি বেশিদিন। পরবর্তীকালে সময় সুযোগমত ঠিক ঠিক ঢুকে পড়ে সে দেশগুলির সর্বত্র তন্নতন্ন করে ঘুরে দেখে এক ব্যাপক অন্তর্তদন্ত করেছিলেন, আপন প্রজ্ঞার গহীন থেকে। বিশেষ করে আমেরিকা সম্বন্ধে। তার বিস্ফোরক ফলাফল পাওয়া যায় 'আজকের আমেরিকা', 'হলিয়ুডের আত্মকথা,' 'আমেরিকার নিগ্রো' ও 'জুজুৎসু জাপান' বইগুলিতে।

যাইহোক, জাপান বন্দর থেকে গলা ধাক্কা খেয়ে সাংহাই বন্দরে নেমে পড়ার পর বসে সময় নষ্ট করার পাত্র নন রামনাথ। ঝটিতি আবার চিনের কিছু অংশ ঘুরে নিয়ে পাড়ি জমালেন ফিলিপাইন, বালি, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে। যেগুলির বেশ কয়েকটিতে চলছে তখন অন্তর্বিপ্লব। তাঁর রোখা মনোভাবের সঙ্গে ব্রিটিশ ভক্ত ভারতীয় চরদের মনোমালিন্য হওয়ায় এবং ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজ সরকার শুধুমাত্র ইংরেজকে খুশি করতে তাঁকে শৃঙ্খলিত করে জাভা সুরবায়ার 'ডিটেনশান ক্যাম্পে' ছুঁড়ে দেয়। টিনের চালার নিচে প্রচণ্ড গরমে 'জল দাও, একটু জল দাও' বলে চেঁচাতে চেঁচাতেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। চট্টগ্রামের বাঙালি ব্যবসায়ী মোহিনীবাবু অনেক

তদ্বির-তদারকিতে জামিনে খালাস করে আশ্রয় দিলেন নিজ গৃহে। তিন দিন পরে জাহাজে পাড়ি দিয়ে পৌঁছলেন স্বাধীন সিঙ্গাপুরে। অর্থাৎ প্রথমবারের ভ্রমণে যেখান থেকে শুরু করেছিলেন দুর্ঘটনাক্রমে সেখানেই ফিরে আছড়ে পড়লেন। শারীরিক বিধ্বস্ত অথচ মানসিক শক্তিতে অবিচল ভবঘুরে বলছেন—'কানাডা, জাপান ও ওলন্দাজ সরকার যে আমাকে এত কষ্ট দিয়েছিল তার একমাত্র কারণ, আমি বাঙালি। তখন এবং এখনও যদি কোন বিদেশী সরকার ভারতবর্ষের কোনও জাতিকে ভয় করে, তবে সেই জাতি আমার জাতি—বাঙালি'। উঠলেন যক্ষ্মারোগাক্রান্ত অথচ শক্তির পরশমাণিক গৌরীশের কাছে। মাস দুই বিশ্রাম নিয়ে যার একান্ত অনুপ্রেরণায় আবার অর্থাৎ দ্বিতীয়বার পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন, নবতর উৎসাহ-উদ্দীপনায়। সময় ১৯৩৩-এর জানুয়ারী।

এবার তিনি পশ্চিমদিকে রওনা দেন। সিঙ্গাপুর থেকে রেলগাড়িতে পিনাং পৌঁছে সেখান থেকে জাহাজে করে বর্মা মুলুকের মারগুই বন্দরে অবতরণ করেন। সে দেশ ঘুরতে ঘুরতে ইচ্ছে হয় আপন দেশ ভারতবর্ষটাই বা বাকি থাকে কেন? ব্রহ্মদেশে ছয় মাস কাটিয়ে মণিপুর, শিলং ঘুরে শ্রীহট্টের নিজ গ্রামে যেতে গিয়ে শিলং-এর 'লাইলঙকট' পাহাড়ের ঢালু পথে সাইকেল থেকে আছড়ে পড়ে পায়ের হাড় ভাঙেন। সদর হাসপাতালে ভর্তি হন ১৯৩৪'-এর ৩রা জানুয়ারী। প্রিয় বিপ্লবী ভাইপো খবর পেয়েই লুকিয়ে দেখা করতে আসে, পুলিশের তাড়া খেয়েও। স্বজেলাবাসী ও আত্মীয়েরা তাঁর কাছে আসেননি দুটি কারণে। এক, সাগরপারে বিদেশ ঘোরা; কত কি অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়া ম্লেচ্ছর সাথে দেখা করে জাত খোয়াতে হবে নাকি? দুই, ছোটবেলা থেকেই গায়ে বিপ্লবী গন্ধ থাকায় পুলিশের নজরে আসার ভীতি। অবশেষে হসপিটালের কাছেই এক আশ্চর্য উদারচেতা অসাধারণ বৈষ্ণবী তাঁকে ঠাঁই দিয়ে একটু একটু করে আরোগ্যের পথে তুলে ধরেন।

সেরে ওঠা মাত্র ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, জামালপুর, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, কুচবিহার, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং পর্যন্ত 'ট্রায়াল ট্রিপ' মেরে দিয়েই ফিরে এসে ঘাঁটি গাড়লেন কলকাতার ৩৭ নম্বর হ্যারিসন (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) রোডে, 'শান্তিভবনে'র ৩৪ নম্বর ঘরটিতে। বয়স তখন চল্লিশ। অথচ উৎসাহে যেন আগ্নেয়গিরি। প্রস্তুতি নিতে থাকলেন ভারত ভ্রমণান্তে ইউরোপ যাত্রার। তাঁর মহৎ যাত্রাপথের শুভাকাঙ্খী হিসাবে বাড়িওয়ালা মাসিক দশ টাকা ভাড়ার কিছুই নিতেন না। শুধু ভরপেট খাওয়ার জন্য যোগান দিতে হোত নিচে পাইস হোটেলের পাঁচ পয়সা (বর্তমান আট পয়সারও কম) মাত্র।

এইসময় 'অমৃতবাজার', 'অ্যাডভান্স', আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকাগুলি তাঁর হয়ে প্রচার করে। ১৪ই জুনের 'অমৃতবাজার' হেডিং দিচ্ছে—

SJ RAMNATH BISWAS

BENGALE WHEELER

Cycles round different parts of the world.

১৫ই জুনের 'অ্যাডভান্স' জানাচ্ছে—"এখন পর্যন্ত ২৯০০০ মাইল পথ ছুটে চলায় এ যাত্রা মৃত্যুর সাথে তাঁর জুয়াখেলা ছাড়া আর কিছুমাত্র নয়।"

জুলাই-এর প্রথমেই আবার গড়িয়ে দেওয়া গেল দু'চাকা। তন্নতন্ন করে ঘুরে দেখলেন বিহার, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী, গুজরাত্, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, গুজরখান-রাওয়ালপিণ্ডি ও তক্ষশিলা, (হরাপ্পা, হাসান আব্দেল, আটক, নৌসেরা)। উপমহাদেশের পরিক্রমা অন্তে একের পর এক দেশ—আফগানিস্থান, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন হয়ে পৌঁছন নবীন তুরস্কে। তুরস্ককে তিনি দেখেন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কোণ থেকে। 'তরুণ তুর্কী' তাঁর প্রথম লেখা বই। সংস্কারাচ্ছন্ন তুর্কী জাতটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে নেতা কামাল পাশার দেশকে নতুন যৌবনের আলোয় প্রতিষ্ঠা করাকে বিস্ময়কর উদ্বুদ্ধতার প্রতীক মনে করেছেন তিনি। তুরস্ক থেকে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দিলেন ইউরোপ মহাদেশে। বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানি, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স। এক একটি দেশ অতিক্রম করেছেন আর মনের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছে এক অনাস্বাদিত যুদ্ধ জয়ের আনন্দ। এপারে ফ্রান্স, ওপারে ইংল্যান্ড। মাঝে ঐতিহাসিক 'ইংলিশ চ্যানেল'। তাও পার হয়ে ১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে প্রবেশ করলেন 'স্বপ্নের 'বিলেত' তথা ইংল্যান্ডে। কিন্তু পকেটের কয়েকটি মাত্র পেনি জলখাবার খেতেই শেষ হয়ে গেল। ওদিকে 'ইস্ট-এন্ডে' ঘর ভাড়া করে ফেলেছেন। দুদিন অভুক্ত। পেট চোঁ-চোঁ, মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে। শেষে এক মৃদি (সিলেটি মুসলমান) সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারই ব্যবস্থাপনায় চললেন রেস্তোঁরায়, জমজমাট বিক্রিবাটার সময়। রামনাথ সিলেটিভঙ্গি ও ভাঙা ইংরেজিতে বলে চলেছেন তাঁর ভ্রাম্যমাণ জীবনের অনবদ্য অভিজ্ঞতা। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে সব ফেলে। পর্যটকও হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর সময় জ্ঞান। শেষে চিন্তান্বিত রেস্তোঁরার মালিক ছুটে এসে থামিয়ে বলে, "এবার দয়া করে থামো। এক ঘণ্টার বেশি বলেছ। আমি তো তোমাকে আধ ঘণ্টার চুক্তি হিসাবে দশ পাউন্ডের বেশি দেব না।"

এইভাবে দিনের পর দিন বক্তৃতা করে মেটাতে হয়েছে অর্থের প্রয়োজন। শুধু কি তাই! সে প্রয়োজন মেটাতে কত রকমের যে কাজের দায়িত্ব নিতে হয়েছে যাত্রাপথে, তার ইয়ত্তা নেই। সান্ত্বনা, কোনও কাজকেই কখনও হীন মনে হয়নি। তাছাড়া ছিল বিভিন্ন দেশের স্থানীয় ভাষায় লেখা পোস্টকার্ড সাইজে বিজ্ঞপ্তিপত্র। তাতে লেখা থাকত, এ পর্যন্ত ঘুরে আসা দেশগুলির নাম ও বিবরণ। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল কিছু সাহায্য পাওয়া। যা দেখিয়ে এবং বিলি করে মানুষজনের কাছে পরিষ্কার ভিক্ষে করতে হতো। তাঁর ভাষায়—'একাজ ছিল সাইকেল ভ্রমণ অপেক্ষা দ্বিগুণ কঠিনতরো।'

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—অগ্রিম বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে নিজেকে যতটা পারা যায় 'সেফ' করা; অনেক বাড়তি ঝুটঝামেলা বা 'উল্টা বুঝলি রাম' হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এইভাবে ব্রিটেন ও স্কটল্যান্ডে ঘুরে তারপর আয়ার্ল্যান্ডে যাবেন। এমন সময় অমানুষিক পরিশ্রমের দরুন শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ঠিক করলেন ভারতে ফিরবেন। প্রিয় সাইকেল শুদ্ধ জাহাজে উঠলেন ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে।

দেশে ফিরে উঠলেন সেই ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোডের আশ্রযে। ইউরোপ ফেরা বিপ্লবী গন্ধ থাকা মানুষ। সম্ভবত 'ইংরেজ সরকারের অনেক সর্বনাশ ঘটিয়ে এসেছেন এবং আবও কত কি ঘটাবার ফন্দিফিকিরে আখড়া ফেঁদেছেন।' কেবল এই সন্দেহে, বাঙালি পুলিশ অফিসার বাসা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে লর্ড সিনহা রোডের অফিসে শুরু করলেন জেরা। মূল্যবান সমস্ত 'প্রেস কাটিং' কেড়ে নিলেন। যা ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে হতে পারত অমূল্য সম্পদ। একদিন বুলগেবিয়ায় সংবাদপত্র অফিসে 'রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ' প্রমাণ চাইলে, রামনাথ সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার বাংলায় লিখে দেন—"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার পরে"। পরেব দিন কাগজে ঐ হাতের লেখাই ব্লক হয়ে বের হয়। ওপরে বড় বড় করে ছাপা—

"ঠাকুরের দেশের লোক বিশ্বপরিক্রমায়,
তূণীরে নিয়ে তাঁব গান।"

আমাদের পুলিশী কর্তব্যবোধেব দাপটে সে সমস্ত জাতীয় দলিলের ধারা মরুতে হয়েছে হারা। নামে 'বিশ্রাম' হলেও, কাজে মোটেই তা নেননি। তলে তলে প্রচণ্ড রকমেব প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ব্যয়-বহুল মোক্ষম 'ট্যুর' পরিকল্পনাব। অমূল্য পাথেয় হিসাবে সঞ্চয়ের খাতায় যোগ করলেন বিশ্বকবির আশীর্বাদ—

With my blessings
to the intrepid adventurer
Ramnath Biswas

20/1/37 আশীর্ব্বাদ
শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাবী অর্থ সঙ্কটের কিছুটা আগাম সমাধানকল্পে এই সময় 'যা হয়—তা হয়' করে বেশ কিছু ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লিখে 'প্রবর্তক', 'দেশ', 'বসুমতী', ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র পত্রিকা অফিসে জমা দিতে লাগলেন। কিন্তু সেগুলির প্রকাশযোগ্য সংশোধন করতে গিয়ে বিভাগীয় সম্পাদকদেব একেবাবে ল্যাজে-গোবরে' অবস্থা হোত। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, শুধু 'দেশ' পত্রিকাতেই সর্বসাকুল্যে বের হয়েছে ৬০ বারের চেয়েও বেশি। আর সে সমস্ত লেখা পাঠকদের জন্য 'ঠিক-ঠাক' সাজাতে ঐ বিভাগের সাহিত্যিক-গবেষক যোগেশ বাগলের চোখ দুটির স্নায়ুগুলি কান্নাকাটি ফেলে দিয়েছিল।

কলকাতা বাসের আয়ু ছ'মাস কাটিয়ে পাড়ি জমালেন বিশ্বপরিক্রমার তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে। তখন ১৯৩৮এর শুরু। এবার প্রথম লক্ষ্য আফ্রিকা মহাদেশ। ভ্রমণে চিন যদি তাঁর প্রিয় দেশ হয়, আফ্রিকার মাটি তাহলে তাঁকে টেনেছিল মায়েব মত। কালো সাদাব কেমন পার্থক্য, কেমনই বা সেখানকার জল-জঙ্গল, যেখানে সূর্যের আলো ঢোকে না; বিষাক্ত সব গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জন্তু-জানোয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসবের অন্তরঙ্গ স্বাদ পেতেই নির্ভীক ভবঘুবে আফ্রিকার কোলে ঝাঁপ দিতে ধেয়ে চললেন।

বম্বে হতে জাহাজে করে আফ্রিকার মোম্বাসা শহরে পৌঁছান। সেখান থেকে ক্রমে উত্তর আফ্রিকার কেনিয়া, ভিক্টোরিয়া হ্রদ, উগান্ডা, টাঙ্গানাইকা, নয়াসাল্যান্ড সহ রোডেসিয়া হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্র্যান্সভাল, লরেনসোমার্ক, নাটাল, ডার্বান এবং কেপরাজ্য সফর করলেন।

এইবার সেই বহুবাঞ্ছিত, একান্ত কাঙ্খিত কানাডা তথা আমেরিকা দেখতেই হয়। না হলে যে অদম্য ইচ্ছেটার ভরাডুবি হবে। সে দেশে প্রথম প্রচেষ্টাতেই খেয়েছিলেন গলাধাক্কা। এত সহজে কি ভোলা যায়? ব্যথিত ও অপমানিত আত্মার 'কল্‌জে-কুষ্ঠি'তে তো এমন হারের কথা লেখা নেই। অনুমতির বাধা জয় করলেন, গেলেন, দেখলেন। না! সবটা বলা হোল না। এবং লিখলেন--নিজেকে উজাড় করে। তখন আমাদের প্রভু ব্রিটিশ। ব্রিটিশেরও প্রভু আমেরিকা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী দেশটা ঘুরে দেখলেন সে দেশের অতুলনীয় অগ্রগতির সাথে সাম্রাজ্যবাদীর তাণ্ডবনৃত্য। কি নিদারুণ বৈষম্য ও ব্যভিচার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, তা মর্মে মর্মে অনুভব করে নিঙড়ে দিলেন পেনের ডগায়। 'আজকের আমেরিকা'. 'হলিয়ুডের আত্মকথা', 'আমেরিকাব নিগ্রো', তারই নিদর্শন। বই তিনটি লেখার পর অনেক বন্ধুর কাছে নির্ভীক রামনাথ বলেছেন, "আমেরিকা সরকার আমাকে গুপ্ত হত্যা করতে পারে। করুক-- ভয় পাই না। আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র।" বাস্তবে, স্বাধীনতার পর আমেবিকার সঙ্গে হৃদ্য সম্পর্কের সুবাদে 'আজকের আমেরিকা' ও 'আমেরিকার নিগ্রো' কিছুকালের জন্য নিষিদ্ধ হয় ভারত সরকার কর্তৃক।

ভূপর্যটক যখন মরিযা হয়ে ক্রমাগত আমেরিকা সফর করে চলেছেন, তখন একের পর এক আসে দুঃসংবাদ। পশ্চিমি দেশগুলিতে আগেই হিংস্র চেহারায় দেখা দিয়েছে ফ্যাসিবাদ ও জঙ্গীবাদ। তারই লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে বেজে উঠল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। ভার্সাই সন্ধির নানা ভুল, জার্মানির উপর ক্রমাগত ক্ষতিপূরণের চাপ, হ্বাইমার (Weimer) প্রজাতন্ত্রের সংকটাকীর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, ফ্রান্সের একান্ত নিরাপত্তার অন্বেষণ, ১৯২৯-৩০ খৃঃ পৃথিবী জুড়ে অদ্ভুত মন্দা এবং তার ফলে জার্মানি, স্পেন, ইতালি, জাপান প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান, পাশ্চাত্য দেশগুলির অন্ধ সোভিয়েত বিরোধিতা এবং সর্বোপরি নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তিরক্ষায় জাতিসংঘের ব্যর্থতা প্রভৃতি ঘটনাগুলি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারক গ্রহ। তার উপরে, স্পেনের গৃহযুদ্ধে ইতালি ও জার্মানির সরাসরি হাত মেলানো, ইতালির ইথিওপিয়াকে গ্রাস করা এবং চিন দেশ জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় এই পরিস্থিতি হয়ে ওঠে আরও ভয়ঙ্কর অগ্নিগর্ভ। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে রামনাথ তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে সমস্তরকম কম্পন শুনতে পাচ্ছেন। সে অনুরণন দিকে দিকে আগ্রাসনের রণহুঙ্কার, মারণ যুদ্ধের ঢক্কানাদ।

এই বিপরিস্থিতির মাঝে আদৌ আর ঘোরা সম্ভব ছিল কি না, এ বিষয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। শরীরও আর তেমন করে মজবুত লাগছে না। একদিন আমেরিকার ট্রেজার আইল্যান্ডের মাথায় বিশাল সেতুর মাঝে দাঁড়িয়ে। সেই

চিরপরিচিত ছটফটে মনটা কোথায় যেন হারিয়ে যেতে চায়। উদাস দৃষ্টি বহুদূর-দিগন্তে পলকহীন। চতুর্দিকে ঘিরে ধরেছে নির্লিপ্ত ও বিচিত্র শান্ত সমাহিত অনুভূতি। সিদ্ধান্ত নিলেন, এখানেই টানবেন সুবিশাল পরিক্রমার ইতি। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি। কোনও রকমে বম্বে পর্যন্ত 'প্যাসেজমানি' যোগাড় করে চেপে পড়লেন জাহাজে। সীমাহীন কষ্টের ফসল বুকে নিয়ে, দিগ্বীজয়ী বীর বিশ্ব সফর শেষ করে, এপ্রিলে পা রাখলেন কলকাতার মাটিতে। ফিরলেন। কিন্তু ঘরের ছেলে হয়ে নয়, পৃথিবীর মানুষ হয়েই। ভুবনজোড়া 'ট্রেজার আইল্যান্ড' হৃদয়ে ভরপুর করে নিয়ে এলেন, দেশের মানুষের কাছে বিলিয়ে যাওয়ার জন্য। যাত্রা শুরু করেছিলেন কানাকড়িহীন অবস্থায়। আজও তাই। নিঃসম্বল। কেবল যোগের খাতায় আখ্যা পেলেন 'ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস'—বাঙালি ও বাঙলার গর্ব হয়ে।

দরদী মানব শিল্পী রামনাথের সংবেদনশীল মনে রঙ-বেরঙের প্রশ্ন জাগে। আর সেইসব প্রশ্নের ঠিকঠাক সদুত্তর পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে করে তুলেছিল ঘরছাড়া পাগল। দেশ-বিদেশের মানুষ এবং তাদের জীবনযাত্রার সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহলই তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, পৃথিবীর পথে-প্রান্তে। জিজ্ঞাসু শিল্পীমন অধীর আগ্রহে দেখতে চেয়েছে, পৃথিবীর এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের রঙে-রূপে-গুণে কিসের পার্থক্য। তাদের প্রত্যেক দিনের সুখ-দুঃখ, মনুষ্যত্ব-পশুত্ব, আশা-নিরাশাব দ্বন্দ্ব সমন্বিত প্রত্যক্ষ জীবনই তাঁকে করে তুলেছে মানব সন্ধানী। অকুণ্ঠিত চিত্তে পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে নিজের সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন দেখবার ও জানবার অপার বিস্ময় বোধ থেকে।

পর্যটকের মহাপ্রয়াণে যশস্বী সাংবাদিক—সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় রামনাথ জীবনবেদের গভীরে ডুব দিয়ে 'যুগান্তর' সম্পাদকীয়তে (৩-১১-১৯৫৫) মেলে ধরেন তাঁর সুজলা-সুফলা-কলম—'প্রখ্যাত ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে সকলেই মর্মাহত হইবেন। শ্রীহট্টের এক স্বল্পবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সামান্য বেতনের চাকুরি দিয়া জীবন আরম্ভ করিয়া বিশ্বাস মহাশয় নিছক পৌরুষ ও প্রাণপ্রাচুর্যবশেই কখনো পদব্রজে কখনো বা বাইসাইকেলে প্রায় সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন—এশিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার উল্লেখযোগ্য স্থান তিনি প্রায় সমস্তই পরিক্রমা করিয়াছিলেন এবং সর্বত্রই তিনি চাষী, কারিগর ও সাধারণ মানুষের জীবনধারা শ্রদ্ধা ও দরদের সঙ্গে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অভিজ্ঞতা তিনি বিভিন্ন মনোরম রচনার মাধ্যমে পরিবেশনও করিয়া গিয়াছেন। 'তাঁহার 'তরুণ তুর্কী', 'মরণ বিজয়ী চীন', 'আমেরিকার নিগ্রো', প্রভৃতি রচনা একাধারে উপভোগ্য ভ্রমণ কাহিনী ও সমসাময়িক দুনিয়ার বাস্তব আলেখ্যরূপে এদেশে প্রভূত সমাদরে পঠিত হইয়াছে। বাংলাদেশে সাধারণত মানুষ শান্ত ও নির্বিবাদ জীবনযাপনেরই পক্ষপাতী— দুর্গমপথে, দুঃখ ও দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করিয়া জগৎ এবং জীবনের সঠিক পরিচয় সংগ্রহ করার সাহস অনেকেই দেখাইতে পারেন না। সেই অপবাদের মূর্ত প্রতিবাদ ছিলেন স্বর্গীয় রামনাথ

বিশ্বাস। পদে পদে বিপদ বাধা ও সঙ্কটকে তিনি দৃপ্ত পৌরুষে জয় করিয়াছিলেন—মধ্য এশিয়ার দুর্গম মরুপথে, উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকার গিরি-নদী-পর্বত সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যপথে যেভাবে তিনি নিজের জীবনকে হেলায় তুচ্ছ করিয়া ঘুরিয়াছেন, তাহার ইতিহাস যে কোন প্রখ্যাত পর্যটকেরই ঈর্ষার বস্তু। পদ ও অর্থের সঞ্চয় লইয়া দেশে দেশে ঘোরা সহজ—ঘুরিয়াছেনও কেউ কেউ, কিন্তু নিঃসম্বল অবস্থায় পিঠে একটা ঝোলা ও হাতে একখানা সাইকেল মাত্র লইয়া দুনিয়ার পথে পথে ঘোরা যে কি ব্যাপার, তাহা নিশ্চিন্ত গৃহ পরিবেশে অবস্থিত মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। তিব্বত অভিযানকারী স্বর্গীয় শরৎ দাস ছাড়া এমন দুঃসাহসীর সংখ্যা আমাদের ইতিহাসে বেশি নয়। অথচ এমন একজন দেশ-বৎসল দুঃখব্রতী পর্যটকের জীবনের শেষ অধ্যায় অভাব ও ব্যাধির মধ্যে কাটিয়াছে, ইহা বঙ্গদেশের পক্ষেই প্রগাঢ় লজ্জা ও বেদনার কথা। কিন্তু অভাব, অস্বাস্থ্য কিছুই তাঁহার চিত্তবল ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই—সর্বদা তিনি উদ্যম ও প্রফুল্লতায় পূর্ণ থাকিতেন। তাঁহার মত ব্যথা বিজয়ী দেশপ্রেমিক কমই ছিলেন—ছাত্র ও যুব সমাজকে সর্বদা তিনি ভ্রমণে অনুপ্রাণিত করিতেন এবং বলিতেন, জগৎ ও জীবনকে হাতে কলমে যাচাইয়া দেখুন, বিদেশের সঞ্চয় আনিয়া দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করুন। তাঁহার সেই উপদেশ আশা করি যুবজনের চিত্তে ভ্রমণ ও মননের উৎসাহ যোগাইবে। ৬২ বৎসর বয়সে রামনাথ বিশ্বাসের জীবনান্ত হইয়াছে—কিন্তু তাঁহার কীর্তির কথা বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি কোনও দিনই ভুলিবে না।'

একদিন 'আনন্দমেলা' পত্রিকার অফিসে গেছি, পুরনো একটা জমা দেওয়া লেখার সামান্য সংস্কারের জন্য। তখনকার সহকারী সম্পাদক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে সম্পাদক হন) আমাকে দেখেই খপ্ করে হাতটা ধরে বললেন—"এ্যায় মশাই, রামনাথের ওপর একটা 'হিস্টোরিক্যাল ফিচার' করে দিন তো" প্রচ্ছদ ইস্যু করবো।

আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন রাখি—কে রামনাথ?

—"ভূপর্যটক রামনাথ। রামনাথ বিশ্বাস।"

—নাঃ। আমি চিনতে পারলাম না তো!

—'দ্যার মশাই, অ্যাতো ঘোরেন-ফেরেন, লেখা-লেখি করছেন, আর রামনাথের নাম শোনেন নি? বাজে কথা বলছেন!'

—'আরেহ্! বাজে কথা বলব কেন? সত্যিই এ নাম আমি প্রথম শুনছি। কে লোকটা? কোথায় থাকে? কি করেন? আর আপনার ঘাড়েই বা চাপল কেন?' এতগুলি প্রশ্ন গায়ে-গায়ে ছুঁড়ে দম নিই।

—'খোঁজ পত্তর করে দেখুন না।' বলে চোরা মুচকি হেসে সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মুহূর্তে গুরুগম্ভীর। অর্থাৎ 'কোল্ড সোলডার' দেখিয়ে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, 'বিশ বাঁও' জলে। আর তখনই, ঘাড়ে নয়, আমার মাথায় চাপল রামনাথের ভুত। দিবারাত্র মনের মধ্যে কে যেন দাপিয়ে বলে বেড়াচ্ছে— "রামনাম হুম-হাম"। পুরনো যত 'স্পোর্টস' এর মানুষজনের কাছে খোঁজ নিতে গিয়ে

শুনি—"হ্যাঁ, আমাদেব যৌবনে রামনাথ বিশ্বাস ছিল 'ইনস্‌পিরেশন'। দু'চারটে লেখা বইও পড়েছি। কিন্তু, তারপর কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।"

সাহিত্যিক বিমল কর এবং সাহিত্য ইতিহাসের দিক্‌পাল অসিত বন্দ্যোপাধ্যায বললেন—"আমরা যখন কলেজে পড়ি, তখন খুবই আগ্রহের সঙ্গে ওনার বক্তৃতা শুনতাম। কেমন মনের মধ্যে একটা উন্মাদনা ফেলতেন ভদ্রলোক। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা যে যার কাজে ছিটকে পড়ি। মানুষটাও কখন 'ফেড আউট' হয়ে গেল। একথা ঠিক, ভদ্রলোক তখনকার দিনে ভালরকম 'ফিগার' ছিলেন"।

রোখ্ চেপে গেল। তাহলে তো জানতেই হয়, কে এই রামনাথ? সকাল থেকে সন্ধে। দিন থেকে মাস। মাস থেকে বছর পার হয়ে গেল, কবে। চাই তথ্য। আরও তথ্য। যত ঢুকেছি রামনাথ সাগরে, ততই মনে হয়েছে এখনও পাচ্ছি না তল। বেড়েছে শুধু সীমাহীন কৌতূহল। ধ্বনিত হয়েছে কেবল অতৃপ্ত আত্মার জিজ্ঞাসা। সেই কোন তিরিশের দশকে রামনাথ যখন পৃথিবী কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন, লিখে চলেছেন একের পর এক ভ্রমণ কাহিনী, তখন যে আমাদের জন্মই হয়নি। পরবর্তীকালে এক-আধজন কিছুটা স্মৃতিচারণ করেছেন মাত্র। এছাড়া তাঁর ওপর কাজ যে প্রায় কিছুই হয় নি। মানুষ মনে রাখবে বা জানবে কিভাবে? আসুন, ইতিহাসের ঘুণে ধরা পাতা থেকে সাধ্যমত খুঁজে পেতে এক মহান পূর্বপুরুষকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা-তর্পন করি।

খট্ খট্ খট্-খট্। কড়া নাড়ছি, উত্তব কলকাতায় 'খান্না' সিনেমার কাছে, হরি সাহা মার্কেটের কোন-খসা সিঁড়ি ভেঙ্গে দক্ষিণ দোতলার এম-৬ নম্বর ঘরে। দরজা পুরোপুরি খুলতে না খুলতে নজবে আসে কিছু। স্ত্রীকে আড়ালে ঠেলে মধ্য বয়স্ক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু চোখে দরজা হাট করতেই প্রশ্ন রাখি—'আচ্ছা, এই ঘরে অনেক বছর আগে রামনাথ বিশ্বাস থাকতেন। আপনি জানেন কিছু?'

---'নেহি বাবুজী, বামনাথ উম্‌নাথ কিসিকো হম্ পহ্‌চন্তা নেহি।' তো এই হল গিয়ে হাল আমলের রামনাথ 'কিস্‌সা'। অথচ এই সেই ঘর, যে ঘরে ভূ-পর্যটন শেষ করে ব্যথাবিজয়ী দেশপ্রেমিক জীবনের বাকি পনের বছর কাটিয়ে গেছেন। বিরামহীনভাবে লিখেছেন অসংখ্য ভ্রমণ কাহিনী, গল্প, উপন্যাস—আমৃত্যু। কাতারে কাতারে দুঃস্থ অবহেলিত মানুষের জন্যে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত এবং সাধ্যের চেয়ে অনেক বেশি সাহায্য-সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন—অনায়াস ভঙ্গিতে। কখনও চাননি কিছুমাত্র প্রতিদান। হাজার হাজার কিশোর ও যুবকদের মধ্যে করেছেন টগবগে রক্তের প্রাণ সঞ্চার। তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন, "জগৎ ও জীবনকে হাতে কলমে যাচাইয়া দেখুন, বিদেশের সঞ্চয় আনিয়া দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করুন।" তখন এটা অবশ্য ছিল লিজ নেওয়া 'হিমালয় বোর্ডিং-এর নিয়ন্ত্রণে একটি বাসা ঘর। সে বোর্ডিং আজ নিশ্চিহ্ন।

চিহ্নের সন্ধানে বরং চলে আসুন, শিয়ালদার কাছে ৫৪/১ সূর্য সেন স্ট্রিটে। পথ নির্দেশ পঞ্জিকা ঘেঁটে দেখি উপরোক্ত ঠিকানা থেকে শুরু হয়েছে 'ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস লেন'। কৌতূহলী হয়ে লেনটির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত বহু বাসিন্দাকে

জিজ্ঞেস করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। শেষে পৌঁছই সত্তরের কাছাকাছি এক বৃদ্ধের কাছে। অনেক চিন্তা করে বললেন, ''বাপু হে, আমার এই গলিতেই জন্ম। 'হলওয়েল' নাম পাল্‌টে 'রামনাথ বিশ্বাস লেন' হোল তা দেখেছি। কিন্তু রামনাথের সঙ্গে এ গলির সম্পর্ক কিভাবে হয়েছে, বলতে পারব না।'' পারলেন সামনেই প্রতিষ্ঠিত হোমিও ডা চুনী বর্মন এবং ছকু খানসামা লেনের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারবাবু ও সমাজসেবী ডা কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ। রামনাথ মারা যান ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর, ভোর সাড়ে তিনটেয়। ক'দিন পরে কিছু অনুরাগী ভক্ত বন্ধু আলোচনায় বসেন—''এতোখানি মানুষ যোগ্য স্বীকৃতি পেলেন কই? না, তাঁর অভিজ্ঞতার মূল্যে, না প্রতিষ্ঠার সূত্রে, না কর্মযোগী হিসেবে। শেষ জীবনের নামমাত্র সরকারী বৃত্তি, ছুঁড়ে দেওয়া কিছু সম্মান, কটা হাততালি বাহ্‌বা তাঁর যোগ্য মাপকাঠির তুলনায় কিছুমাত্র না। আমরাও এমন মানুষের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। অন্তত একটা রাস্তা তাঁর নামে রেখে স্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে ক্ষুদ্রতম কাজ করা যেতে পারে। না হোক সে রাস্তার বাসিন্দা, না থাক সে রাস্তার সঙ্গে রামনাথের নাড়ির সম্পর্ক। এর কাছেই তো ছিলেন ফিরে ফিরে কয়েকবার।''

এলাকার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি—যাদবেন্দ্র পাঁজা, মোহিনী বর্মণ, বরেণ দাঁ, চুনি বর্মণ প্রভৃতির শুভেচ্ছায় ও ডাঃ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'হলওয়েল লেন' হোল 'ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস লেন।' নতুনকে বরণ করে বয়োজ্যেষ্ঠ গেল প্রাক্তনের দলে, 'স্যালুট' জানিয়ে।

কিছু স্মৃতি বুকে নিয়ে এখনও বেঁচে আছেন অশীতিপর বৃদ্ধ সত্যদুলাল পাল চৌধুরী। বর্দ্ধমান থেকে হেমাতপুর রুটে আরও দেড় ঘন্টার বাস জার্নি করে নিরালা গ্রাম 'কামারকিতা'র বাড়ি পৌঁছাই। ইনি ছিলেন রামনাথের সহবাসিন্দা ও বন্ধু, শেষজীবনের। এই বয়সেও অটুট স্বাস্থ্য (জানি না, রামনাথের হাওয়া পেয়েছিলেন কি না)। সোজা হয়ে বসে হাতড়াচ্ছেন স্মৃতির কুলুঙ্গিতে, কিভাবে সাজিয়ে বলবেন। প্রশ্নটা প্রথমে আমিই ছুঁড়ে দিই সুবিধের জন্য—আপনারা কত বছর বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন?

—দশ বছর।

—দশ বছর তো অনেক সময়। তা এই সময়ের মধ্যে মানুষ হিসেবে কেমন দেখেছেন বা বুঝেছেন?

—লোকটার মধ্যে কেমন একটা সিংহবিক্রম যেন ফুটে বেরুতে চাইত। অন্যায় সহ্য কিছুতেই করতে পারত না। যেমন দুঃসাহসী তেমনি আবার দুর্মুখ। যার সঙ্গে বনত না, চোয়াড়ে ভাষায় সম্পর্ক ছিন্ন করতে একটু বাধত না।

—তাহলে আপনাদের গল্পগুজব নিশ্চয়ই জমত না?

—উঁহু! ভুল ধারণা। একদম উল্টো। আমরা ওর মানসিকতা জানতাম কি না। আসর জমাবার অমন ভাঁড়ার ভাগ্য আর কজনার হয়?

—বাড়ির সম্বন্ধে বা মা-বাবাকে নিয়ে কিছু আলোচনা কখনো হয়নি?

—না। মা' তো জ্ঞান হওয়ার আগে মারা গেছেন। আর বাবার ব্যাপারে আশ্চর্যরকম নিরব থাকত। আমরাও তাই ঘাঁটাতাম না। তবে বুঝে নিতে অসুবিধে হত না। কারণ বাড়ির আবহাওযা যে খুবই ধর্মীয় গোঁড়ামির জালে আবদ্ধ এবং তাই নিয়েই রামনাথের সঙ্গে বিরোধ এ তথ্য আকারে-ইঙ্গিতে মাঝে মধ্যেই পাওয়া যেত, ওরই মুখে।

—কেন, ধর্ম-কর্ম কি একেবারেই পছন্দ করতেন না?

—ওরে বাবা! ধর্ম নিয়ে যারা মাতামাতি করে তাদের ওপর খড়্গহস্ত। একদিন ঐ এম-ছয় বাসা ঘরে আমাদের পাঁচ ছ'জনে মিলে গল্প-ইয়ার্কি-ঠাট্টায় আসর জমে উঠেছে। এমন সময় একজন ফস্ করে বলে উঠল—আচ্ছা রামবাবু, আপনি পৃথিবী না ঘুরে যদি খুড়তুতো ভাই জীতেন্দ্রনাথ (চন্ডিকানন্দ)-এর মতো রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু হতেন, তাহলে কি হোত?

প্রশ্ন শেষ করার মুহূর্তেই আঘাত হানল- -"বড়লুকের চাকর হওনের আগে পুন্দে একটা লাত্থি মাবিয়া আপনারে অউখানো পাঠাইতাম 'দূত' বানাইয়া। কয়দিন পব ফিরতা নিশ্যই (ফিরতেন নিশ্চয়ই) ভূত হইয়া। ত' খোঁয়াড়ের অই 'ভূতনা' রূপ দেইখ্যা কেডা আর জীবন-যৌবন ছাঁইট্ট্যা (ছেঁটে) খাসি হইতে 'ইন্টারেস্টেড' হয়? কয়েন ত মশয়রা হ্যালার হ্যালাকে (শ্যালকের শ্যালককে)"।

—বেফাঁস প্রশ্নকর্তা পাঁচনমুখে চুপ করলেও আব সকলে হাসিতে ফেটে পড়ল। অনেকেব কাছে অদ্ভুত মনে হলেও এটাই ওর জীবন-দর্শনের একটা বলিষ্ঠ দিক। ধর্মের ব্যাপারে এমন অনেক উদাহরণ আছে। শুনবেন? তাহলে লিখে নিন।

—সভয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠি, না, না, এটাই যথেষ্ট।

গেছি বইপাড়ার তখনকার উচ্চারণ' এর মালিক অনিল দেব এব বাড়ি। সোনারপুর স্টেশন থেকে বেশ কয়েক কিমি. দূরে স্বর্ণকার পাড়ায়। ইনি রামনাথেব বই ছেপেছেন। সখ্যতাও ছিল ভালই। সন্ধে হয়ে গেছে। গ্রামের শঙ্খধ্বনি হয়ে যাওয়াব পরে ব্যাঙ ও ঝিঁঝিঁপোকা জমিয়েছে আসর। কুটীরের সামনে থমকে দাঁড়াতে হল। কেননা শন পাকা চুল-দাড়ি নিয়ে প্রাচীন ঋষির মূর্তিতে স্ত্রীকে পাঠ করে শোনাচ্ছেন গীতা। মহাভারতীয় চলচ্চিত্রনির্যাস। অমায়িক আতিথেয়তার মাঝে প্রশ্ন রাখি আপনি কেমনভাবে চিনেছিলেন বিশ্বাসবাবুকে?

—ভারী স্বাধীনচেতা মানুষ। ব্যক্তিগতভাবে কোনও অহংকার ছিল না। তবে, উনি যে বাঙালি, এই অহংকার সমস্ত জায়গায় প্রতিষ্ঠা করতেন।

—নিজের দেশকে কেমন ভালবাসতেন?

— তখন উনি ইন্দোনেশিয়ায় বেড়াচ্ছেন। সব দোকানে লেখা আছে 'পিওরিটি গ্যারান্টিড'। এক জায়গায় শুধু লেখা আছে —'পিওরিটি নট গ্যারান্টিড। ইমপোরটেড ফ্রম ইন্ডিয়া" দেখে এমন মর্মাহত হলেন যে, সারাদিন কিছু না খেয়ে, না বেড়িয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলেন।

—বিশেষ কিছু অভ্যেসের হদিস?

—প্রতিটি ক্ষেত্রে সব কিছু খুঁটিয়ে জেনে নেওয়ার অদম্য ইচ্ছা ছিল। উগান্ডায় একবার পর্যটক অবিবাহিত শুনে মানুষজন হাসাহাসি করে। পরে ডাঁটার মত একটি ফল উপহার দিয়ে বলে, বিয়ে হলে খেও। আইবুড়ো কার্ত্তিক-এর মাথায় চাপল, আজই দেখা যাক্ না। খেয়ে নিলেন। সারারাত উত্তেজনায় সে কী 'নাকানি-চোবানি' অবস্থা।

ঝোপ বুঝে কোপ মারি।- --বিয়ে করলেন না কেন?

থমকে গিয়ে মুচকি হেসে বললেন—ব্যাপারটাই স্বাধীনচেতা। কখনও বাঁধা পড়তে এসব মানুষ চায় না তো। তবে সিঙ্গাপুরে থাকার সময় জীবনটাকে দু'হাতে ভোগ করে নিয়েছেন।

—তাহলে কিছুটা খাদ আছে, বলুন?

—উঁহুঁ! নিখাদ।

—এরপরেও নিখাদ বলছেন কিসের জোরে?

—মুখমণ্ডলে স্মিত হাসি ছড়িয়ে দিয়ে আরও ধীর গলায় বললেন—সেটা আপনারা গবেষণা করে দেখুন না।

অন্ধিসন্ধি জানতে হাজির হই সাউথ সিঁথিতে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দারের বাড়িতে। ইনি ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক। এখন অবসরপ্রাপ্ত। তখন থাকতেন বইপাড়ায়। তাঁর সহজাত ঝোঁকমুখী প্রশ্নই প্রথম রাখি---রামনাথের সাহিত্য প্রচেষ্টা সিঁড়ি ধরে কতদূর গিয়েছিল, আপনি মনে করেন?

- তাহলে আগে একটা মনে পড়া প্রসঙ্গ বলি। একদিন আমরা পাঁচ ছ'জন বন্ধু আড্ডা দিচ্ছি খোস মেজাজে। এমন সময় কালচার প্রসঙ্গ ওঠে। একজন জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা রামবাবু কালচার কি? রামবাবু দাঁড়িয়ে উঠে লুঙ্গি তুলে ধরলেন। অবশ্য এর ব্যাখ্যা রামনাথের পক্ষে হয়, আবার বিপক্ষেও কবা যায়। আসলে, জীবনটা অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন বলে মনটা সাহিত্য উপযোগী পরিশীলিত করে উঠতে পারেননি। ফলে, এই দিকটা আর তেমন করে হলো কই? সামান্য চিন্তা করে নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত কণ্ঠে বললেন—'তবে 'ওভারঅল' মানুষটার তুলনা উনি নিজেই। বহু গুণের আধার। আমি তো নিজেই একবার পরীক্ষা করতে গিয়ে দারুণভাবে হার মেনেছিলাম। আমার বাড়িতে এসে জমিয়ে বসেছেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় বললেন, ''অরবিন্দ, বৌমারে তো দেখতাছি না? আমি কাঁচুমাচু হয়ে জবাব দিই—লজ্জার কথা আর বলবেন না দাদা। আপনার বৌমা পালিয়েছে''। একথা শুনে, কয়েক সেকেন্ড পলকহীন বোবার মত তাকিয়ে নিঃশব্দ মানসিক যন্ত্রণায় ভেঙে পড়লেন। মুহূর্তে পরকষ্টকে নিজ যন্ত্রণায় পরিণত করার শোচনীয় দৃশ্য দেখে, তক্ষুণি স্ত্রীকে ডাকতে পথ পাইনে। এটাই অন্য জনের ক্ষেত্রে হলে, 'নিঃশব্দ' ব্যাপারটাই হোত না। অনেক প্রশ্ন, অনেক কৌতূহল আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলত।

ছুটে গেছি, শান্তিনিকেতনে ডঃ বিনয় ভট্টাচার্যের কাছে। এঁকে বিশ্বভারতীতে 'অ্যানথ্রোপলজী'র অধ্যাপক হিসেবে এবং সরকারী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহু বিভাগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার সুবাদে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছোটাছুটিও করতে হয়। তাবলে, জীবনভোর কর্মকাণ্ডের মূল অবদান যে রামনাথের, সে ঋণবদ্ধতায় অকুণ্ঠচিত্ত হতে একটুও কার্পণ্য করেন নি। অসংখ্য প্রশ্ন-উত্তরের জটে খেই না হারিয়ে তাঁর ভাষাতেই শোনা যাক—

''মাত্র ৬ মাস বয়সে মারা যাওয়ায় বাবা কি জিনিস বুঝে ওঠা হয়নি। কিন্তু রামনাথ পাখীর ডানা দিয়ে আগলে রাখার মতো তিল তিল করে আমাদের বেড়ে ওঠাব সুযোগ করে দিয়েছিলেন। উনি ছিলেন—একাধারে দাদু-বাবা-বন্ধু। প্রতিদিন অনুভব করেছি, সারা পৃথিবী ঘুরে এসে হৃদয়টা তাঁর পৃথিবীর মতই উদার-মহৎ হয়েছিল। সবরকম মানুষের জন্যই তাঁর স্নেহ-ভালবাসা-উৎকণ্ঠা উপচে পড়ত। আত্মীয়তার বন্ধনে যেমন সামনে থেকে দেখেছি, তেমনি কিছুটা ব্যবধান রেখেও যাচিয়ে নিয়েছি, মানুষটার বিশালত্ব। পর্যটক ছাড়াও পৃথিবীর নানা 'ইনটেলেকচুয়ালস্' এসে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতো, তাদের 'থিসিস' দেখিয়ে উপদেশ নিত। দরজা তাঁর অবারিত। রাস্তার অভুক্ত ভিখারীকে এই এম-ছয় নম্বর ঘরে বসে খাইয়েছেন আবার ওই ঘবেই দেখেছি সুনীতি চাটুজ্যে, ভূপেন দত্ত (বিবেকানন্দেব ভাই) মুজঃফর আহমেদ-এর মতো মানুষেরা যথেষ্ট সম্মান দিয়ে আলোচনা করছেন। নিজ গুণেই ঘরটাকে করে তুলেছিলেন পৃথিবীব উদার উন্মুক্ত আঙিনা।

তখন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার এমনই ভয়ঙ্কর চেহারা, হরি সাহা মার্কেট থেকে শ্যামবাজার মোড় পর্যন্ত রাস্তাটুকু একটা ইঁদুর পৌঁছতে পারত। কিন্তু একজন মানুষ, সে হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক যেতে চাইলে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়তেই হবে। হয়েছেও। সেই সময় আমাদের এলাকার ওপর অন্যান্য মুসলমান এলাকার আক্রমণকে 'ফেস' করছে নীচেব 'ভালুক পাড়া' বস্তীর মানুষজন। অথচ এই বিশাল ভাড়াটিয়া বাড়িটির মধ্যে আছে মোট ৩৯ জন মুসলমান পুরুষ ও মহিলা। প্রায় ২০০ জন ভাড়াটিয়ার মধ্যে কারুর সেদিন এমন বুকের পাটা ছিল না যে, নামমাত্র 'প্রোটেকশন' দিয়ে একজন মুসলমানকেও বাঁচায়। ছিল একমাত্র এই মহৎ মানুষটাব। ৩৯ জন এসে পায়ে আছড়ে পড়তে ঝপাঝপ ব্যবস্থা করে ফেললেন, বাড়ির মধ্যেই। সারা ছোটবেলার মধ্যে শুধুমাত্র সেদিনই দেখেছি, দাদুর অমন উজ্জ্বল মুখ অঙ্গার হয়ে গেছে। সারাদিন-রাত সিঁড়ির মুখে পায়চারী করছেন, গার্ড দিতে। একদিকে, কাতর জীবন প্রার্থী অতগুলি মানুষের মরণ-বাঁচন সমস্যা-চিন্তা; অপরদিকে, তাদের বাঁচাতে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হবে। অথচ 'Duplicity' রক্তের মধ্যে ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। তাই পাচ্ছিলেন এতো কষ্ট।

ভোর রাতে একদল রক্তপিপাসু মানুষ অস্ত্রগুলি লুকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতেই একেবারে বাঘের সামনে পড়ল। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং। ক্ষুধার্ত প্রশ্নের উত্তরে বজ্র গম্ভীব স্বরে বললেন—''উফ্, খ্-উ-ব জ্বালাতন করতাছিস। না না,

আমার ইখানো আর নাই। সব ভাগিয়া গেছে। শুধাশুধি বিরক্ত করিছ না তো!" অস্ফুটবাক্ মুখ চাওয়াচায়িতে ফিরে চলল সব। দাদুর প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে চ্যালেঞ্জ করার স্পর্ধা একজনেরও সেদিন ছিল না।

শেষে, দাদা সমর ভট্টাচার্য (তখন আনন্দবাজারের সাংবাদিক) কোনওরকমে বেরিয়ে গিয়ে লালবাজাবে খবর দেন। সেখান থেকে বিরাট ভ্যানগাড়ি এনে সকলকে উদ্ধার করা হয়। বেশ মনে আছে, পুলিশ পাহারায় সকলকে যখন তোলা হচ্ছে, উনচল্লিশের মধ্যে আটত্রিশ জনই জীবন বাঁচানোর জন্য আমাদের প্রতি তাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। কেবলমাত্র একজনই শাসিয়েছিল— "কাফের, মালাউনের (বিধর্মী) বাচ্ছা, তোদের দেখে নেব।"

এবার ছোট্ট ব্যাকুল প্রশ্ন রাখতেই হয়—কিন্তু ভালুকপাড়া বস্তির লোকেরা? যারা নিস্‌পিস্ করা হাত নিয়ে দেখল, এতগুলো শত্রুকে হাতছাড়া করালেন?

—হ্যাঁ, ভ্যান চলে যেতেই ওরা চড়াও হয়েছিল। কিন্তু দাদু'র তখন ভয়ঙ্কর মারমুখী মূর্তির চেহারাই আলাদা। সিংহ-হুঙ্কারে ওদের দলপতির কলার এক হাতে চেপে ধরে অন্য হাতে শাসিয়েছিলেন—'এ্যাইও, চোপ্ শালা! তুর আদরের পুলাটা (ছেলেটা) 'শিবু' যদি 'শেল্টার' চাইত, তারেও এমনি কইরা মুসলমানদের খপ্পর হইতে 'সেভ' করতাম। বুঝলি?" গুট্‌গুট্ করে সব পালাতে পথ পায় না।

উঠবার আগে রাজনৈতিক মতবাদের ব্যাপারটা উস্‌কে দিই।—যতদূর জেনেছি, পরবর্তী জীবনে উনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কখনও হন নি। অথচ ডা: চুনী বর্মন এবং অন্যান্যদের কাছে শুনেছি, মুখে ও কাজে অমন সাচ্চা কমিউনিস্ট হয় 'কোটিকে গুটিক।' ভট্টাচার্য সন্‌স্ লিমিটেডের বর্তমান প্রকাশক খোকন বাবুর কাছে শুনেছি, সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির বহু 'মিটিং অ্যাটেন্ড' করতেন। বটতলা কেন্দ্রের এম.এল.এ. সুবোধ কুমার রায়চৌধুরীর হয়ে নির্বাচনী প্রচার ও বক্তৃতা পর্যন্ত করেছেন। তাহলে, রহস্যটা কি?

—এর সমাধান তো মিলবে ভাই জীবনের মাটিতে, অন্য কোথাও না। তখন চুটিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলন করি। সবে জেল খেটে ফিরেছি। গলায় পৈতে নেই দেখে মায়ের উৎকণ্ঠা ফুটে উঠতে সামান্য রুক্ষস্বরে জবাব দিই—'পৈতে জেলের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে এসেছি।'

মা কয়েক পলক মাত্র স্তব্ধ হয়ে গিয়ে, চোখে চোখ রেখে ধীর কণ্ঠে বললেন— "তুমি দেশের জন্যে কাজ করছ জানি। তোমার কাজের ক্ষেত্রে দেশ যেমন মা, আমিও তেমনি তোমার সমগ্র মা। ছেলের গলায় পৈতে দেখলে মা বড়ো খুশি হয়।"

সে মধুর আবেদনে সাড়া দিয়ে তক্ষুনি গলায় চড়ালাম পৈতে। কিন্তু বিপর্যয় বাধল অন্য জায়গায়। দুটো দিন যায়নি। একেবারে বাঘের সামনে।

রক্তচক্ষুতে আমার দিকে তাকিয়ে দাদু হাঁকলেন—'অরে, এই ছাগল গরু, ইটা কি পরছস? ফাঁসির দড়ি? অফিসিয়াল কমিউনিস্ট হওনের আগে ওইটা গাছের লগে গলায় বান্ধিয়া ঝুলিয়া পড়তো, ভূত কুনখানোকার!' বলেই ছিঁড়ে দিলেন পটাং করে।

এক সকালে ঢাকুরিয়ার বেনি ব্যানার্জী অ্যাভিনিউতে সাহিত্যিক গজেন্দ্র মিত্র-র মুখোমুখি হই। সরস্বতীর বরপুত্র। বাঙলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। মহাকালের ডাক এসেছে। এককালে রীতিমত সুপুরুষ লেখকের ঘরে ঢুকতেই থমকে পা আটকে যায়। কিছুক্ষণের জন্য হয়ে পড়ি নির্বাক। অথর্ব অবস্থায় বিছানাতে আধশোয়া। লক্ষ্য করি, সম্ভবত অসুস্থতার কারণে মিত্র মশাইয়ের স্মৃতির পারম্পর্য ভেঙে তছনছ করে ফেলেছে, ক্রমাগত। তবু প্রশ্নের পর প্রশ্নের ফলে খাপছাড়া উত্তর হলেও কিছুটা নির্যাস বের হয়ে আসেই।

চল্লিশের দশকে 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশনা ভবনে বসে 'মিত্র' বাবু এবং 'বিশ্বাস' মশাই উভয়ের ভাব-ভালবাসা-সখ্যতা, যেটুকু। সেইসূত্রে, সার্থক লেখকের তৃতীয় নয়ন—অনুবীক্ষণের চুলচেরা বিশ্লেষণে পর্যটক মশাইকে দেখে নিয়েছিলেন, ফালাফালা করে।

—"হ্যাঁ, একটা বাঘের বাচ্চা! কব্জিটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, কলজেটার ছিলায় টান দিয়ে কেমন পৃথিবীটাকে স্রেফ পকেটে পুরে ফেললো শুধুমাত্র 'সাইক্লিক অর্ডারে', দেখলে না? জীবন তো অনেকেই অনেকভাবে উপভোগ করে। কিন্তু, এমন হিম্মত বাজিয়ে মরণপণ করে উদ্দেশ্যটাকে সফল করতে ক'জনাকে দেখা যায়, ভাব দেখি। তাও আবার কি, অ্যায়সা ভয়ানক কর্মকান্ডের কোথাও কিছু নেগেটিভ নেই, সবটাই পজিটিভ ব্যাপার-স্যাপাব। লোকটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনের পর্দায় তোমার চোখের আলোটা 'প্রোজেক্ট' কর. দেখবে, একটা টোটাল মানুষের 'মুভিং পিকচার'! কি নেই!

সাহিত্য প্রসঙ্গ বলছ? এই লোকটাব? না। ওসব, কূটকচালে বাছবিচার করুক তর্ক-পঞ্চাননের দল। স্কট, ম্যালোরী, নানসেন, কুক, ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সান প্রমুখ ইতিহাসের তাবৎ শ্রেষ্ঠ পর্যটকদের কাকুকে আমি ছোট করছি না। তাঁরা তাঁদের স্বীয় কর্মক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মহৎ। কিন্তু বিশ্বাস মশাই নিজেকে এই 'আনইমাজিন্‌ড সেল্‌ফ টর্চার্ড' কবার পবেও পেনের ডগায় দেশের জন্য যে ভাঁড়ার-দরজা মেলে দিয়েছেন, আমি অন্তত মনে করি—তা যথেষ্ট।

মানসিকতার কথা বলছ? হ্যাঁ, এটা একটা জ্বলন্ত ব্যাপার। দেখ, মনটা তো আমার তোমাব সকলেবই আছে। চোর, জোচ্চোর, এমনকি একটা খুনিরও থাকে। সেই মনটা যাব যেমন 'রিঅ্যাক্ট' করে তাকে সেইভাবে চিহ্নিত করে সমাজ। রামনাথের সুনীল আকাশ তুল্য মানসিকতার কোনও সীমা পরিসীমা ছিল না। চিরভাস্বর, চির উজ্জ্বল, চির জাজ্বল্যমান। ধ্রুবতারার মতো। ভুবন যুদ্ধে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই অনেকে করেছে, অনেককে সময় বিশেষে করতে হয়ও। কিন্তু হাসতে হাসতে ক'জন পারে, বলতে পারো? যে পারে সেইতো মহৎ!

মনের মতো মন আমাদের জীবনে সত্যিই দুর্মূল্য। আর রামনাথের ক্ষেত্রে? উফ্‌, ভাবলেও কাঁটা দিয়ে ওঠে! ভদ্রলোক কী ক্ষমতা কোথা থেকে যে পেয়েছিল, বাপরে বাপ্‌, ভাবাই যায না। মানুষটাব মাথা নোয়াতে চাইলে পারা তো দূরের কথা, উল্টে

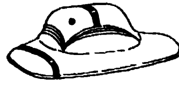
অপমানিত, এমনকি আহতও হতে পারো। ভাঙতে চেষ্টা করবে? বৃথাই কষ্ট। অর্থ-সম্মান-প্রতিপত্তির প্রলোভন দেখাও, লবডঙ্কা! অমল-ধবল ধ্যানমৌনি উন্নতশির হিমালয়! স্বমহিমায় চিরভাস্বর। সবরকম নঞর্থক চেষ্টাই গা গড়িয়ে এসে স্থির হবে পায়ের তলায়।

তাহলে শেষ দেখা হওয়ার কথাটা বলি। মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে হবে। মাঝে মাস কয়েক দেখা হয়নি, নানা কারণে। কিন্তু সেদিন—'কী মুশয়—কেমুন আছেন?' ভাঙা গলার হাঁকে ঘুরেই আচমকা দেখে বুকটা ধড়াস করে উঠল! একি, এ কাকে দেখছি! রামনাথ বিশ্বাস!

সদাপ্রফুল্লকান্তির ঋজুদেহ অথচ বজ্র সঙ্কল্পের জীবন্ত বিগ্রহের আজ এ কী হাল? হঠাৎ কি জানি কেমন করে কিছু একটা প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেছে। যার ফলে আকস্মিক সেই মহিমময় ঋজুদেহ আজ নুব্জ অবশেষ। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি মহাকাল মানুষটার দেহে তাঁর নির্মম কশাঘাত লাগাচ্ছেন 'শপাং-শপাং' করে। কিন্তু, এও কি সম্ভব? রামবাবুর হাতে লাঠি। মনকে প্রবোধ দিই, হয়তো বা দুর্বল দেহে কাঁধঝোলা ভর্তি বইগুলির ভার সামলানোর জন্য। পরক্ষণেই মনে হয়—না:, ভার ঠেকাতে লাঠির দরকার হবে কেন? এ নিশ্চয়ই মহাকালকে ঠেকা দিতে আর পাঁচজনের মতোই শেষ চেষ্টা। দুঃখ হয় ভেবে, শরীরের সাথে সাথে লৌহ প্রাচীরের মতো কঠিন অথচ সুন্দর মনটাও তাহলে ভেঙে পড়লো। মনকে সান্ত্বনা দিই—হবে নাই বা কেন? মানুষটা শুধুই পরার্থে জীবনটা বিলিয়ে দিয়ে গেল! সেই কাকভোরে বের হয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে সন্ধে পর্যন্ত একগাদা বই-এর বোঝা নিয়ে ঘুরছেন, কেবল শেষ দিন পর্যন্ত অনেকগুলি অপেক্ষমান মুখে অন্ন তুলে দিতে চান বলে। অতএব, এই পরিণাম মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া আব উপায় কি! ধীর গলায় বলি, বিশ্বাস দা আর কেন? এই বয়সে এতো কি সাজে? তাছাড়া আপনি পারছেনই বা কি করে!

মুহূর্তে পৃথিবীটা বদলে গেল 'ম্যাজিক কারপেট' এর মতো। 'কেন, না পারবর কি আছে?' বলে বাঁ কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা সামনেই নামিয়ে রেখে ডান হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে ফেললেন, খেলনার মতো করে। সোজা মাথা উঁচু করে টানটান দাঁড়িয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললেন—'স্রেফ রাম মদে ভাইস্যা পড়েন। দ্যাখবেন, মরবার দিনটাও মৌজসে তরী পার করছেন।' গমগম করা হাসির মাঝে বিভ্রান্তের মতো দেখি, কোথায় গেল স্থবির বৃদ্ধেব ছবি! আমাব সামনে দাঁড়িয়ে 'যৌবন মদে মত্ত' এযে সেই অনন্য রামনাথ।

সেদিনের পর ক'টি দিনও যায় নি। খবর এল, ভদ্রলোক মারা গেছেন। হ্যাঁ, বাঘের বাচ্ছাই বটে! কথা রেখেছিলেন। মোক্ষম দিনটাতেও সকালে বইপত্তর নিয়ে বের হয়েছিলেন। ঘুরেছিলেন বিকাল পর্যন্ত। অর্থাৎ শেষ দিনেও ফেরি করতে করতেই অবলীলায় জীবননদী পাব হয়ে পৌঁছলেন অচিন ফেরিঘাটে।"

সরেজমিন সুলুক-তল্লাস-এর আশায় তোড়জোড় শুরু করি সুদূর বাংলাদেশ যাত্রার। মৌনি হিমালয় আমাকে বরাবরই টানে দুর্নিবার আকর্ষণে। ঢাকায় যাওয়ার প্রয়োজন কিছুটা হলেও মূল লক্ষ্য ছিল রামনাথের জন্মস্থান সিলেটের বানিয়াচং গ্রাম। এই সিলেট আবার আমাদের রাজ্য মেঘালয় সীমান্তের ওপারেই। অনেক কম ঝঞ্ঝাটপ্রবণ 'বর্ডার'। হয়তো বা হিমালয়ের গুণে। সুতরাং, এ সুযোগ ছাড়ি কেন? উভয় টান-এর সার্থক তান 'টিউনিং'-এর উদ্দেশ্যে 'রুট' ধরি শিলং-হিমালয়ের অপরূপ নিরালা পথে।

কিন্তু শুরুতেই বাগড়া আমার প্রায় প্রতি যাত্রাতেই জীবনসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'পাসপোর্ট' আগেই ছিল। তবু, ভিসা থেকে শুরু করে শিলং পৌছানো পর্যন্ত শুধু ঝকমারি আর ভোগান্তির কাহিনী হয়ে দাঁড়ায়। তারিখটা ছিল ২৬-৯-৯০। শুভ সপ্তমী। দুর্গাপূজার দিন। ভিসার সময় কম থাকায় তাড়াতাড়ি পৌছানোর উদ্দেশ্যে 'কলকাতা-শিলং' বায়ুদূত-এর টিকিট কাটি। তাড়াহুড়ো করে ট্যাকসী চেপে দমদম বিমানবন্দর পৌঁছে শুনি, সকাল ১১.১৫ মিনিটের 'ফ্লাইট' বাতিল। দুপুর গড়াতে চলল। সঙ্গে খাবার নেওয়া হয় নি। মধ্যেকার স্টলটিতে চা ছাড়া আর সবই ফুরিয়ে গেছে। ওদিকে 'ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস্'এরও একই অবস্থা। অপেক্ষমান যাত্রীরা ধৈর্য হারায়। কর্মীদের সঙ্গে শুরু হয়ে যায় বচসা ও হাতাহাতি। সে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। অবশেষে ঘোষণা শুনি—৪.২০ মিনিটে আমাদের পক্ষীরাজ ডানা মেলবেন। 'চেকিং'এর জন্য লাইনে দাঁড়াই। খানা-তল্লাসীর পর আমাকে ছাড়লেও ওদিকে 'লাগেজ ডিটেক্টর' যন্ত্রে আমার অপরাধী 'স্যাক' টি আটকে দিয়েছে। হন্তদন্ত হয়ে ব্যাগের কাছে পৌঁছতেই শুরু হয়ে যায় খোঁজা খুঁজি। অনেক অনুসন্ধানের পর জানতে পারা গেল, ক্যামেরার ক্ষুদ্রতম ব্যাটারীটি এই অঘটন ঘটিয়েছে। কনস্টেবল রোষকষায়িত নেত্রে চড়া সুরে বললেন—'এ কি, ব্যাটারী সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন? না না, হবে না। খুলুন তাড়াতাড়ি খুলুন।'

সবিনয়ে জানাই—'দাদা, বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছি, ফটো তুলব না?' 'দাদা' কাদা হয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শোনালেন 'সিলভার টনিক'-এর অমৃতবাণী—'কিছু পেয়ে থাকি।' নাঃ, এবারে খাপ খুলতেই হয়। বার করে দেখাই বিশেষ কাজের পরিচয়পত্র। বখশিস না ছেড়েও পেলাম দাঁত বের করা শুভেচ্ছাসহ নমস্কার। এদিকে, একটা বড় মাপের ঝাঁকুনি দিয়ে 'রানওয়ে' ছেড়ে 'টেক-অফ' করতেই মালুম হয়, এটি নামে বায়ুর দূত হলেও কাজে যন্ত্রণার ভূত। তার যন্ত্রের অসম্ভবরকম আওয়াজে কানের ঝালাপালা অবস্থা। পাশে বসা যাত্রীর কথাবার্তাও বুঝে উঠতে পারছি না। সব কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে দৃশ্যাবলী দেখব কি! আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল, যখন দেখি 'হোস্টেস' ঘনঘন এসে দরজাটা টেনে বন্ধ করছেন। শঙ্কিত দৃষ্টিতে মনে পড়ে যায়, আমাদের ৫২ রুটের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ৭৪ নম্বর লোকাল বাসটি যখন

'হোঁ-হোঁ-গোঁ-গোঁ' করে হাওড়া থেকে রামরাজাতলা বাস স্ট্যান্ডে ঢুকত, আমরা চিৎকার করে পথচারীদের সাবধান করতাম—"সরে যান মশাই, সরে যান, ফ্লাইং টিটেনাস আসছে।"

গোদের ওপর বিষফোঁড়া, অজ্ঞাত কারণে সেটি শিলং-এ আদৌ না নেমে হিঁচড়ে নিয়ে ফেলল, গৌহাটি এয়ারপোর্টে। সন্ধ্যে তখন ছটা বেজে গেছে। উড়োজাহাজের বাইরে আসতেই অনুভব করি কানে তালা লেগে গেছে এবং অসহ্য যন্ত্রণা। কমসে কম দুঘন্টা লাগাতর সে কষ্টের প্রোগ্রাম। নির্জন রাতে এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাকসী বা অটোর খপ্পর থেকে শহরে পৌঁছতে কম হেপা সামলাতে হয়নি। পরের দিন মহা অষ্টমী। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি বৃষ্টি হচ্ছে। ইচ্ছে না করলেও উঠতে হয়। কামাখ্যা মন্দির দর্শন সেরে দুপুরের গাড়িতে চেপে বসি, সরকারী বাস স্ট্যান্ড থেকে গন্তব্যস্থল ১০৪ কিমি. দূর শিলং-এ। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে এই শৈল নগরীর সোহাগী নাম 'পূর্বের স্কটল্যান্ড' পেলেও আমার কাছে সেদিন হয়ে উঠেছিল জবরদস্ত ঠেকে শেখা 'ল্যান্ড'। শিলং-এর পোলো হিল্‌স-এ থাকেন ওখানকার বিদগ্ধ মানুষ বিজয় ভট্টাচার্য। শিলং-এ বাঙালি মহলের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এঁর অবদান কম নয়। রামনাথের দূর আত্মীয়ও বটে। আমার সাথে কোনো রকম পরিচয় না থাকলেও একান্ত ইচ্ছে, আলাপ করে নেব। যদি কিছুমাত্র ইঙ্গিত পথের হদিস পাওয়া যায়। বাস স্ট্যান্ড থেকে মাতৃমন্দির (কালীবাড়ি) দুর্গামূর্তির সামনে হাজির হই। ধূপ-ধূনো-ঢাকের বাদ্যির মাঝে দর্শন সেরে বাইরে আসতেই নজরে পড়ে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স-এর লোকজন রাইফেল নিয়ে রাস্তার ধারে পজিশান নিচ্ছে। লোকজন নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যাওয়ার জন্য ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। আর ১৫ মিনিট অর্থাৎ বিকেল পাঁচটায় সুরু হবে কারফিউ। ১৯৭৯-র পর আবার এই বড় রকমে খাসি বনাম অ-খাসিয়া জাতিতে বিভেদ-দাঙ্গা মাথা চাড়া দেওয়ার কুফল। মনে মনে প্রমাদ গণি। বিদেশ বিভূঁই বলে কথা। ঝটিতি খোঁজ খবর করে হাজির হই বিজয়বাবুর বাড়ি। সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বললেও উনি ঘরের মধ্যে অচেনাকে রাত কাটাতে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন কি আর করি, কাতর আবেদন জানিয়ে বলি—'বাইরের খোলা রোয়াকটুকুতে অন্তত থাকতে দিন।'

উনি সাথে সাথে বিস্ময় প্রকাশ করে জানালেন—'পাগল হয়েছেন! শিলং-এ রাত দশটার পর বাইরে যে ঠাণ্ডা পড়বে, তাতে আপনি জমে যাবেন।'

আমিও তখন মরিয়া। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে উত্তর দিই—'কি আর করা যাবে বলুন? বাইরে গেলেতো 'ফায়ারিঙ স্কোয়াডে'র সামনে দাঁড়াতে হবে ক্ষুদিরাম অথবা মাতঙ্গিনী হাজরার ভঙ্গিতে। তার চাইতে বরফ ঠাণ্ডায় বেঁচে থাকতে একটা চান্স নেওয়া যাক বরং। অবশ্য যদি আপনি সেটুকুও সুযোগ দেন।'

'আঃ, জ্বালালে দেখছি' বলার মতো জিভের সাহায্যে একটি ছোট্ট চুক আওয়াজের সঙ্গে শুধু 'দেখি' বলে ঘরে ফিরলেন। আমিও আর দেরি না করে ঝোলা-ঝালা পিঠে তুলে অনুসরণ করি নিঃশব্দে। রাত্রি খাওয়া-দাওয়া সেরে আলোচনায় বসলে বুঝতে

অসুবিধা হয় না —পন্ডিত ব্যক্তি। মেতে উঠি সানন্দে। ওনার স্ত্রীর নীরব-মধুর আদর-আপ্যায়নে মনে হোল যেন সাক্ষাৎ মা আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছেলের দেখ্‌ভাল করছেন। কখন যে গুটি গুটি পায়ে ঘরের ছেলে হয়ে পড়েছি, খেয়ালও হয় না। ভট্টাচার্য মশাই-এর কাছে জানতে পারি এখানকার অধিকাংশ বাঙালিই আদিতে সিলেট জেলার লোক। এমনকি স্থানীয় পুরনো খাসি অধিবাসীরাও সিলেটি ভাষায় কথা বলতে সক্ষম। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, শ্রীহট্টের নিজ ঘরানায় কথোপকথন বেশ দুর্বোধ্য। অথচ, আমাদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় প্রায় মানুষই তাঁদের ঘরোয়া কথ্য ভাষার অদল-বদল ঘটিয়ে অতিথির কাছে বেশ সহজবোধ্য করতে সক্ষম। এছাড়া শিলং-এর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, এখানকার খাসিয়া সভ্যতা মূলত মাতৃতান্ত্রিক। বাজার হাট থেকে শুরু করে মেয়েরাই বেশির ভাগ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। সকালে বাজারে মাছ-সব্জী বিক্রী শেষে সংসারের অন্য দায়-দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পরেও দেখা যায় মেয়েরা রাত্রে স্কুল কলেজের পড়া চালাচ্ছে রীতিমত। এ এক জবরদস্ত জাগরণ। উপত্যকায় অ-খাসীদের মেনে নিতে পারছে না, এটাও তার একটা সীমিত কারণ।

পরের দিন সকালে স্নান সেরে তরতাজা হয়ে নিই। মায়ের হাতে তৈরী গরম চা-পরোটা খেয়ে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। বড়বাজার বাস স্ট্যান্ডে হাঁকছে 'ডাউকি-ডাউকি'। উঠে পড়ি। দূরত্ব ৯৬ কিমি.। বাস ছেড়ে দিল। মাত্র খান তিনেক বাঁক ঘুরতেই দেখি হিমালয় মেলে ধরেছে তার অপরূপ ডালি। পাহাড়ের রূপ-রস-গন্ধে মন ওঠে মেতে। বুক ভবে নিই টাটকা হিমেল নিঃশ্বাস। চোখের পরতে পরতে লাগে হিম-অঙ্গনের সবুজ কাজল। ঘন্টাখানেক যাওয়ার পর 'পাইনুরসলা' গ্রাম ছোঁয়ার পরই মনে হোল বাসটি বুঝি হঠাৎ কোনও কুয়াশা ঘেরা ইন্দ্রজাল-এর আবর্তে ঢুকে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মাঝে কুয়াশাময় পিচ্ছিল পথে বাস চলছে তো চলছেই। শেষ যেন আর হতে চায় না। অঞ্চলটুকু পার হতে লেগে গেল কুড়ি মিনিটেরও বেশি। শুনি, চেরাপুঞ্জি নাকি আবহাওয়ার কারণে স্থান পরিবর্তন করতে চাইছে, এদিকটায় (মতান্তরে মৌসিনরাম-এ)। আসলে এই অঞ্চলটা, কিছুদূর পশ্চিমে 'চেরাপুঞ্জি' এবং তারও পশ্চিমে 'মৌসিনরাম' গ্রাম প্রায় একই সরলরেখা বরাবর থাকায়, দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস মেঘালয়ের এই সমগ্র উপত্যকায় প্রথম ধাক্কা খায়। সম্ভবত তারই ফলশ্রুতিতে, সময় বিশেষে, তিন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটে। বাস্তবে 'চেরাপুঞ্জি' 'চেরাপুঞ্জি'ই আছে।

বাস ছুটে চলেছে ৪০নং জাতীয় সড়ক ধরে। অবিভক্ত ভারতে এর নাম ছিল শিলং-সিলেট রাজপথ। সরাসরি পৌঁছে যাওয়া যেত শ্রীহট্টের প্রাণকেন্দ্রে। এখন 'গরজ বড়ো বালাই'। মন চাইলেও উপায় নেই। আইনের কচকচি মানতেই হবে। মাতৃভূমি যে আজ খন্ডিত। 'আঁকিবুঁকি' মনোরম পাহাড়িয়া পথ ধরে ৯৬ কিমি. দূর 'ডাউকি' বাসস্ট্যান্ডে হাজির হতে সময় লাগল প্রায় ৩ ঘন্টা ২০ মিনিট। অত্যান্ত সুন্দর 'পিকনিক স্পট' হিসেবে অঞ্চলটি খ্যাত।

দুর্ভোগের চূড়ান্ত পর্যায়। সারা গা-হাত-পায়ে কেমন একটা অস্বস্তির সাথে মাথাটা প্রচন্ড রকমের ঘুরে উঠল। বাস থেকে কোনও বকমে নেমেই রাস্তার ধারে শুয়ে পড়ি, অজ্ঞানপ্রায় অবস্থা। একটি ছোট ছেলে তা দেখে কি বুঝে ছুটে গিয়ে কোথা থেকে এক চামচ চিনি আমার মুখের মধ্যে ঠেলে গুঁজে দিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে খানিকটা সুস্থ বোধ করে উঠতে সক্ষম হই। সামনের হোটেলে নামমাত্র সব্জী ভাত খেয়ে পান কিনি। এ অঞ্চলে পান খাওয়ার রেওয়াজ একটু অন্য ধরণের। কোনওরকম মশলা এমনকি চুণ-খয়ের পর্যন্ত ছাড়াই পানটি মুড়ে তার সাথে আলাদাভাবে জলে ভেজানো একটি বড় আধ্‌লা-প্রায় কাঁচা সুপারী হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। সুপারীটির বদগুণে মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে বটে, কিন্তু অমন সুগন্ধী ও সুস্বাদু পান ভূ-ভারতে নেই। বাসের মধ্যে একজন চিবোলে গোটা বাস 'ম-ম' করে ওঠে।

এবার পা চালাতে হয়। কারণ আজকেই যেভাবে হোক আমাকে সিলেট শহরে ডেরা-ডান্ডা পাততে হবে। কিন্তু ক'পা না এগুতেই থমকে দাঁড়াই। এমন অজ হিমশৈল-র কোলে আরতি ধ্বনিকে সঙ্গে নিয়ে বাংলা বোল-এ 'ঢ্যাম-কুড়-কুড়' বাদ্যি কোথায় বাজে! দেখি সামনেই প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির। ওরই মধ্যে চলছে দশভুজার আরাধনা। অজানা আগ্রহে ধীর পায়ে এগিয়ে চলি। মন্দির সামনে দাঁড়াতেই মনের ময়ূর নেচে উঠল প্রাণের আনন্দে। নানা পূজা-উপাচাবে স্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন মন্দির মধ্যেকার পরিবেশ নিমেষে পৌঁছে দিল অন্য জগতে। পুরোহিত মশাই এক লাইন করে আরতি মন্ত্র পাঠ করছেন উদাত্ত কণ্ঠে, আর সেই লাইনের ধূয়ো তুলছে একদল কচি-কাঁচা কণ্ঠে। স্থানীয় প্রায় সাতশো বাঙালি (সকলেই আদিতে সিলেট জেলার) মিলে এই নয়নসার্থক দুর্গোৎসব।

কিছুক্ষণ গল্পগুজব সেবে উঠে পড়ি। মূল সীমান্ত এখান থেকে হাঁটা পথে আরও দেড় কিলোমিটার। বাঁধানো পিচ বাস্তা ধরে পৌঁছতে সময লাগে না বিশেষ। আগে সোনা খাসিয়া নামে এক স্থানীয়ের নাম অনুসারে জাযগাটি পরিচিত হোত 'সোনাটিলা' বলে। পরবর্তীকালে ক্রমে হয়ে ওঠে ভাবতীয় সীমান্ত 'ডাউকি'। ওপারে বাংলাদেশেব 'তামাবিল'। ডাউকি-তামাবিল উভয় চেকপোস্টে পুলিশ ও শুল্কবিভাগের বখেড়া জলের মতো মিটে গেল, তবন ভারতীয় কাস্টমস অফিসার তাপস স্বরূপ সরকারের অনবদ্য পরার্থপরতায়। হযত এটাই ছিল বাংলাদেশ ট্যুবে শুভ সূচনাব পরিচায়ক। কেননা, তামাবিল এব ওপাশে পৌঁছতেই অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াতে হয়। মনে হল, নয়ন সার্থক বাংলাদেশ প্রকৃতি দুহাত বাড়িযে আমাকে কোলে তুলে নিতে চাইছে। যেন, মা তার অনেকদিনেব হাবানো সন্তানকে খুঁজে পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বল। সামনেই তিরতির কবে বয়ে চলেছে জলস্রোত। সেখান থেকে বহুদূর বিস্তৃত তরাই অঞ্চল। কচি সবুজ ধানক্ষেতের বহতা মেলা। যেখানে চলছে কেবল 'দে দোল দোল' ঢেউয়ের খেলা। আরও ওপাশে উঠে গেছে ঘন সবুজের হিমালয় পর্বতমালা। অন্য যেদিকে তাকাই, বর্ষা শেষে জলেব ঢলে টইটম্বুর। মাত্র ক'হাত দূবে আদুল গায়ে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা মেয়ে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে চোখ বুলিযে নিচ্ছে

নবাগতকে। ওর হাতে ঝুলছে সদ্য ধরা ৪/৫ রকম জাওলা মাছের মালা।

সীমান্ত তামাবিল থেকে ৫৫ কিমি. দূরে সিলেট জেলা শহরের জমজমাট এলাকা জিন্দাবাজার। তাপসের নির্দেশে এখানকার যে যুবাটির হাতে নিজেকে সঁপে দিই, তার নাম মিঃ জ্যাকব এডওয়ার্ড। রক্তসূত্রে খ্রিস্টান, জ্যাকব বাংলাদেশের একজন সেরা অ্যাথলিট এবং কাস্টমসের উল্লেখযোগ্য সরকারী অফিসার। জ্যাকবের বুড়ি ছুঁয়ে, রামনাথ বিষয়ে প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান অন্তে চলে আসি চট্টগ্রামে। সূর্য সেন প্রমুখ বহু বাঙালি বীরের কর্মক্ষেত্র, সীতাকুণ্ডে ৫১ পীঠের অন্যতম মহাতীর্থ চন্দ্রনাথ ধাম, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত, মহেশখালি দ্বীপ, প্রকৃতি-সৌন্দর্যের অনুপম উপহার-ডালি রাঙামাটি খ্যাত এই প্রাচীন জেলাটিতে 'রথদেখা কলা বেচা'র কাজ করে ঢুকে পড়ি বহু ইতিহাসের সাক্ষী রাজধানী ঢাকায়। এখানে বাঙালি ও বাঙলা ভাষার গর্ব "বাংলা একাডেমীতে" কিছু 'টেবিল ওয়ার্ক' সেরে ফিরে আসি শ্রীহট্টে বা সিলেটে।

এইবার হাজির হওয়ার পালা ভূপর্যটকের খোদ জন্মস্থান বানিয়াচং গ্রামের বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। ঠিক রাস্তা হল, সিলেট টাউনে সুর্মা নদীর ওপারে কদমতলী বাসস্ট্যান্ড থেকে ৮৫ কিমি. দূরে হবিগঞ্জ জেলা সদরে পৌঁছতে হবে, সড়কপথে। তারপর ৩ কিমি রিকসাপথে ঘাট পর্যন্ত। ওখান থেকে 'শ্যালো নৌকোয়' ১৪ কিমি. জলপথে পার হয়ে তবে বানিয়াচঙ্গ। বাংলাদেশের জল-প্রকৃতির স্বাদ নিতে আমি ধরলাম একটু ঘুর পথ। সেরপুরে বাস পাল্টে চলে আসি নবীগঞ্জে। সাড়ে তিন কিলোমিটার পথ মাটি লড়ে ঘাটে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে। সুতরাং দরদস্তুর করে ১৫ টাকা বফায় সওয়ারী হলাম একটা রিক্সার। ও হরি! মাত্র ৫ মিনিট পর থেকেই প্রকৃতি উপভোগের পুলক মালুম হতে থাকল 'হালুম' রূপে। হাঁটুকাদা রাস্তায় পদে পদে রিক্সা থেকে নেমে পড়তে হয়। উপরন্তু রিকসাওয়ালার বেহাল অবস্থা দেখে লজ্জা-ঘেন্নার মাথা খেয়ে শেষে প্যান্ট গুটিয়ে খালি রিকসাটাই ঠেলতে থাকি। এইভাবে আধঘন্টার পথ মাটি-মানুষে লড়াই চলে ঝাড়া দেড়ঘন্টা। মাথার ঘাম পায়ে ঢেলে মনে মনে নিজের অভিনব ইচ্ছেটার গায়ে 'থুতু' ছেটাতে ছেটাতে ঘাটে পৌঁছই।

হ্যাঁ, জলপথটুকু অভূতপূর্ব এবং বাক্যহারা করার মতোই বটে! 'শ্যালো' নৌকাটি যেখান থেকে ছাড়ে, সেটাকে আদৌ নৌকাঘাট বলা যায় কি না, তা গবেষণার বিষয়। আধঘন্টা পরে ছোট্ট ডোবার মতো এলাকা থেকে ঠেলে গুঁজে যা হোক চালু হলো ভটভটি মেশিন। যানটির এমন অদ্ভুত 'শ্যালো' নামকরণের পিছনে কারণ আছে। শুখা মরশুমে বা জলাভাবের এই সমস্ত এলাকায় আবাদযোগ্য জমিতে চাষের কাজে সরকার থেকে শ্যালো টিউবওয়েলের জন্য বরাদ্দ ইঞ্জিনগুলিকে এমন বে-আইনীভাবে কাজে লাগায় বর্ষার সময়। বিশেষ করে, মাঠ ঘাট যখন কানায় কানায় ভরে যায়।

যাহোক শ্যালো ভট্‌ভটি এখন বেজায় হাঁকডাকে চলেছে। 'বেজায়', কেননা সম্পূর্ণ বদ্ধ কচুরীপানা বেষ্টিত এলাকায় পথ কেটে তৈরী করে ছুটতে হচ্ছে। তবে সব চাইতে মজার ব্যাপার, নৌকার গলুই কখনও কারুর হেঁশেল-দাওয়ায় ভিড়িয়ে

দেয়, কখনও বা দিচ্ছে ফলে থাকা কলাঝোপের পাশে কোনও গোয়ালে গুঁজে। যাত্রী উঠতে অথবা নামতে। এমনই এক জায়গায় যাত্রী তুলতে নৌকো দাঁড়িয়ে পড়েছে। ডাঙা থেকে একটু জল না ভাঙলে ওঠা যাবে না। স্বামীটি লাফ দিয়ে উঠে পড়লে কি হবে, সদ্য বিবাহিতা বধূটি জলে দাঁড়িয়ে এক হাতে নতুন জুতো ও আর হাতে সম্ভাব্য পরিমাণ কাপড় তুলে লজ্জারাঙা হেঁট মুখে স্থির হয়। হতবুদ্ধি স্বামী বুঝে উঠতে পারে না, এক্ষেত্রে তার কি করণীয়? ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে এদিক ওদিক চাইতে থাকলে বেকুব অবস্থা সামাল দেয় বাড়ির কাজের মেয়ে। ডাঙা থেকে ক্ষিপ্র গতিতে নেমে এসে বৌটিকে অনায়াসে দুহাতে কোলে তুলে পাটাতনের ওপর বসিয়ে দিলে, একেবারে কচি খুকীর মতো। এইভাবে জল-বাংলার মধুর সান্নিধ্যে ও অন্তরঙ্গ ছোঁয়ায় ধন্য হয়ে পাক্কা সাড়ে তিন ঘন্টা পার করে পৌঁছাই বানিয়াচং থানা ঘাটে।

বিদেশ-বিভূঁই বলে কথা। আইনের দোরগোড়ায় একবার কপাল ঠুকে যাওয়া ভাল মনে করে 'খাঁকি' বাড়ির দিকে পা বাড়াই। থানার নতুন বড়বাবু মহম্মদ আবুল ফজল। বাড়ি চট্টগ্রামে। অমায়িক ভদ্রলোক ও জ্ঞানপিপাসু। প্রথম পরিচয়েই দুজনের দুজনকে ভাল লেগে যায়। ফলে, বাকি ব্যাপারগুলো সহজেই অনুমেয়। এবার মূল গ্রামে ঢোকা যাক। থানা থেকে ২ কিমি. দূরে বিদ্যাভূষণ পাড়ায় প্রবেশও এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা। রাস্তার মাঝে পড়ে বানিয়াচঙ্গ বাজার। বিকি-কিনির পশরা সাজিয়ে বেশ জমজমাটি বাজার বলতে হয়। খিদে পাওয়ায় একটা হোটেলে ঢুকে অর্ডার দিই 'ভাত-ডাল-সব্জী'। শুনে বয় থেকে শুরু করে মালিক পর্যন্ত হাসাহাসি করে। বলি, হাসছ কেন? উত্তর আসে, পাশে বসা সপাসপ্‌ খেতে থাকা খদ্দেরের কাছ হতে—'বাবু সবজি তো ইখানো প্রায় আসই না। গোস্ত, খাসি, মুর্গি বা মাছর ঝুল দিয়াই আমবার ভাত খাওয়া হইয়া যায়'।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন রাখি—সে কি! তবে যে শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রচুর ভিটামিনযুক্ত ফল ও সবজির সরকারী প্রচার বিজ্ঞাপন ঝুলছে চারদিকে দেখলাম! ম্লান হেসে ভদ্রলোক জবাব দিলেন—'ওই হিসাব ওই সরকারী কাগজে-কলমেই বেশি মিলে।' তাজ্জব বনি। এমনিতে প্রায় নিরামিষাশি, আমি। সুতরাং কোনও রকমে খাওয়া-দাওয়া ম্যানেজ করে একটা দারুণ স্বাদযুক্ত বাংলা খিলি পান মুখে দিয়ে পা চালাই। সামনেই মাথায় খালি ঝাঁকা নিয়ে হাট ফেরৎ এক চাচা চলেছে তার বাড়ির দিকে। পশরা উজাড় হয়ে যাওয়ায় এবং পকেটে কাঞ্চন আগমনে মনটা ভরপুর। আঞ্চলিক ভাষা ও বিচিত্র সুরে ধরেছে দিলখুশ গান—

ওয়া মিয়া সাবজী
সৌদি আরব যাইতাইনি
আরব দেশের দুম্বার গোছ পেট ভরিয়া খাইতাইনি (ঐ)।
মসজিদের ইমামতি হাফিজ সাফরে দিয়া
জাগা জমিন বাড়ি ভিটা হগলতা বেচিয়া
পাচ ফুট ভিসা সংগে লইয়া কলাই মিছিল চড়তাইনি (ঐ)।

জরু ভাইছাব বড় ভাইছাব লাল ভাইছাবরে লইয়া
তারিকে দিন ঢাকায় যাই নই হক্কল তরে লইয়া
দালাল চাচার মুখে দিয়া সুরের তাও দেখছনি (ঐ)।।

চাচার সঙ্গে গল্প করতে করতে পৌঁছে গেছি বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। সে যে কি মধুরতম উপলব্ধি! খবর দেওয়া ছিল। বানিয়াচং-এর প্রাক্তন এম.পি. গোপালকৃষ্ণ মহারত্ন, বিদ্যাভূষণ পাড়ার মধ্যে এখনও বসবাসকারী রামনাথের দূর বংশধর প্রবোধ কুমার বিশ্বাস ও শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস এবং গ্রামবাসীগণ হাজির হলেন পাড়ার পঞ্চম শ্রেণী বিশিষ্ট স্কুলের সামনে। নাম জয়তারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষার্থীদের কিছুক্ষণের জন্য বসিয়ে রেখে শিক্ষকরাও বের হয়ে এলেন নবাগতর সামনে। সুগন্ধ বকুল ফুলের মালা পরিয়ে অতিথিকে বরণ করা হল। এরপর মূল বাড়ির দিকে নৌকাযোগে যাওয়া। নৌকার ব্যবস্থা এখানে প্রায় সর্বত্র। কারণ বর্ষাশেষের কানায় কানায় ভরে ওঠা জলে বহুক্ষেত্রে এবাড়ি থেকে ওবাড়ি যাওয়ার মাধ্যম এই সুপ্রাচীন জলযানটি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। ডাঙায় পা দেওয়া মাত্র এক বিশেষ অনুভূতি মনকে ঘিরে ধরল। এই সেই জন্মভূমি, যে মাটি এই মহান কর্মবীরের কাবকক্ষেত্র। উপযুক্ত জল-হাওয়া-পরিবেশের উর্বর ক্ষেত্রে বেড়ে ওঠা যে তেজস্বী সবুজ গাছটি ডালপালা মেলে ধরেছিল সসাগরা পৃথিবীর আনাচে কানাচে।

অথচ সেই গরিমাময় শ্রীভূমির কি হাল! ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তৈরী পাকা দূর্গামন্ডপের সংলগ্ন টিন-ছাওয়া নাট মন্দির। এটাই বাস্তুগৃহের বর্তমান অবশিষ্ট। তারই ঘুপসীর মধ্যে বাস করছে আব্দুল ওয়াহেদ নামে এক মুসলমান, সপরিবারে। পাড়ার অন্যত্র দুটি পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও এই আদি গৃহকোণে নেই কোনও বংশধর। চতুর্দিকে ধ্বসে যাওয়া খসে পড়ার বিবর্ণ চিত্র। বাকি বাস্তুভিটার সমস্ত কাঁচা অংশই মাটিতে হয়েছে লীন। স্তূপীকৃত জঞ্জালের এপাশে ওপাশে গজিয়ে উঠেছে আগাছা। কোথা থেকে একটা ঘুঘু পোড়ো জমিতে ক্রমাগত ডেকে চলে বাড়িয়ে তুলেছে বিষণ্ণ বেদনা।

এবার কিছু সওয়াল জবাবের পালা। নুব্জদেহ বৃদ্ধ কাদের মিঞা পাশেই ছিল। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে খোলাখুলিই জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা দাদু, আপনিতো খুব কাছ থেকে মানুষটাকে দেখেছেন। কখনও কি মনে হয়েছে, গোঁড়া হিন্দুবংশের ছেলে হয়ে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করতেন? দাদু প্রথমে চোখ কপালে তুলে বললেন, 'কেডা, রামা? হয়া আল্লা।' পরক্ষণে কাঁপানো গলায় অথচ বলিষ্ঠ সুরে প্রায় 'চার্জ' করলেন আমাকে-- 'দুহাই আপনার, ওই রকম বানাইল (বানানো) কথা তৈযার করিয়া অশান্তির মাঝে ফেলবা না তো মশয়।' অপ্রস্তুত হই।

ব্যাপারটা খোলসা করলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ গোপালকৃষ্ণ মহারত্ন—'আসলে, ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। হিন্দু-মুসলমান দুটো আলাদা জাত, এমন ধারণার কণা মাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না। জীবনভোর মনের মধ্যে পোষণ করতেন—একই মায়ের সন্তান, মোরা হিন্দু-মুসলমান। বাস্তবিক পক্ষেও দেখেছি, মুসলমান বন্ধুবান্ধব ছিল বেশি। এমনই

সহজাত ছিল সে মেলামেশা যে বিদেশ ভ্রমণের সময় পর্যন্ত প্রবাসী সিলেটি মুসলমান ভাইদের সহায়তা পেয়েছেন অনেক দেশে।'

—আপনারা রামা'কে কাছে পেয়েছেন কিভাবে?

স্নিগ্ধ হাসিতে উত্তর ছড়িয়ে দিলেন—'আসলে মানুষটা তো বরাবরই ভুবনগাড়ির প্যাসেঞ্জার। তেমন করে কাছে আর পেলাম কই? মনে পড়ে চিন ভ্রমণের পর গ্রামে এসেছেন। একটা বেলা কোনও রকমে সবাই মিলে বাগিয়ে ঘিরে ধরতে পেরেছিলাম। তাই কি কম প্রাপ্তি। তারপর যে কে সেই। কোন ছোটবেলা থেকেই কেমন একটা অদ্ভুত ছটফটে 'টোটো কোম্পানি' স্বভাব সবসময় তাড়া করে ফিরেছে মানুষটাকে। বহু বছর বাদে বাদে একবার করে মাত্র দেশে ফিরলেও সেই একই দৃশ্য। কোনও রকমে ঘরে ও পাড়ায় বুড়ি ছুঁয়েই বেরিয়ে পড়তেন, সারা পূর্ববঙ্গ (তৎকালীন) জুড়ে যেখানে যত পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে। অবশ্য ওঁর পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে ভূপর্যটন শেষ হলে পর মাত্র একবার ছাড়া, সেই যে কলকাতায় থিতু হলেন, অচিনপুরের যাত্রী হয়েছেন বটে, কিন্তু এপারমুখো আর হননি।'

বাঁ হাতে নারকেল্ খোলের হুঁকো মুখে ধরে 'গুড়্‌কগুড়ুক' টানতে টানতে জুলজুল করে দেখছিলেন ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধ মৌলভি কাজী গোলাম রহমান। বলতে গেলে, ভবঘুরের শিশু-সঙ্গী। ইনি 'বানিয়াচং দর্পণ'-এর এক জায়গায় লিখছেন, 'রামনাথবাবু বলিতেন—দেশভ্রমণে আন্তরিকতা চাই এবং মনের ভাব অপরকে বুঝাইতে পারিলে অর্থের অভাব হয় না।' দর্পণ-এর অন্যত্র তাঁর লেখায় জানতে পারি—'রামনাথবাবু মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করিয়া নিজ পল্লীভবনে এক বৎসর (বস্তুত আরও কম সময়) বিশ্রাম গ্রহণ করেন। ঐ সময় নানা জায়গায় তাঁহার ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় রামনাথ বিশ্বাস বলিয়াছেন—দুইবার আমায় পারস্য ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়বার যখন পারস্যতে উপস্থিত হই, এক চায়ের দোকানে চা পানের জন্য বসি। তখন চা-ওয়ালা ফুটন্ত জলের কেতলী, চা-কুচী, দুধ-দান ও চিনি টেবিলে রাখিল। সেই দেশের নিয়ম ঐরকম চা পরিবেশন, আমিও ঐ ভাবেই নিজ হাতে চা তৈরী শুরু করিলাম। চায়ের পেয়ালাতে ফুটন্ত জলে দুধ দিতে চাহিলাম, অমনি চা-ওয়ালা বলিয়া উঠিল—''আওর নেহী সাহেব, এক ছিপ ছে জেয়াদা লেগা, হামারা সুলতানছে মানা হায়।'' আমিও তাহার কথা রক্ষা করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, প্রথমবার পারস্য ভ্রমণে কি দেখিয়াছি? একটি নোংরা দেশ, বাড়ি ঘরও ঐরকম নোংরা। এই দ্বিতীয়বার দেখিলাম বিপরীত। সেই স্থান প্রাসাদে পরিপূর্ণ, আচার-ব্যবহার ভিন্ন। ইহার মূল কারণই হইয়াছে রাষ্ট্রের মিতব্যয়িতা অবলম্বন। সে দেশের রাষ্ট্র পরিচালক ও রাজপ্রতিনিধি মিতব্যয়িতা অবলম্বন করেন ও প্রজাবৃন্দকে মিতব্যয়িতা অবলম্বনে বাধ্য করা হয়। ইহাতে সেই দেশের সমৃদ্ধি মৃত্তিকা-গহ্বর হইতে জাগিয়া ওঠে।'

ভদ্রলোক রামা'র দুরন্তবেলা থেকে প্রায়-অন্ত সময়ের সাক্ষী। সাধ জাগে, একটু বাজিয়ে দেখতে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গোটা গোটা করে বলি, 'রামনাথের কাছে কি শিখলেন?'

কাশির দমকে জড়ানো গলা এবং আঞ্চলিক ভাষায় হাত নেড়ে যা বোঝালেন, বড়ই দুর্বোধ্য ঠেকে। সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন ভূপর্যটকের দুই বংশধর প্রবোধকুমার (কানু) ও শ্যামাপ্রসাদ (রতন)। উভয়ের তর্জমার সারমর্ম হলো এই— "রামার কলিজাই আলাদা। জুড়ি মেলা ভার। সেবার ইউরোপ ভ্রমণ সেরে দেশে ফিরেছে। জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁরে রামা—বাংলাদেশের এমন অপরূপ প্রকৃতির মাঝে জন্মেছিস। অভাব কি তোর? এসব ছেড়ে শরীরটাকে নিঙড়ে টঙাস্ টঙাস্ করে কি পাস বলতো? দরকারই বা কী, এতো কষ্টের?"

মুচকি হেসে বাউণ্ডুলের সলজ্জ জবাব—'ওই খানেই ভুল করছস। দেখ রহমান, আমি যাই বিশ্বপ্রকৃতির উঠানে। সেখানে প্রকৃতির রং, রূপ, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ও বৈচিত্র্য হক্কলই মিলে মানুষের মধ্যে। অউ যে সৃষ্টি, উয়ার রহস্য-শতদলের বিস্ময় হইতাছে মানুষ। আমি খুঁইজ্যা বেড়াই সেই মানুষ রতনকে হাজার রূপে দ্যাখ্তে। বাইরাইয়া (বের হয়ে) না পড়লে আমারে কে দেখাইব ক'ত দেহি (বল দেখি)? কষ্টের কথা কইতাছিস? আরে, আমার হেই আনন্দ তো অউখানো (এখানেইতো)'। কত অজানায় ভরা মানবলীলার অন্য পরিচয়ে মন চলে যায় শিব-শান্তি-নিকেতনে।

মানুষটির ঘুরে বেড়ানোর নেশা ও বিশ্বকে পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে নেওয়ার অপরিসীম আগ্রহ ছিল বরাবরই। দেশ ভ্রমণের সাথে সাথে বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রা এবং ধনী-গরিবের বৈষম্য তিনি দেখেছেন অসংখ্য দৃষ্টিকোণ থেকে। অকপট স্পষ্ট বক্তারূপে মুগ্ধ করেছেন দেশের লোককে। নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট, অবর্ণনীয় দুর্দশা, অপমান ও অবহেলা তাঁর চলার পথটিকে যেমন ক্ষতবিক্ষত করেছে; অপরদিকে তার বিনিময়ে লাভ করেছিলেন প্রচুর সম্মান। কিন্তু বামনাথ সে সবের কাঙাল তিলমাত্র ছিলেন না। ফলে ফুলে ও কাঁটায় ঘেরা বৈচিত্র্যময় বিশ্ব তথা মানবজীবনেব দর্শনই ছিল তাঁর মূলত কাম্য।

ছুটে চলা এই লক্ষ্যের মাঝে-মধ্যেই ঝিলিক দিয়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিস্বভাবের অনন্য গুণগুলি। সমসাময়িক বন্ধু মৌলভী কাজী গোলাম রহমান, সত্যদুলাল পাল চৌধুরী, 'মৌচাক' খ্যাত বিমল ঘোষ, গজেন মিত্র, যোগেশ বাগল ছাড়াও পরবর্তীকালে আরো অনেকে বলেছেন, মানুষটি "Familiarity breeds contempt" এই ইংরেজি প্রবাদ কথাটির যেন মূর্তিমান প্রতিবাদ। বহুবার তাঁর সাথে সাক্ষাতের পরেও বিরক্তি ডেকে আনেননি কখনও। বরং মনে হোত—ভদ্রলোক যেন অসম্ভব রকমের আপন এবং বড় বেশি কাম্য। এর একমাত্র কারণ, তাঁর অন্তঃকরণ ছিল সহজ, সরল, মধুর ও হৃদ্যতাভাবে পরিপূর্ণ। যা চুম্বক শক্তিতে আকর্ষণ করতো।

বিরজানাথপুত্র রামনাথের সঙ্গে যাঁরা মিশেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই অনুভব করেছেন, তিনি ছিলেন শাশ্বত চাণক্য শ্লোকের মূর্ত প্রতীক। 'উৎসবে-ব্যসনে-শ্মশানে...' সর্বত্র রামনাথ তাঁর মহতি উদার হাত দুটি সদাই বাড়িয়ে ধরে সহাস্যে বিরাজমান। অপরের প্রয়োজনে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার এমন খাদহীন মানুষ 'কোটিকে গুটিক' হয় বলেই চির স্মরণীয়। তবে মনে রাখতে হবে—সব কিছুই ওনার

নিজস্ব ন্যায় ও নিয়মনীতিকে মেনে, লঙ্ঘন করে নয় কিন্তু।

রামনাথের অনন্য-সাধারণ বৈচিত্রময় জীবনচরিতের মধ্যে ডুব দিলে স্তম্ভিত হতে হয় তার ব্যাপ্তি ও বিশালতা দেখে। বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে এ যুগের এক ভ্রমণ পাগল ভবঘুরে পর্যটক অজয় মণ্ডল বললেন তাঁর বিহ্বল মনের কথা— "সেই সময়ের নিরীখে যদি নৃতত্ত্ববিদ হতেম, তাহলে মানুষটাকে উলটে পালটে সুলুকতল্লাস করে দেখতাম কোন উৎস হতে এল এই অফুরন্ত যাযাবরী শক্তির প্রেরণা। কেমন করেই বা পেল এমন হিমালয়-উদার, বেপরোয়া ডানপিটে, অন্যায় প্রতিরোধী ও অতলস্পর্শী অনুসন্ধানী স্বভাব। জ্যোতিষশাস্ত্র কিছুমাত্র জানা থাকলে, জন্মসময়ের গ্রহনক্ষত্র অবস্থান ও পাঁজিপুঁথি আঁতিপাঁতি করে ঘেঁটে বার করতে সচেষ্ট হতাম এতগুলি দুর্দান্ত গুণের সহাবস্থান রহস্য। সমবয়সী হলে জড়িয়ে ধরে বলতেম—তুমি তো ঘরকুনো হাঁফ ধরা পিছিয়ে পড়া জাতটার মূর্ত প্রতিবাদ। কই তোমার পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা উজ্জীবনী মন্ত্রের শান্তিজল আমাদের মাথায় ও গায়ে একটু ছিটিয়ে দাও দেখি। যাতে করে প্রৌঢ় বুক বাঁধে আশায়, যৌবন পায় উদ্দাম অশ্বশক্তি, আর ছোটরা বিস্ময় ভরা চোখে দেখুক অরুণ আলোর আভাষ। ভাতঘুমের আলসে ভূতে পাওয়া জাতটা একটু নড়ে চড়ে বসুক। পড়ুক না বেরিয়ে ঘর থেকে বাইরে, দিক থেকে বিদিকে। জলে-আকাশে, বনে-পাহাড়ে, দেশে-বিদেশে। শুধু কি তাই? এমন পোড় খাওয়া গোটা মানুষই তো হয়ে উঠতে পারে জাতির মেরুদণ্ড। কেন না তখন যে সে অনেক ঠেকে শিখে, প্রচুর দেখে-বুঝে-জেনে গড়ে উঠেছে অন্য এক মানুষ। নবতর পথের পথিক। এহেন দ্রষ্টা ঋষির তপোবন-তুল্য আঙিনা হয়ে উঠতে পারে আগামী উন্নত জীবনের সাধন-ভূমি।"

বামনাথ বিশ্বাস এমনই একজন বিস্ময়কর প্রণম্য পূর্বসূরী।



অসংখ্য জীবন-পাপড়ির চক্রাকার মেলবন্ধনে রামনাথের জীবন যেন এক পরিপূর্ণ পদ্ম। একটি একটি করে পাপড়ি মেলে ধরতে পারলেই হদিস পাওয়া যাবে সে ফুলের রূপ-রস বর্ণ-সৌরভ সমস্ত কিছুই :—

দর্শনধারী

মাথায় খাটো, পা দুটিও ছোটো, উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি (১৬২১/২ সেন্টিমিটার)। পেটানো শরীর, সামনে টাক, লম্বা নাক ও উজ্জ্বল গভীর দৃষ্টির চোখ সহজেই নজর কাড়ে। অস্বাভাবিক বেশি সাইকেল চালানোর জন্যে পা-জোড়া সামান্য ফাঁক রেখে একটু চাপ দিয়ে বেঁকে চলেন। অনেকটা নেপোলিয়ানের ভঙ্গিতে। চটপটে। সদা ছট্‌ফটে। কিছুতেই দুদণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারেন না। যেন বিরামহীন কাজের মেশিন।

ভ্রমণে তাঁর সাধারণত গায়ে থাকে খাঁকী ফুলশার্ট, পরণে যোধপুরী ব্রিচেজ, পাক্কা কাফেরী ধরণের পোষাক। মাথায় শোলার 'হ্যাট' বা টুপি। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। আবার খাঁকী হাফ শার্ট ও হাফ প্যান্টও পরতেন। যা দেখে, অনেকেই দারোগা ভেবে সেলাম ঠুকত। সূর্যতাপ এড়াতে সানগ্লাস ব্যবহার ও 'রিল্যাক্স' করতে সিগারেট ধরাতেন, সাহেবী কেতায়। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় মণিপুরী রক্তের (সত্তর ভাগ ব্রাউন মঙ্গোলিয়ান ও ত্রিশ ভাগ টিব্‌টো বর্মণ) সংমিশ্রণে যাদের শরীরের গঠন তাদের আকৃতি খুবই সুন্দর। রামনাথের শরীরে এর সাথে যোগ হয়েছে দেশীয় রক্ত। ফলে কিছুটা জাপানী মতো দেখতে হলেও দারুণ মজবুত স্বাস্থ্য। যে কারণে তাঁর বয়স ধরা যেত না এবং মুখমণ্ডল ছিল খুবই মসৃণ।

সাইকেল

তাঁর সাইকেলটি ছিল কিছুটা জার্মান, অনেকটা জাপান এবং ফ্রি-হুইলটা ইংলন্ডের। ফলে যেমন মজবুত, তেমনি গতি উঠত শন্-শন্ করে। সিঙ্গাপুরে শেষ একমাস নিজেই খোলা-পরা-সারানো শিখে নিয়েছিলেন। পিছনের কেরিয়ারে মাঝারি সাইজের কাঠের বাক্স বাঁধা থাকত। যার মধ্যে ছিল সাইকেল সারানোর যন্ত্রপাতি ও টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা। এটি অবশ্য চলার পথে সুন্দর করে তৈরী করে দেন চিনের সীমান্ত শহর 'আন্তং'এর প্রবাসী ভারতীয় বৃদ্ধ বাসিন্দা মিঃ আল্লাদিত্যা। সাইকেলটির ফ্রেম ত্রিভুজের মাঝে ঝোলানো বোর্ডে অর্ধবৃত্তাকারে লেখা থাকত ''রাউন্ড দ্য ওয়ার্লড্''। তার নিচেই সরলরেখায় জ্বলজ্বল করত ''হিন্দু ট্রাভেলার।'' 'হিন্দু' শব্দটি লেখার পক্ষপাতি না হলেও লিখতেন নিরাপত্তার কারণে। কেন না, সে সময় মালয়, চিন, তুরস্ক ইত্যাদি দেশে 'হিন্দু' কথাটির গুরুত্ব ও প্রচলন ছিল অত্যধিক। উপরন্তু সেই সময় 'ইন্ডিয়ান' শব্দটি পৃথিবীর অনেক প্রান্তে 'নেটিভ' এই ঘৃণিত শব্দের মতো ব্যবহৃত হতে দেখে, ভুলেও আর ওপথে পা বাড়াননি।

ন্যাসাল্যাণ্ড পার হয়ে পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকার ব্যরা (Beira) রেলগুদাম থেকে সাইকেল ছাড়াতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। কোনও সরকারী কর্মচারী সহযোগিতা করছে না। শেষকালে সাহায্যের হাত বাড়াতে যে লোকটি এগিয়ে এল—''সকাল বেলাতেই তার চোখে মুখে গোলাবী নেশার রক্তিমাভ চাকচিক্য ফুটে উঠেছিল।'' যাই হোক, তার সাথে গুদামে গিয়ে দেখেন, এক বিশাল লেবেল 'ভূপর্যটক' সাঁটা রয়েছে। স্থানীয় বহু মানুষ চোখ ছানাবড়া করে দুনিয়া ঘোরা সাইকেলটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। তা দেখে সাইকেল মালিকের যেমন আনন্দ হয়, আবার মনের কোণে শ্লেষও উঁকি মারে। সাথে সাথে ঠোঁটকাটা ভঙ্গীতে ছুঁড়ে দেন—''আমিই সেই লোক। সাইকেল দেখে কি লাভ হবে? আমাকেই দেখুন।''

কোলকাতা থেকে ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়ে পাটনাতেও ঘটে একই ধরণের ঘটনা। চালক নয়, সাইকেলটা দেখার জন্যে ভিড় জমেছে। অতি আগ্রহী কেউ বা আবার টিপে-টাপে দেখতে চায়। যেন যন্ত্রটির অলৌকিক ক্ষমতাতেই মানুষটা পৃথিবী দাপিয়ে

বেড়াতে সক্ষম। একজন কেতাবী ঢঙে প্রশ্ন রাখল—‘What make cycle?’

ব্যাজার চালক পাতি বাংলায় জবাবের ঢিল ছুঁড়লেন—“আমার বাবার।”

পৃথিবী ভ্রমণে তাঁর প্রিয় সাইকেলটি কয়েকবার খোয়া গেলেও রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্যে দিয়ে ফিরে পেয়েছেন। কেবলমাত্র একবারই যায় পাকাপোক্তভাবে। সেবাব চিন ভ্রমণে তোড়জোড় করছেন মাঞ্চুরিয়া ত্যাগের। এমন সময় ঘটল অঘটন। সাময়িক আস্তানা গেড়েছিলেন এক ভারতীয় সিন্ধী ভায়ার বাড়িতে। যে আবার সস্তা জাপানি সিল্কের ওপর ‘‘Made in India’’ ছাপ মেরে চিনাদের ভারতীয় পণ্যের প্রতি কদরের অন্যায় সুযোগ নিত। গতিক সুবিধের নয় বুঝে কেটে পড়ার ব্যবস্থা করে সন্ধ্যার পর সাইকেলে চড়ে বের হলেন কোরিয়ান সঙ্গীত শুনতে। পথে দুজন জাপানি যুবক সঙ্গ নেয়। হঠাৎ উভয়ের দিক হতে ‘কমিউনিস্ট’ কি না জিজ্ঞাসিত হলে তিনিও প্রশ্ন রাখলেন তারা কি ‘কমিউনিস্ট’ ভাব পোষণ করে? এইরকম কথাবার্তার মাঝেই তাদের অনুরোধে নিকটে এক বাড়ির দোতলায় পান করতে বসেন সরবৎ। সে সরবতে এমনই জাদু ছিল, যতই গলায় পাঠান, ততই জিভ শুকিয়ে আসতে থাকে এবং আরও খেতে ইচ্ছে করে। রাত ক্রমশ বাড়তে চলল। এদিকে জিভ অসাড়, কথা কইবার ইচ্ছে থাকলেও তা বের হয় না। মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। পা ঠিকমতো রাখাই যাচ্ছে না। এইভাবে অবস্থা যখন একেবারে সঙ্গীন হয়ে পড়ে তখনই কেমন ভাবে খবর পেয়ে সেই সিন্ধী ভায়া হাজির। কোনওরকমে ধরাধরি করে নামলে দেখা যায় সাথী দুটি বমাল ভোঁ-ভাঁ।

সবসেরা জীবনসঙ্গী গাঁটছাড়া হওয়ায় মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সে যাত্রা স্থানীয় ডানলপ কোম্পানির সহৃদয় ম্যানেজার একখানি সাইকেল উপহার দিয়ে সামাল দেন এবং বিশ্বযাত্রায় সহায়ক হন।

আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও, সুদীর্ঘ কষ্টকর ভ্রাম্যমাণ জীবনে একটা দারুণ অভ্যেস তৈরী করে ফেলেছিলেন। তা হলো, বিশেষ প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে নেওয়া। আর সেটি এই মহান সাইকেলের হ্যান্ডেলে ভর দিয়ে।

যৌবনের অগ্রদূত

পরিবেশের প্রভাবে হোক বা জলহাওয়ার গুণেই হোক, সে যুগে আমাদের মধ্যে একটি ভীষণ রকমের জাতীয় ত্রুটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা হলো ‘ঘরকুনো’ মনোভাব। সাধারণত ঘরের বাইরে যেতে হলেই জ্বর আসে বাঙালি মানসিকতায়। **এমনই ছিল ভাত ঘুমের আলসে পাওয়া কুঁড়ে স্বভাব। নাম তাই ‘ভেতো বাঙালি’। কিন্তু রামনাথ বিশ্বাস ছিলেন এই মনোবৃত্তির জীবন্ত এবং জ্বলন্ত প্রতিবাদ।** সারাটা জীবন ধরে সুকঠিন আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাঙলার তরুণ সমাজের সামনে যে আদর্শ মেলে ধরেছিলেন, তার তুলনা মেলা ভার। ঘরের কোণটুকু ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে পড়ে, ছড়িয়ে গিয়ে, পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ তিলে- তারিয়ে উপভোগের সঙ্গে হৃদয়ের ডালিতে সেই অর্জিত জ্ঞানের ফুলগুলি একে একে চয়ন করার চারণ গানে উদ্‌বুদ্ধ

করেছিলেন যুব সমাজকে। এখানেই তাঁর সব চাইতে বড কৃতিত্ব। দুনিয়ার সমস্ত যুবক শ্রেণীকেই তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসে গেছেন। তারা ভুল পথে চালিত হলে, প্রথমে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। তাতেও কাজ না হলে তীব্র ভর্ৎসনা করতেও পিছপা হতেন না। কেউ কেউ হয়ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন তাঁর প্রকৃত সৎ উদ্দেশ্য অনুভবে ধরা পড়তো, তখনই দেখা যায় অনুতপ্ত হয়ে যুবকটি সবিনয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, তাঁর প্রায় অর্ধশত পুস্তক লেখার পিছনে মুখ্য কারণ দেশের যুবকদেব অনুপ্রাণিত করা।

নব্য চিনের জন্মদাতা দেশপ্রেমিক সান ইয়াৎ সেনের জন্মভূমি হংকং-এর নিকটবর্তী 'মাকাও' বন্দরে বেড়াতে গিয়ে চোখ কপালে ওঠে। দেখেন শহরটার অলিতে-গলিতে ও পথে-ঘাটে হোটেল, নাচঘর, মদ্যালয়, চন্ডুখানা, 'মাজাং' জুয়াখেলা ও বিলাসে শুধু ভেসে যাওয়ার ঢল। দেখেশুনে মেজাজ ও মগজ দুটোই চরমে-গরমে ফেটে পড়তে চায়। শেষে রাস্তার ধারে কলের জল চোখে-মুখে ছিটিয়ে ও স্নান কবে কোনও রকমে নিজেকে সংযত রাখেন। আসলে, জাগ্রত মানুষটি যুবশ্রেণীর উচ্ছন্নে যাওয়া কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারতেন না।

আমেরিকা যাত্রাপথে লন্ডনের আগে পর্তুগীজ অধীন মনোরম মেডিরা দ্বীপপুঞ্জে নেমে অনুসন্ধান নিয়ে জানলেন, দ্বীপটিতে নিগ্রো ও ইউরোপীয়ান বর্ণসঙ্করে ভরে গেছে। কিন্তু আরও শুনলেন, আমেরিকা ও ইউরোপ হতে ধনীরা এখানে আসে কেবল পাপ বাসনা চরিতার্থ করতে। এবং তাদেরকে আহূতি দেওয়াব জন্যে এখানকার অনেক যুবক-যুবতী প্রস্তুত জেনে এমনই মানসিক যন্ত্রণার ধাক্কা খেলেন যে সামলাতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগেছিল। যৌবনের ধ্বংসলীলা সহ্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

ফস্‌ফস্ কবে প্যাডেল চালাচ্ছেন পিকিং-এর দিকে যাওয়ার জন্য। এক গ্রামে ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চলছে বিচারসভা। বিচার শেষে পিছুমোড়া করে বাঁধা ছ'টি যুবকের মাথার পিছন দিকে পিস্তল ধরে ট্রিগার টেনে দেওয়া হল। ভয়াবহ হৃদয়বিদারক দৃশ্যে মর্মাহত এবং চরম অসহায় বোধ করে ছুটলেন পাশের গ্রামে। চোখে মুখে ঠান্ডা জল ছিটিয়ে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে জানতে পারেন, মরণের জন্যই এই মৃত্যু। এবা চিনেব মুক্তির বেদীমূলে আপন যৌবনকে দিয়েছে উপহার। নিশুতি রাতে একান্তে ভাবছেন—"আহা! দেখতে প্রত্যেকেই যেন গোলাপফুল। নিজের পাপড়ী নিজের হাতে ছিঁড়ল কেন? এরা যদি আমার ছেলে হত?" ঘটনাক্রমে, দেশের কাজে আগ্রহী পৃথিবীর অসংখ্য যুবককে অকালে ঝরতে দেখেছেন চলার পথে। সেজন্য যুবকদের দেখলেই তাঁর অন্তঃসলিলা মনুষ্যত্ব 'হায় হায়' করে বলে উঠত—"এদের এই পৃথিবীতে অনেক কিছু উপভোগ করবার আছে, এরা এত তাড়াতাড়ি মরবে কেন?"

মানুষ রতন

রামনাথ যেখানে গেছেন, সেখানেই স্বাক্ষর রেখে এসেছেন উন্নত মনুষ্যত্বের। পরকে করেছেন আপন। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখে শুধু সমবেদনা অনুভব করে বা

জানিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, দরকার মতো বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্য-সহযোগিতার হাত। যখন যেদেশে যেতেন সেই দেশের মর্মকথা উপলব্ধি করার জন্য নিজের কথা, নিজ দেশের কথা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। শুধু সেই চলতি দেশের কথাই ভাবতেন। নিগ্রোদের বা অন্ত্যজ শ্রেণীর সঙ্গে মিশবাব সময় জ্ঞানী, বিদ্বান বা সবজান্তার ভূমিকা ভুলেও নিতেন না। একেবারে ওদের মতো করে অবলীলায় মিশে যেতেন। ফলে তারাও পর্যটকের কাছে হৃদয়ের দরজা হাটখোলা করে দিত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আফ্রিকা যাত্রার আগে বলেছিলেন, "দেখো রামনাথ, নিগ্রো চরিত্রে যা ভাল দেখবে, তাই বয়ে নিয়ে আসবে।" কিন্তু বঞ্চিত ও অত্যাচারিত নিগ্রোদের যন্ত্রণায় ব্যথিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, "নিগ্রো চবিত্রে কি আর ভাল দেখব? মনিব থেকে গোলাম পর্যন্ত সবাই নিগ্রো নির্যাতনে পরম উৎসুক।"

আফ্রিকার জঙ্গলপথে হাঁটছেন। সঙ্গে তিনজন নিগ্রো পথ প্রদর্শক। হঠাৎ তাদেরই একজনের পায়ে কাঁটা ফুটল। বিষাক্ত কাঁটা। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে শঙ্কিত হয়ে বলল, "বুনো জন্তু আক্রমণ করলে আমাদের ফেলে রেখে পালাবে না তো বাবু?"

রামনাথের মনুষ্যত্ব মুহূর্তে গর্জে উঠে—"বলে দে তারু (বয়স্ক নিগ্রোর নাম), আমি ইউরোপিয়ান নই। ভারতীয় ব্যবসায়ী অথবা কেরাণিও নই। আমি মানুষ, তোদের মতোই। একে ফেলে আমি কোথাও যাব না।"

পিকিং-এর পথে এক রিক্‌শাওয়ালা অন্য রিক্‌শাওয়ালাকে এমন মার দেয়, মুখ ফেটে বক্ত পড়ছে ঝরঝর করে। আর কি নির্বাক দর্শক থাকতে পারেন? তাড়াতাড়ি সাইকেল থেকে নেমে কেরিয়ারের বাক্স থেকে টুকিটাকি ওষুধপত্র বার করে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন চিকিৎসায়। যেন পুত্রের সেবায় মগ্ন ব্যাকুল পিতা।

এ প্রসঙ্গে একটি নিদাকণ ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর হৃদয়ের ব্যাপ্তি সাগরে ডুব দেওয়া যেতে পারে। পিকিং-এর চিনা টাওয়ারে চলেছেন। পথের ধারে একখানা কুটিরেব সামনে দুটি ফুটফুটে শিশু খেলছে। রামনাথের দাঁড়িয়ে দেখতে ভাল লাগল। কিন্তু শিশু দুটি ভয়ে দৌড়ে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে। 'আর একদিন এসে বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপ করা যাবে' ভেবে পা বাড়ান। মাত্র ক'দিন পরে ঐ পথে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। হাটখোলা ঘরে কঙ্কালসার হয়ে ছেলে দুটি নেতিয়ে পড়ে আছে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, জাপানের ধ্বজাধারী চিয়াং কাই শেক-এর সরকার কমিউনিস্ট বলে এদের বাবা-মাকে ধরে নিয়ে গিয়ে শিরশ্ছেদ করেছে। অথচ বাচ্চা দুটির কথা ভাবার দরকার হয় নি। ৩/৪ বছর বয়স এদের। প্রথমে বিহ্বল হয়ে ইতিউতি দেখে, হাঁড়ি-কুড়িতে যা ছিল খুঁটে খেয়েছে। পরে আর কিছু না পাওয়ায় একটু একটু করে ঢলে পড়েছে মৃত্যুর দিকে। রামনাথের প্রাণ থাকতে তা কি হতে পারে? আরে রামঃ! রিক্‌শা করে শিশুদুটিকে নিয়ে গিয়ে তিল তিল করে বাঁচিয়ে তুলে এমন নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন, যেখানে তারা আপন মনে খেলে-দেলে বড়ো হবেই হবে।

সমব্যথী

ব্যতিক্রমধর্মী মানসিকতার কারণে পরবর্তীকালে আক্ষরিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও, ব্যাপকতর অর্থে তিনি ছিলেন সাম্যবাদী। যা কোনও মতেই তথাকথিত সাম্যবাদীদের সঙ্গে মিলিয়ে বা ঘুলিয়ে দিলে চলবে না। বিশেষত নিপীড়িত মানুষের জন্য যেভাবে সমবেদনা অনুভব করতেন, তা তুলনারহিত। এই সূত্র অনুসারে ভগবানের মন্দির বা নামী ব্যক্তি দর্শনের সুযোগ শুধু বিশেষ লোকের জন্য, এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না।

আফ্রিকার অরণ্য-পথে চলেছেন। এক গ্রামে কয়েক ঘর ভারতীয় মিলে-জুলে আছে। অনুরোধ করলে তারা রামনাথকে আশ্রয় দিতে চায়, কিন্তু সঙ্গের নিগ্রো ক'জনাকে নয়। আগন্তুক গেলেন ক্ষেপে। 'তাহলে এমন আরাম আমার জন্যে নয়'' বলে দেশভাইদেব পিণ্ডি চটকাতে চটকাতে নিগ্রোদের গ্রামে চললেন গটমটিয়ে।

একবার ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে এক বাঙালি বি.এ. পাশ কেরানির ঘরে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে জমিয়ে মেতে উঠেছেন গল্পে। কিছু পরে তৃষ্ণার্ত হয়ে গৃহস্থের ধুলামলিন কাজের ছেলেটিকে এক গ্লাস জল চাওয়ায় আশ্রয়দাতা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—''না না, ছেলেটি অচ্ছুৎ জাতের লোক। অতএব তাব দেওয়া জল পান করা চলবে না।'' আশ্রয়প্রার্থী রেগে-মেগে উঠে পড়ে হাঁকলেন, 'কি তা (কি), অত বড় কথা? আপনি তো দেখতাছি বেচারিরে বামনর (বামুনের) গরুর মতন কেবল দুয়াইয়াই লইতাছইন (দুয়ে নিচ্ছেন)। জুঁকের (জোঁকের) মত রক্ত চুষিয়া খাইতা পারইন নিশ্চিতি (খেতে পারেন নিশ্চিন্তে)। অউ হিসাবে আমিও তাইলে অস্পৃশ্য। হিন্দুরে খায় না, অমন মাংসও যেমন খাই, মুসলমানেরে ঘৃণা করা মাংসও খাই। যাওর গিয়া (যাকগে), আপনার ঘরো আর খাওয়া অইব না (হবে না), থাকাও অইব না। তবে শুন্যা রাখইন (শুনে রাখুন), অউ ছেলেটা মানুষ ছাড়া আর কিছুই না। আমিও মানুষ। আপনি নায়। চল্‌লাম।' রেগে টঙ হয়ে পা বাড়ালেন দুপ্‌দাপ্ করে, কোনও রকম প্রত্যুত্তরের সুযোগমাত্র না দিয়ে। চোখ ঝলসানো প্রখর দিনের পর যেমন থাকে প্রশান্তিময় চাঁদনি রাত, তেমনি এঁর মধ্যেও আছে অন্তঃসলিলা কোমল রসের ফল্গুধারা। সে দিকটা হলো, পৃথিবীর সমস্তরকম বঞ্চিত, অসহায় ও আর্ত মানুষের জন্য তাঁর সজল প্রাণের দিক।

শুধুই কি মানুষ? জীবের আর্তিও শুনতেন হৃদয় দিয়ে। সিওলে এক কোরিয়ান ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দেখেন, সেখানে চলছে উৎসবের ব্যস্ততা। এদিক ওদিক চোখ রাখতে গিয়ে লক্ষ্যে পড়ে, একটি কুকুর বিষণ্ণ বদনে তাঁর দিকে চেয়ে এক কোণে পড়ে আছে। কি যেন বলতে চায়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, অতিথি আপ্যায়ণে বধের জন্য বিকালে আনা হয়েছে ওটিকে, চার ইয়েন মূল্যর বিনিময়ে। মুহূর্তে পর্যটক মশাই জীবটির ভাষা পড়ে নিয়ে করণীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান। গৃহস্বামীকে তীব্র আপত্তি জানিয়ে বোঝালেন, ওটিকে সঙ্গী করতে ইচ্ছুক। কুকুরটিও কেমনভাবে তার উপকারী বন্ধুকে ঠিকঠাক চিনে নিল। পরের দিন জীবটি

গলার 'বকলেস'-এ লাগানো চেনের সাহায্যে মহানন্দে টানতে টানতে রামনাথের সাইকেল যাত্রা আরো সহজ করে দেয়। 'সাইক্লিস্ট'ও সহজস্বাচ্ছন্দ্যে কেবল প্যাডেল ঘুরিয়ে চললেন সারাদিন। একজনের প্রাণ বাঁচা আর একজনের কষ্ট লাঘব: এইভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারার মাধ্যমে দুদিন পরে 'সুইসেনে' পৌঁছে কুকুরটিকে এক খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ভদ্রলোকের হাতে সমর্পণ করলেন। কেননা নিশ্চিত জানা ছিল, একজন খৃষ্টধর্ম গ্রহণকারী অন্তত কুকুরের মাংস খায় না।

আত্মনির্ভর

বিশ্বপর্যটকের মনুষ্যত্ব ছিল আত্মনির্ভরতার সোনালী রোদে ঝলমল করা। যা স্বয়ং প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত সবসময়। নিজের প্রতি গভীর আস্থা থেকে বলতে পারতেন—''আমার অনিষ্ট যদি আমি নিজে না করি তবে এই দুনিয়ার আর কেউ সহজে তা করতে পারবে না।''

সাংহাইয়ের দিকে চলেছেন। যেখানে তখন চিন-জাপানে 'রণংদেহী' অবস্থা। চিনারা জাপানী ভেবে তাড়া করছে তাঁকে। আবার, গ্রামের লোক 'জাপ্পুন কুই' (জাপানীভূত) ধরে নিয়ে কথাটি বলছে না, ঠাঁইও দিচ্ছে না। এদিকে নদীমুখো হওয়ার বদলে সম্পূর্ণ উল্টো পাহাড়ী পথে পড়েছেন, বিভ্রান্তিতে। দিনের পর দিন খোলা আকাশের তলে বিছানা পেতেছেন। তার ওপর অর্শ রোগের কবলে পড়ে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত ও মর্মাহত হয়ে পড়েছেন। মানসিক অবস্থা এমন চরমে ওঠে যে সেসময় আত্মহত্যা করে ফেলাও আশ্চর্য ছিল না। এমন সময়, হঠাৎ একদিন কৌতুক স্মৃতিতে ধরা দিল একটি লাইন—''শীতল বলিয়া এ চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ ভেল।'' ব্যস্। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে প্যাডেলে চাপ দিলেন, গভীর আত্মবিশ্বাসে।

অন্য মানুষ

শিশুকাল থেকেই 'রামা' সন্দেহাতীতভাবে একমুখী সরল-সোজা। জটিলতার আবর্তকে তাঁর মন-দরজায় মাথা খুঁড়ে ফিরে যেতে হয়েছে বারবার। জীবনে অনেক প্যাঁচ কষাকষি, স্বার্থের কুটিলতা, হীন মনুষ্যত্বের বেড়াজালের মধ্যে দিয়ে হেঁটেছেন। কিন্তু কখনও তা ওনাকে টেনে নামাতে পারে নি, স্থায়ীভাবে। বরং উত্তরোত্তর মহত্ত্বের পথে নিজেকে তুলে ধরেছেন। গবেষণাকালে জানা গেছে, সিঙ্গাপুর থাকাকালে সাচ্ছল্যের কারণে ত্রয়ী 'ম' কারের জোয়ারে ভেসেছিলেন। কিন্তু ডুবে যাননি। আর ডুবে যান নি বলেই, যেদিন থেকে তিনি নিঃস্ব পর্যটকরূপে প্যাডেলটি চালু করলেন পৃথিবীর বুকে, ঠিক সেদিন থেকে এক মহত্তর লক্ষ্যে উন্নীত হওয়ার মাধ্যম হিসাবে শুরু করলেন আত্মত্যাগী ব্রহ্মচারীর জীবন। কিন্তু এ কেমন ব্রহ্মচারী? নারীসঙ্গলিপ্সা পুরোপুরি বর্জন করলেন, অথচ খাদ্যাখাদ্যে ছুৎমার্গ কখনো মানেননি। আবার সাধু সন্ন্যাসীর একান্ত সঙ্গোপন জীবনও তাঁর কাছে চরম ঘৃণ্য। এখানেই তিনি বৈপ্লবিক।

মানুষ —মানুষ! আসলে, দু'চাকার সাথে সাথে রক্ত মাংসের আদর্শ মানুষের লক্ষ্যে

এগিয়ে চলেছেন রামনাথ বিশ্বাস। নিজেকে ধ্বংসের রাস্তা হতে সরিয়ে, পুরুষকারে আস্থাশীল যে মানুষের মানসভূমিতে থাকবে না অন্ধ কুসংস্কারের বেড়াজাল। ভেঙে ফেলে জাত-বেজাতের দেওয়াল, ধুলোর মতো উড়িয়ে দিতে চায় তথাকথিত ধর্মের আত্মকেন্দ্রীকতাকে। যার ফলে হৃদয়টি হয়ে উঠবে পৃথিবীর মতোই মহৎ-উদার স্নেহশীল। জগৎকে দেখতে ও জানতে চাওয়ার ক্ষেত্রে গভীর চোখ দুটি কেবল তখনই হয়ে উঠতে পারে উদ্দীপ্ত আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীক। এ বিষয়ে 'জুজুৎসু জাপান' ভ্রমণ কাহিনীর এক ফাঁকে ছোট্ট করে মেলে ধরেছেন নিজেকে—"যে দিন থেকে আমি পথে বের হয়েছিলাম, সেদিন থেকে আমার নানারূপ দোষ সিঙ্গাপুরেই ছেড়ে দিয়ে আসছিলাম। ছিলাম ব্যভিচারী। পরে যখন পথে নেবেছিলাম তখন কয়েক মাসের মধ্যেই হয়েছিলাম ব্রহ্মচারী ও অদৃষ্টবাদী। তারপর যখন চিনে প্রবেশ করলাম তখনই বুঝতে পেরেছিলাম মানুষের অদৃষ্ট মানুষই গড়ে। সেজন্য, অদৃষ্টবাদ পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য বজায় রেখে নিজের কাজের উপরই সব কিছু নির্ভর করে চলতাম।"

বেলগ্রেদের নদীতীরে স্নানের উচ্ছলতায় একদল যুবক-যুবতী। মুগ্ধ হয়ে দেখছেন তাদের আনন্দ-উচ্ছল কলকলানি। হঠাৎ দুটি উদ্ধত যৌবন যুবতী ভিজে পোশাকে এসে তাদের সঙ্গে স্নানের আবেদন জানায় রামনাথকে। ইচ্ছুক না হলে প্রশ্ন করে, "এত সঙ্কোচ করছ কেন?"

অকপটচিত্তে স্বীকার করেছেন - "আমাদের সঙ্কোচের পেছনে রয়েছে বাসনার আকাঙ্খা"। আরো বুঝেছিলেন, "ওরা পরীক্ষা করতে চাইছে, বিদেশী পশু না মানুষ।"

কোরিয়ার ফুসানে (FUSAN) উঠেছেন জাপানী হোটেলে। পরিচারিকা সুন্দরী যুবতী। তার ভাবী জীবন সম্বন্ধে নানা চিন্তা ভূপর্যটকের মাথার মধ্যে ঘুরে যেত। কিন্তু যখন কাছে বসে মেয়েটি খাবার দিত, তখন তার মুখের দিকে তাকাতেন না। কারণও ছিল। যুবতী দেহলাস্যের আকারে ইঙ্গিতে মুসাফিরকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করত। শেষে কোনওভাবে সফল না হয়ে একদিন সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলেই ফেলল - "হে মহামান্য পথিক, তুমি কি সন্ন্যাসী?"

রামনাথ ধীর অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, "কেন আমি সন্ন্যাসী হতে যাব, আমি কি কাপুরুষ। আমি সন্ন্যাসী নই বলেই পৃথিবী ভ্রমণে বের হয়েছি।"

স্বপ্নের অতীত এহেন বিচিত্র মতাদর্শবাদীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে স্থির হয় লাস্যময়ী। প্রচলিত ধারণা—'বিশ্বাস' পদবী সাধারণত নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের মধ্যে চালু এবং 'রামনাথ' শব্দটা সচরাচর নিম্নবর্ণের লোকের হয়ে থাকে। দুয়ে মিলে খুব অল্পই আছে উচ্চবর্ণের। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, ঘটনাক্রমে তিনি সেই মুষ্টিমেয়র দলে। তখন ব্রিটিশ মিলিটারি বিভাগে কাজ করছেন। একদিন এক চট্টোপাধ্যায় ওঁর ঘরে অতিথি হলেন। উচ্চবর্ণের অহংবশতঃ অতিথি একটি পৃথক বিছানা দাবি করে বসলেন। কারণ তিনি নীচুবর্ণের মানুষের সাথে একসাথে শয়ন করেন না। সেবক আর কি করেন? দ্বিতীয় বিছানা না থাকায়, এক রাত্রের মত নীচবর্ণ সেজে মাটিতে শুলেন, বাধ্য হয়ে। কিন্তু সারারাত মাটিতে শুয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝলেন

নীচুবর্ণের মানুষের জ্বালা। শরীরে অসহ্য ব্যথা ও জ্বর কামড়ে বসে 'নিউমোনিয়া' হয়। অনুভব করলেন বর্বরোচিত জাতিভেদের নগ্নরূপ। সেরে উঠেই ব্রাহ্মণত্বের তথাকথিত লক্ষণ নিজস্ব পৈতে ছিঁড়ে ফেললেন 'ফচাৎ' করে।

স্বাধীন

আসলে, মানুষটা বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্ট এক আশ্চর্য অতিথি। যাকে কোনো প্রলোভনে আটকে রাখা যায় না। কোনো বাঁধনেই বেঁধে রাখা সম্ভব হয় না। চির স্বাধীন। যেন পৃথিবী দর্শনের উদ্দেশ্যে শ্বেত বলাকা তার মসৃণ ডানা দুটি ভাসিয়ে দিয়েছে সুনীল আকাশের বুকে। উদাসীন অমলিন। উত্তর আফ্রিকায় 'ডুডুমা' থেকে ৩৩৭ মাইল দূরে 'ইরিংগা'। এই পথে যেতে এক গ্রামে গিয়ে দেখেন, ঈষৎ উষ্ণ নদী জলে স্নান করতে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নেমে পড়েছে নিরাবরণ দেহে। রামনাথের মাথায় বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত খেলে গেল—"এসেছি উদলা হয়ে যাব তো আদুল গায়ে।" ঝটিতি দিগম্বর হয়ে ঝাঁপ দিলেন, প্রকৃতির খেয়াল খেলায় মেতে উঠতে।

যৌবনের প্রারম্ভেই ছেড়েছিলেন প্রত্যক্ষ রাজনীতি। কারণ, ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা পাবার জন্য যতটুকু বিপ্লবের দরকার, তার একচুলও বেশি কেউ অগ্রসর হচ্ছে না দেখে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে, ভূপর্যটনের ঠিক আগেই সিঙ্গাপুরে নতুন করে যোগাযোগ হয় 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন', 'যুগান্তর', 'ফ্রি বেঙ্গল ব্রিগেড' প্রভৃতি আন্ডারগ্রাউন্ড বিপ্লবী দলের সঙ্গে। দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনই ছিল যাদের একমাত্র ত্যাগব্রত। এদের মধ্যে বাকিরা অংশত হলেও মুখ্যত 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন'-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তাঁকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে সাইকেলে ভূপর্যটনে আগ্রহী করে তোলা হয়। ভূ-পরিক্রমায় নানা শিক্ষার জন্যে মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও দলীয় কার্যসিদ্ধির ব্যবস্থাও বড় কম ছিল না। দু'চাকার পথে পথে মালয়েশিয়া, চীন, ইন্দোচীন, কোরিয়া ইত্যাদি দেশে তাদের গোপন সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য রামনাথকে টেলিগ্রামের তার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। এজন্য গছিয়ে দেয় বেশ কিছু সংকেত বস্তু। গায়ের জামার 'লাইনিং' এ ভরে নিয়েছিলেন বিভিন্ন দেশে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গোপন চিঠিপত্র। সাইকেল মার্ডগার্ডের নীচে পর্যন্ত ছিল জিনিস। 'কোড' সংবাদের মাধ্যম করে দেওয়া হয়েছিল আলু, ডিম ও চিরুনি। তিনি স্মিত হাস্যে বলেছিলেন—'আলু আর ডিম না হয় চপ করে মার্মলেড করে খাবো. চিরুনি দিয়ে কি হবে? আমার মাথায় তো টাক্।'

রসিকতা দিয়ে শুরু করলেও পৃথিবীর উদার বুকে চাকা দুটি গড়িয়ে দেওয়ার পরেই মর্মে মর্মে টের পেয়েছিলেন—এগুলি আসলে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলতে চায়. তার নিজস্ব চিরস্বাধীন সত্তাকে। অনুভূতির সূক্ষ্ম পর্দায় আঘাত করে কে যেন অনবরত শুনিয়ে যাচ্ছে—"এ শুধু মুক্ত বিহঙ্গকে খাঁচায় পোরার নিদারুণ চক্রান্ত।" অতএব, হাঁফ ধরা সে বাধন খুলে ছুঁড়ে ফেলতে শুরু হলো এক শ্বাসরুদ্ধকর দড়ি টানাটানির খেলা, মনের অন্দরমহলে। —'প্রাণটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। আমার ভ্রমণ যেন আমার

ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, ওটা যেন সর্ব্ব প্রকারে আন্ডারগ্রাউন্ড দলের খেয়ালে চালিত করতে চায় এরা। এ অসহ্য! এ অবস্থা আর বেশি দিন চলতে দেব না। মাডগার্ডের আলু আর ডিম বিলি হলে আর কারু চিঠি বা কোন সংকেত বাণী বহন করবো না। আমি কি এ দলের ক্রীতদাস!'

শ্যাম দেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক-এ যেদিন 'গ্রে হর্স' কে (ছদ্মনামের বিপ্লবী) সাইকেলের মাডগার্ড খুলে তার নীচ থেকে শেষ 'কোড' আইভরি চিরুনী হাতে তুলে দিলেন, সেদিন গুরুভার দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে মুক্তির কি অপার আনন্দ—"যে সঙ্গী 'পিলরী' ফাঁসিব মত কণ্ঠ লগ্ন থাকে সে সঙ্গী চির অবাঞ্ছিত। তাই সঙ্গীর দরদ থেকে মুক্তি, কোড সংবাদ বহনের ঝক্কি থেকে নিস্তারলাভ, আমায় সকল দায়িত্বের পর-পারে পৌঁছে দিয়েছে। আমায় আর পায় কে!"

দুনিয়ার পথে অজস্র তিক্ত অভিজ্ঞতার পাঁচন ঝেড়ে ফেলে কেবল তিনিই অনায়াসে স্বাচ্ছন্দ্যে বলতে পারেন—"ভবঘুরের মনের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য মানুষের মন মেলে না। সেটা আমি বেশ বুঝতে পারি। আমার চিন্তা এবং দৃষ্টি সে যেন একান্তই আমার নিজস্ব। এখানে আমি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমার খেয়ালী মনই তো একদিন পথে টেনে বের করেছে আমায়—আজও সেই ছন্নছাড়া মনকে আমি ভালোবাসি। তাই পথে বেরিয়ে অপরেব কথায় আমার চলাফেরা করতে ভাল লাগে না।"

কারও ইচ্ছে মতো চলতে শুধু হাঁফিয়ে উঠতেন, এমন নয়। কখনো কখনো ফেটে পড়তে ইচ্ছে হতো। সে কারণেই, মানুষটা মনেপ্রাণে কমিউনিস্ট হয়েও এবং বিশ্বের তাবড় তাবড় কমিউনিস্ট নেতাদেব সাথে যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে আর কখনও সে দলেব সভ্য হননি। এমনই স্বাধীনচেতা মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। অথচ এটা ঘটনা, শুধু মতাদর্শের বেশ কিছুটা মিলগত কারণে, শেষ জীবনেব খানিকটা সময় একসাথে খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা করে কেটেছে, শ্রদ্ধেয় কাকাবাবু অর্থাৎ মুজঃফব আহমেদ-এর সঙ্গে।

চিনের মুকদেনে আস্তানা গেড়েছেন এক ভারতীয় সিন্ধী ব্যবসায়ীর কাছে। ভরদুপুরে দোকানেব ভিতব ঢুকে আক্কেল গুড়ুম। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে দেখেন—সস্তা জাপানী সিল্কের গায়ে 'Made in India' ছাপ মারা হচ্ছে। কেননা, চিন দেশে ভারতীয় সিল্কেব তখন খুব কদর। মাঝখান থেকে অপকর্মটি দেখে ফ্যালায় উল্টো ফ্যাসাদ! ব্যবসাদার কড়কে দিলেন —"আপনি এমন করে দাঁড়াবেন না, যখন আমরা কাজ করি।' স্বাধীনতার মাথায বাজ! থাকা-খাওয়া সারতে হলে ঠকবাজ আশ্রযদাতাকে নীরব সমর্থন করতে হয়। কিন্তু তা কি করে হয়? স্বভাবটা যে একেবারেই বিরুদ্ধবাদীর দলে। অতএব তল্পিতল্পা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, গজ্‌গজ্‌ করতে করতে।

সেবার, আটলান্টিকের বুকে আমেরিকা যাত্রী। লক্ষ্য করে দেখলেন এক ধনী ভারতীয় যাত্রী সাদা চামড়ার তিরস্কারেব ভয়ে কেঁচো হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। খাবার খাচ্ছেন নিজের কেবিনে বসে, ডাইনিং রুমে না গিয়ে। বামনাথ তাঁকে বগলদাবা করে

'স্মোকিং রুমে' ঢুকে সহাস্যে বিয়ারের অর্ডার দিলেন। এবং দুদিনের মধ্যে জাহাজের সিস্টেমটাকেই দিলেন বদলে।

তখন দক্ষিণ আফ্রিকার শহরে বা সমুদ্র-জাহাজে জাপানী এবং তুরুক ছাড়া অন্য কোনো এশিয়াবাসী বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারে না। এ ব্যাপারে রামনাথ বরাবরই নির্ভীক এবং স্বাধীনচেতা। জাহাজের ডেকে মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এক ক্রোধান্বিত সাহেব সামনে এসে রূঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—"এই, তুই কি প্যাসেঞ্জার?"

রামনাথের ঝটিতি জবাব, "হ্যাঁ, তোর মতোই"। বলেই ফিচ্‌কি হেসে নিজের সম্বন্ধে ঠুকে দিলেন ব্যঙ্গোক্তি, "আমার মনে হয় এই লাইনে যেসকল ভারতবাসী ভ্রমণ করছে, তাদের মধ্যে আমিই বোধহয় অভদ্র এবং স্বাধীন যাত্রী।"

জাতীয়তাবোধ

দুচাকায় সারা পৃথিবী চষে বেড়ালেও কখনও ভোলেননি, তিনি সুজলা-সুফলা বাঙলা মায়ের সন্তান। বরং এটাই তাঁর একমাত্র অহঙ্কার। প্রতিটি কথা, কাজ ও চিন্তার মধ্যে যে একটা ঝলসে ওঠা তেজস্বী মনুষ্যত্বের ছাপ পাওয়া যায়, তার রহস্য লুকিয়ে আছে প্রখর জাতীয়তাবোধের গভীরে। তিনি ছিলেন জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক।

মাথা উঁচু করে আত্ম পরিচয় দিতেন—"আমি বাঙালি প্রথম। বাঙলা ভাষা যারা বলে তারাই আমার জাতভাই, তারপর ইন্ডিয়ান।" তাঁর প্রাণের ছন্দে যে লাইন ক'টি নাচানাচি করতো—

"বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।"

লাগাম ছেঁড়া মনটা দাপিয়ে বেড়াতো এই ভেবে—

"বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্র-বৃষভ ঘটাবে সমন্বয়"!

'পারস্য ভ্রমণ'-এ লিখছেন—"পৃথিবীতে একগোছের লোক দেখতে পাওয়া যায়, যারা মাতৃভাষা অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। আমার মতে তারা হল কাপুরুষ। নিজের দেশের এবং নিজের জাতের উন্নতি করাই কর্তব্য। বাইরে পালিয়ে গিয়ে তত বৎসরই থাকা যায়, যত বৎসর শরীরে শক্তি এবং বেঙ্কে (BANK) নিজের নামে প্রচুর অর্থ থাকে।"

জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য যে কোনও মুহূর্তে, যে কোনও মূল্যে বিদ্রোহী হতে পারতেন। সিঙ্গাপুরে যখন চুটিয়ে এবং মহাফুর্তিতে ব্রিটিশের অধীন সরকারী চাকরী করছেন, সে সময় মেদিনীপুরে বিপ্লবীরা 'বার্জ' সাহেবকে হত্যা করে। প্রত্যেক দেশের সংবাদপত্রে তার খবর বের হয়। সন্ধ্যার সময় 'মলয় ট্রিবিউনে' সংবাদটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ পড়ে যায়। পরের দিন অফিসে পৌঁছলেই আর সকলে মিলে বাঙালি জাতের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক ইংরেজ সহকর্মী আবার এক কাঠি বাড়া। আক্রমণের ঝাঁঝটা তার অতিরিক্ত হওয়া মাত্র রামনাথ সপাটে কষিয়ে দিলেন পাঁচ আঙুলের দাগ বসানো চড়। তারপর ব্যাখ্যা করলেন—"আমাকে যা ইচ্ছা তাই

বল, আমার মা-বাপকে প্রাণ ভরে অভদ্রচিত গাল দাও। কিন্তু আমার জাতকে আমার সামনে বলার কি অধিকার রাখ?'' এমনই অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন নিজের জাতকে। বিবাদ সেবারে অবশ্য বেশি দূর গড়ায়নি। রিপোর্ট করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন ইন্সপেক্টর। শাসিত কালো জাতের লোক চড় মেরেছে, কোর্টে দাঁড়িয়ে একথা বলাও ইংরেজের পক্ষে তখন অপমানজনক ব্যাপার ছিল। দেশের কাজে আগ্রহী পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের যুবক-যুবতীদের দেখা পেলেই বোঝাতেন—'দেশসেবা করবে যদি, নিষ্কামভাবে করো। না পারলে হটো।'

পৃথিবীর পথে, যেসমস্ত মানুষ প্রভু-জাতির হয়ে নিজ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতো, তাদের প্রতি রামনাথের ঘৃণা যেন আছড়ে পড়তে চাইত। এমন লোক দেখলে অগ্নিদৃষ্টিতে থুতু ফেলতেন।

এছাড়া যখন যেমন পেরেছেন, 'বন্দেমাতরম' শব্দটি ও গানটির প্রচার চালিয়েছেন। অভিজ্ঞতা থেকে দেখিয়েছেন (৪ঠা জুন, ১৯৩৭ 'দেশ' সাপ্তাহিক) ভারতের বাইরে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের প্রভাব কত জোরদার। বিদেশে ভারতীয় মুসলমানও 'বন্দেমাতরম' বলে একে অন্যাকে সম্ভাষণ জানায়, নাহলে ভারতীয়ত্ব বজায় থাকে না। এ সত্য ভাষণের জন্য তিনি বঙ্গের 'ডন' পত্রিকার কাছে চক্ষুশূল হয়ে সমালোচনায় বিদ্ধ হন।

ব্রহ্মদেশের মন্দালয় শহরে এক বাঙালি ভদ্রলোক হিন্দুদের বাড়িতে পূজা পার্বণ করতেন। তিনি রামনাথকে দেখেই কি মনে করে প্রশ্নের ঢেলা ছুঁড়লেন —''আপনার জাত আছে, কি নেই?''

তাঁকে একটুও না চটিয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন—আমার জাত চলে গেছে, শুধু আছে বাঙালিত্ব। এটাই শুধু যায় নি।''

ব্রাহ্মণও অতি সোজা ভাষায় বললেন--''এটা আর যাবে কি করে, মরণের সঙ্গে বাঙালিত্ব যাবে। কিন্তু জাতটা দিলেন কেন?''

হঠাৎ দমকা হেসে সাচ্চা বাঙালি মোক্ষম জবাব রাখলেন—''ধর্মটা অর্থাৎ বাঙালিত্ব মৃত্যু পর্যন্ত থাকবে, সেই ধর্মই আসল ধর্ম, আর সবই বাজে।'' পুরুত ঠাকুরের একগাল মাছি।

তবে একথা ঠিক, বিদেশে নিজেকে শুধু বাঙালি নয়, 'ভারতবাসী' এই পরিচয়ই গর্বের সঙ্গে দিতেন। কোনও মানুষ বা সাংবাদিক যখন প্রশ্ন করত, ''আপনি এভাবে ঘুরছেন কেন?'' বুক ফুলিয়ে উত্তর দিতেন—'আমি পৃথিবীটাকে দেখতে এবং ভারতবর্ষকে দুনিয়ার মানুষের কাছে পরিচিত করাতে বেরিয়েছি।' শুধু তাই নয়, সর্বত্র ভারতের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সভ্যতার প্রচার করতেন, দরদ ভরা চিত্তে।

হিন্দুর ঘৃণ্য জাতিভেদের অত্যাচার হতে ভারতবাসীকে কি করে মুক্ত করা যায়, তার জন্য এক-আধদিন নয়, সারাজীবন ধরে চিন্তা ভাবনা করে গেছেন। বিশ্বপরিক্রমার সময়ও ব্যতিক্রম হয় নি।

আমেরিকা সফরে লক্ষ্য করেছেন, অনেক ভারতীয় নানা হীন কাজে লিপ্ত, যার

ফলে দেশের বদনাম হয়। অন্যদিকে, অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী সেখানে গিয়ে বাজে কাজে দিনযাপন করেন। ভারতীয় ধর্ম প্রচারকগণ আমেরিকায় গিয়ে ধর্ম প্রচার করেন, অথচ এই সমস্ত মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য স্বদেশবাসীদের সৎবুদ্ধি দিয়ে সুপথে আনার চেষ্টাই করেন না। তা দেখে, তিনি নিজে ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করে কঠিন ভর্ৎসনা করেছেন—সমস্তরকম জাতীয় সংহতির অবমাননাকর হীন কাজের বিরুদ্ধে। উল্টোদিকে, চোখের ঠুলি সরিয়ে দেখিয়েছেন, বিপুল জাতীয় ক্ষতি-সম্ভাবনার দিক।

নিউইয়র্কের রেডিও সেন্টারে রামনাথকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 'মাউথ পীস'এর সামনে ভারতের ভাষাবিভিন্নতা নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক প্রশ্নের টোপ রাখা হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝলেন, 'লিভ ব্রডকাস্টে' ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছে, সঙ্গে সঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠে অত্যন্ত বাক সংযমের সাথে নির্ভুল তথ্য-অস্ত্রে তা খণ্ডন করে পাল্টা আঘাত হানতে লাগলেন, একের পর এক। সামান্য টাকার লোভে দেশকে বেচা বা দেশের মাথা নত করা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। দেশ তাঁর কাছে আর সব কিছুর চেয়েও বড়। বলতেন— "যোগী হওয়া সোজা, ভগবান লাভ করাও সোজা, কিন্তু দেশ সেবা বড় কঠিন কাজ।" আবার রঙ্গব্যঙ্গে জাতীয় ত্রুটির মাধ্যমে মাটির ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেও ভোলেননি—"সারা পৃথিবীতে, যখনই কারো রাগ হয়, তখনই তাদের মাতৃভাষা কণ্ঠে এসে ভর করে। আমাদের যখন রাগ হয়, তখন আমরা ইংলিশ, আরবী, ইরাণী সবই বলি, শুধু বলি না মাতৃভাষা।"

ধর্ম ও ভগবান

জ্ঞান হওয়া থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে মানুষ প্রবহমানতার বিরুদ্ধে লড়াই চালায়, ধর্ম ও ভগবান বিষয়ে সে যে অন্য রকম ধারণা পোষণ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি? এ ব্যাপারে রামনাথ অনেকটা পিতামহর স্বভাব পেয়েছিলেন। রামনাথের বাবা যখন চাকরি ও দস্তুরমতো সংসার ধর্ম পালন করছেন, তখন পিতামহ একদিন সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করতে উদ্যত। কিছুদূর যাওয়ার পর পিতামহ যখন দেখলেন যে তাঁর ছেলে পিছন নিয়েছে, তখন ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিয়ে বলে ছিলেন—"এখন তুমি আমার কেউ নও।" পিতামহের এটা শ্মশান বৈরাগ্য ছিল না, বরং অবতারবাদের প্রতি আক্রোশ বলা যেতে পারে। বেদান্তের পণ্ডিত অবতারবাদ সহ্য করেন কি করে? অথচ সমাজে থাকতে হলে অবতারবাদ মানতেই হবে। সে কারণেই সমাজ পরিত্যাগের দুঃখজনক কাহিনী।

এছাড়া সোজা-সাপটা স্বভাব, অন্তহীন জিজ্ঞাসু ও পৃথিবী পর্যটনে হাজারো অভিজ্ঞতা অর্জন করে রামনাথের দৃষ্টি হয়ে উঠেছিল যেমন স্বচ্ছ, তেমনই সুদূরপ্রসারী। ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে ঘটনাক্রমে এমন অসংখ্য রকমের উক্তি করেছেন তাঁর নিজস্ব বোধের অন্তস্তল থেকে; যেগুলি বিস্ময়কর, বাস্তব এবং প্রবাদতুল্য চিরন্তন মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। এগুলি ক্যামেরাযুক্ত 'ফ্ল্যাশ লাইটের' সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যার বিচ্ছুরিত আলোক ছটার সাহায্যে আমাদের মন-ক্যামেরার

'নেগেটিভ'-এ স্থায়ী আসন করে নেয়; আরও ভালো করে জানতে রামনাথকে।

এখন সেই অসংখ্য থেকে, শুধু ধর্ম ও ভগবান বিষয়ক ধ্যান-ধারণার উদ্ধৃতি পরিবেশন করা যাক—"মানুষের মনের ভয়ের ভিতর থেকেই ভগবানের জন্ম।" "পৃথিবীতে কেউ পুরোপুরি সাধু হয়ে জন্মায় না। প্রত্যেকেরই লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু অল্পবিস্তর আছে।" "ভারতে যেমন করে ধর্মের নামে উৎশৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, অন্যত্র তেমন কোথাও দেওয়া হয় না।" "সনাতনী হিন্দুরা নিজের ধ্বংসের কারণ না অন্বেষণ করে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়েই সুখী হয়।" "লোকে দেবতার পূজা করে না, পূজা করে দেবতারূপী ভয়কে। ভক্তি হল ভয়ের একটা অংশ।" "আমি ওসব আধ্যাত্মিক বাজে কথায় নাই। আমাকে বাঁচতে হবে। ঘুরে ফিরে এ দুনিয়া দেখতে হবে। আমার শক্তির দরকার। ভগবান আছেন কি না সে কথায় আমার দরকার নাই। আমি এমন স্বর্গে যেতে চাই না যেখানে নির্দিষ্ট কয়েকটিমাত্র লোকই যায় বা যেতে সক্ষম হয়।" "সাধু মানেই পর' নির্ভরশীল।" চিনের পথে এক ধর্মগোঁড়া বেঁফাস প্রশ্ন করায় 'গ্লোবট্রটার' এর মন ও পেন দুইই ক্ষেপে ওঠে—"ধর্ম আবার কী? যতো বাজে অকেজোদের সৃষ্টি ধর্ম। যাদের শক্তি আছে, রাজ্য আছে, তারা কখনও আত্মপরিচয়ে ধর্মের দোহাই দেয় না। স্বার্থপর কাপুরুষরাই নিজের আত্মপরিচয় দেয় ধর্মের তক্‌মা এঁটে। কারণ তার স্বাধীনতা নেই। অর্থ তার আরাধ্য। শুধু আত্মগোপন করবার, জোচ্চুরী করবার প্রশস্ত পথ বলেই তারা ভগবানের নাম করে, ধর্মের নাম করে।" "কাপুরুষ, ধূর্ত এবং ইতরগণই ভাগ্য এবং ঈশ্বরের কথা বলে এবং সকল অন্যায় কাজ করে।" "ধর্মগুলি জগৎকে উন্নতির পথে অনেক টেনেছিল, কিন্তু ধর্মের তেজ ক্ষণস্থায়ী।" "আকুতি দ্বারা, উপদেশ দ্বারা দুর্বলের উপর অত্যাচারকে দমন করা যায় না। যদি অত্যাচারীকে নিরস্ত করতে হয়, তবে অত্যাচারিতকে শক্তিমান হতে হবে। ধর্মের কাহিনী বাজে কথা মাত্র।" "শনিঠাকুর, বৃহস্পতির বারবেলা, মঘানক্ষত্র এসব হল আর্থিক দুর্বলতার সৃষ্ট।" "ধর্ম তিন রকমের। একটা হল, শূন্য কথা আবৃত্তি করা, দল পাকান এবং পরের অনিষ্ট করা। দ্বিতীয় হল, যোগসাধন করা এবং তার ফলে নিজেরই উন্নতি করা। তৃতীয়টি হল, যতক্ষণ দরকার ততক্ষণ নিজের নিজস্ব সত্তা বজায় রাখা। এই প্রথম শ্রেণীতে জগতের প্রায় সমুদায় লোক অবস্থিতি করছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দলের লোক সংখ্যা সমুদ্রে বিন্দুবৎ।" "যে দেশের লোক যত বেশি অন্যায় কাজ করে সেই দেশেই ধর্মের বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায় তত বেশি।" "মদ যেমন মানুষের পক্ষে ঔষধ রূপে ব্যবহার হয়, আবার অত্যধিক ব্যবহারে বিষের চেয়েও অধম হয়, ধর্মও তেমনি। যতদিন জ্ঞানদায়ী থাকে তত দিনই ভাল। যেই সাম্প্রদায়িক হয়, অমনি তা হতে এমন হলাহল উৎপন্ন হয় যে, জাতি সে বিষে বিষাক্ত হয়ে মরে।" "পৃথিবীতে মানুষের প্রচারিত যত ধর্ম আছে, তার স্থায়িত্ব রাজশক্তির সাহায্যের উপর নির্ভর করে। রাজাদেশ ধর্মের প্রচারিত বিধিনিষেধকেও ডিঙিয়ে যায়।"

তবু, তথাকথিত নয়; সত্যি সত্যিই তিনি একসময় প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের প্রতি

আকর্ষণ অনুভব করতেন। কেননা, বৌদ্ধালোক তাঁর জীবনে অন্ধকার দূর করতে সহায়ক হয়েছিল, বেশ কিছুটা। তুর্কী দেশ ঘোরার সময় আংকারা'র থানায় ধরে নিয়ে পুলিশ কর্তার সাথে ভাগ্য ও ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন উত্তরগুলি এইরকম—

রামনাথ ঃ আমি ভাগ্য বলে কিছু মানি না।

পুলিশ ঃ আপনি কোন ধর্ম মেনে চলেন?

রাম ঃ আমি যে ধর্ম মেনে চলি তাকে বলা হয় বৌদ্ধধর্ম।

পুলিশ ঃ আপনাদের ধর্মমতে ভগবানের স্বরূপ কি?

রাম ঃ যার কাছে যেমন।

পুলিশ ঃ তবুও বিশেষ কোন আইন নেই?

রাম ঃ না, বিশেষ কোন আইন নেই। যারা বলে ভগবান নেই, আমাদের ধর্মমতে তাদেরও সমাজে স্থান আছে।

পুলিশ ? আপনি ভগবান সম্বন্ধে কি মত পোষণ করেন?

রাম ঃ ভগবান সম্বন্ধে এখনও আমার কোন মত ঠিক হয় নি। তবে যারা সদা সর্বদা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, তাদের প্রতি আমার ভয়ানক ক্রোধ হয়। ধরুন, যদি একটা লোক আপনাকে অনর্থক ডাকে, তবে আপনি কি করবেন?

পুলিশ ঃ তার গালে দুটো চড় লাগাবো।

রাম ঃ আমারও তাই ধারণা। এসব বাজে ডাকাডাকির কোন মূল্য নাই। তবে এটাকে আমি একটা চাল বলতে পারি, গরিব ঠকাবার জন্য।

ধর্মধ্বজীদের একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। যখনই কেউ ধর্মের জ্ঞান দিতে আসত, সঙ্গে সঙ্গে নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে রূঢ় ভাষায় তার মুখোশ খুলে মাটিতে মিশিয়ে দিতেন। এজন্য চিনে কয়েকটি ধর্ম প্রচারক নবপশু তাঁকে হত্যার ফিকিরে ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা সেরে জাহাজে পাড়ি জমিয়েছেন, লক্ষ্য আমেরিকা। মাঝে নামা হবে অপরূপ মেডিরা দ্বীপে। কিন্তু তার আগেই আটলান্টিকের ভয়াবহরূপ দেখে যাত্রীরা শঙ্কিত। জাহাজে ছিল আফ্রিকায় নিগ্রোদের সর্বনাশকারী এক পাদরী। কাছে এসে রামনাথের কাঁধে হাত রেখে বললেন—"ভাববেন না, আমরা কয়েক দিনের মধ্যেই মেডিরায় নিরাপদে পৌঁছব। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করবেন।" ঈশ্বরের দূত হলে কি হবে, মানুষ চিনতে বড়ই ভুল হয়ে গিয়েছিল পাদরী ঠাকুরের। তৎক্ষণাৎ খেসারত দিতে হয়, 'বিশ্বাসের' অবিশ্বাস্য শেকল ভাঙার গান শুনে—"মহাশয়, দয়া করে ঈশ্বর এবং তাঁর পুত্রদের কথা আমাকে শুনাবেন না। আমার মঙ্গলামঙ্গল আমার হাতে। ঈশ্বর এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষগণ আমাকে কোন সাহায্য করতে পারবেন না। এসকল কথার উৎপত্তি হল ভয় হতে এবং এ সকল কথা শুধু ভয়েরই সৃষ্টি করে।.... কয়েকটি রজত মুদ্রার বিনিময়ে চোখে যে ঠুলি বেঁধেছেন তা অপসারণ করতে চেষ্টা করুন, দেখবেন বান্তু, কলার্ড, ম্যাস এবং হিন্দু এরাও মানুষ। এদের জন্যে পৃথক করে চার্চ তৈরি করতে হবে না।"

ভূপর্যটনে, বিশেষ করে ভারত ভ্রমণেব সময় অগুনতি আশ্রমের সংস্পর্শ সাধ্যমত এড়িয়ে গেলেও তথ্য অনুসন্ধানের তাগিদে অনেক জায়গায় ঢুকে পড়ে 'আঁতিপাতি' করে দেখেছেন। যার 'নিট' ফল—"অবতারবাদীদের আশ্রম আর সাপের গর্তে কোনও প্রভেদ নেই।"

পর্যটক

সুদীর্ঘকাল ধরেই বাঙালি মানসিকতা ছিল শান্ত ও নির্বিরোধ জীবনযাপনের পক্ষপাতি। দুর্গমপথে দুঃখ ও দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে জগৎ ও জীবনের ঠিক-ঠিকানা মোলাকাৎ করার দুঃসাহসিকতা ও সহনশীলতা বড় কম কথা নয়। তার উপরে তিনি যে সময় ভূপর্যটন করেছেন তখন বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি রীতিমত অস্থির। যাতায়াতের পথ ছিল অনেক দুর্গম। তাঁকে যে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তা আজকের পৃথিবীতে বসে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে, গৃহকাতর বা 'ঘরকুনো বাঙালি' এই অপবাদের মূর্ত প্রতীক রামনাথ। অজানাকে জানতে চাওয়ার ব্যাপকতর 'ক্যানভাস'-এর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অনন্য বাঙালি পথিকৃৎ। অমূল্য সেই পথ-দর্শন থেকে ভাবী পর্যটকের উদ্দেশে দান করে গেছেন কিছু চিরন্তন উক্তির সঞ্চয়। যা পাথেয় করে ভ্রমণকারী তাঁর লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যেতে পারেন, দৃঢ় পদক্ষেপে।

— "নাম জাহির কবলে পর্যটন হয় না। হয়—আরাম ও বিরাম"। "পর্যটক সব কথা শুনে যায় মাত্র, কিন্তু সকল বিষযে নিজের কোনও মতামত প্রকাশ করে না।" "উপন্যাস যেমন মানুষকে নেশাক্ত করে, পর্যটকও তেমনি মানুষকে মাতিয়ে তুলতে পারে।" "পর্যটকের কোন অস্ত্রশস্ত্রের দরকার হয় না। আত্ম নির্ভরতাই তার পরম অস্ত্র।" "তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া পর্যটকের পক্ষে কোনও মতেই বিধেও নয়।" "আমাদের দেশের পর্যটকদের বলে রাখছি, ভূপর্যটকদের এনডিওরেন্স হয় জ্ঞানার্জনে।" "পর্যটকের পক্ষে ভ্রমণ সময়ে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা অন্যায়।" "পর্যটকের কাছে রাজনীতি অর্থনীতি সবসময় সুখের বিষয় নয়। বরং পথের সংবাদই সবচেয়ে আনন্দের।" "যা দেখলাম মনে মনে আঁকতে হয় তার ছবি, আর সব জিনিসকেই দেখতে হয চোখ খুলে। তা মনের সুখেই হোক আর সন্তাপেই হোক। পৃথিবী ভ্রমণের উদ্দেশ্য মাইল গণনা নয়। অহঙ্কার পরিত্যাগ করে সবার সঙ্গে মিশতে হয়, কথা কইতে হয়। ব্যবধান মিটিয়ে আদান প্রদান করতে হলেই কিছুটা ছাড়তে হয় নিজস্ব দাবী।" "পর্যটক হল এক শ্রেণীর বেদে। সে শৃঙ্খলার বন্ধন সহ্য করতে পারে না।" "পর্যটক কোন সরকারের দ্রোহী হয় না। কিন্তু, সুযোগ পেলেই সত্য বলতেও ছাড়ে না।" "সাইকেলে যারা ভ্রমণ করতে চায় তারা যেন সাদাসিধেভাবে চলে। বহুরূপী সাজলে, বিপদ আপদ তো আছেই, উপরন্তু কিছু না জানারই সম্ভাবনা বেশি।" "যারা কষ্ট সহ্য করতে পারে না, তারা জগতে কিছুই করতে পারে না।" "দেশ দেখাই যার একমাত্র পেশা, তাব আবার হারিয়ে যাওয়া কি

করে সম্ভব হতে পারে''?

''পর্যটক ইতিহাস সমালোচনা করে না। যা দেখে, তাই সে লিপিবদ্ধ করে।'' ''মনের বিকাশ যদি করাতে হয়, তবে চলতে হয় একা। ইচ্ছামত স্থান ত্যাগ করা এবং ইচ্ছানুযায়ী সর্বত্র ভ্রমণ করাও যায়।'' ''পর্যটক যদি মিথ্যা বলে তাহলে সে পর্যটক হতে পারবে না। পর্যটকের পক্ষে লোভ এড়ানো সব চাইতে বড় উপাসনা''। ''পর্যটকের পক্ষে গুরুপাক বেশি খাওয়া ঠিক নয়।''

ব্রহ্মদেশে মারগুই শহর থেকে পোলাও গ্রামের দিকে চলেছেন। পাহাড় পথে একটা অদ্ভুত টুকরো পেয়ে তুলে নিলেন। দেখেন এক কিলোর (তখন এক সের) চেয়েও বেশি জিনিসটা হয় উইলফর্ম না হয় টিন। যা বাজারে বিক্রি করলে তখনকার দিনে পাওয়া যেত আশি-নব্বই টাকা। কয়েক মুহূর্ত ভেবেই পাশের নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কারণ, তাঁর ধারণা—''অর্থের প্রতি লোভ কর'লেই আর পর্যটন হয় না। লোভীরা কখনও ভ্রমণ করতে পারেন না।''

আরও এক ধাপ এগিয়ে সাবধান করেছেন—''যুবতীর হাসি পর্যটকের বিপদ টেনে আনে।'' বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না—''দুঃখের বিষয়, পর্যটকদের তুলনামূলক জ্ঞানচক্ষুর তাড়াতাড়ি উন্মেষ হয়। সেজন্য পর্যটক সকল সময় সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারেন না।''

ভদ্রলোক পর্যটক জীবনে 'হো-হো' করে যেমন হেসেছেন বহুবার, তেমনি অপরের মর্মান্তিক দুঃখে কেঁদেওছেন অসংখ্যবার। সেই জন্যেই অনায়াসে নিজেকে বিদ্ধ করে বলতে পারেন—''মানব সমাজের, সুখ-দুঃখকে নিজের করে ভাবতে পারে একমাত্র জ্ঞানহীন, অকর্মণ্য পর্যটকই''।

রামনাথের এগিয়ে চলা বড় অদ্ভুত। এক জায়গায় বেশ কদিন আছেন। অনেক বন্ধুবান্ধব, বাড়িওয়ালা বা বাড়িওয়ালীর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। হঠাৎ রাত্রে ঠিক করে ভোরবেলা কেরিয়ারে টুকিটাকি বেঁধে বেরিয়ে পড়লেন; কারুকে না জানিয়ে, সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে। কষ্ট হয়েছে অসীম। চোখ মুহূর্তের জন্যে জলে ভরে উঠেছে, প্রিয় মুখগুলির কথা মনে করে। তবু ''পৃথিবীকে দেখতে হবে'' এই কর্তব্যের ডাকে মনকে কঠিন করে বেরিয়ে যেতেন। কখনও কখনও বা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা থেকে দূরভাষে জানাচ্ছেন, ''হ্যালো—আমি বেরিয়ে পড়েছি। কেউ খোঁজ খবর করতে এলে জানাবেন অমুক দেশের দিকে চলেছি।''

একবার আমেরিকায় সাইকেলটা ট্রেনযোগে 'ডিট্রয়' পাঠিয়ে ভাবলেন 'হিচ-হাইক' এর স্বাদ নিই। শুরু করলেন হাঁটতে। কিন্তু গ্রামবাসীরা পর্যটককে সম্মান জানিয়ে সমবেতভাবে তাঁকে মোটর গাড়িতে তুলে 'ব্যাফেল' পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কিছুটা গিয়েই বিবেকের দংশনে 'হুশ্' করে নেমে পড়ে—''প্রত্যেক ধূলিকণা আমার ভ্রমণের সাক্ষী হয়ে থাক' চিন্তাধারায় হাঁটা শুরু করলেন 'হন্‌হন্' করে।

সাইকেলে তিপ্পান্ন, পায়ে হেঁটে সাত, রেলগাড়িতে দুই, এবং জাহাজে পঁচিশ হাজার, সব মিলিয়ে সাতাশি হাজার মাইল (১,৪০,০১২.৫৮ কিলোমিটার) সুদীর্ঘ

পরিক্রমায় ভদ্রলোকের এমনই ঘটনাবহুল ভ্রাম্যমাণ জীবন; শুধু সেগুলি একটার পর একটা মালা গেঁথে পুরোপুরি ভ্রমণকাহিনীর বই করা যায়; অনায়াসে। ঘাত-প্রতিঘাতের ঘনঘটায় এবং বিচিত্র রসের মিশ্রণে সেগুলি এমনই আকর্ষণীয় টানা-পোড়েনের, তা যে কোনও পর্যটককে উদ্‌বুদ্ধতায় জ্বালিয়ে দিতে পারে। আবার ঈর্ষা-হতাশার আগুনে ছারখার করে দিতেও পারে। অর্থাৎ, এদিকে আগুন ওদিকেও আগুন। মাঝে অগ্নিজয়ী ভূ-পর্যটক।

হিংসা নয়

শ্যাম দেশের রাজধানী ব্যাঙ্ককের অনতিদূরে। গরমে ঘেমে-জুমে নাকাল হয়ে ছায়া খুঁজতে গিয়ে দেখেন রাস্তা থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা ঝাঁকড়া গাছ। তার পিছনেই নিবিড় সবুজ বনানী। চোখ জুড়িয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সাইকেলটাকে পাশে রেখে, মোটা শিকড়ে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে সবে চোখ বুজেছেন, আয়েসে। এমন সময় অনেকগুলি মেয়েলি চিৎকার—"Run for your life, Mr. Foreigner. Run for your life!"

একে একে তেরটি রাইফেলধারী থাই তরুণী ঝোপের লতাগাছ সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এরা সব ব্রিটিশ বিরোধী এবং দেশের রাজভক্ত। চমকে গাছের ওপর চেয়ে দেখেন, বাপ্‌স্‌রে! গাছের ডালে-ডালে ল্যাজ জড়িয়ে ফণা উঁচিয়ে ফোঁস-ফোঁস করছে শয়ে-শয়ে বিষাক্ত সাপ! তার মধ্যে দুটো 'ধুপ' করে গায়ের কাছে মাটিতে পড়েই লাফ দিল হাত দশেক। শব্দ হল গুড়ুম-গুড়ুম-গুড়ুম। ভ্রামণিক মশাই ছিটকে গিয়ে চকিতে ছুট লাগালেন।

নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে ফিরে চেয়ে দেখেন গাছের গোড়া ধোঁয়া আর আগুনের ফুলকিতে ছেয়ে গেছে, তরুণীদের বিশেষ পাইরোটেক্‌নিক রিভলবারের কারসাজিতে। সাপগুলিকে না মেরে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর ব্যবস্থা। অহিংস কি না!

খাদ্য-অখাদ্য

'শ্যাম' সীমান্তে 'ওঙ্কারবট' অঞ্চলে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। মুহুর্মুহু বিষাক্ত সাপ পথরোধ করছে। সেগুলি এতই বিষাক্ত যে পথিমধ্যে দেখেন, একটা মানুষ সর্প দংশনে মরে ঢোল হয়ে পড়ে রয়েছে। আবার, সেই মাংস খেতে গিয়ে পরপর দুটি শিয়ালেরও 'চিৎমাৎ' পরিণতি।

রাজবিষের আগুন

ওই পথেই এগিয়ে চলেছেন আরও গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। এমন সময় একটি কালান্তক সাপকে দেখে স্থানীয় সঙ্গী পর্যন্ত (যদিও তাদের প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল) প্রাণভয়ে ছিটকে পালিয়ে আসে। কারণ সাপটির দুচোখে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিল। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেন, সবুজ পাতা সাপটির গায়ে পড়ার

সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধ পথপ্রদর্শক রাইফেল তাক করলে, সঙ্গী মানা করে, 'নাগরাজ' বলে।

বাহবা দেশ

শ্যাম দেশে 'হাইজাই' ছেড়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলেছেন। এক গ্রামে আতিথেয়তার বহর দেখে হতভম্ব হতে হয়। এদেশে অতিথি বলে কিছু নেই। সবাই আপন জনের মত। সেজন্যে, কেউ এসে খাবার প্রার্থনা করলে, তাকে পর মনে করে। ভাবে লোকটা তাদের কাছ হতে আলাদা থাকতে চায়। তাই সেরকম লোককে খেতে দেয় না, ঠাঁইও দেয় না। এ অঞ্চলের নিয়ম, যে খুশি অন্য আর এক বাড়িতে ঢুকে হেঁসেল থেকে হাঁড়ি নামিয়ে ভাত তরকারি যা পাবে খাবে। কেবল যাওয়ার সময় এঁটো বাসন ধুয়ে রাখতে হবে। কোন কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। বাড়ির মালিকও উচ্চবাচ্য করবে না। অভাব এদের নেই তো। রামঠাকুর এরকমই এক গৃহস্থের মুক্ত সদাব্রতের ভূরিভোজনে দিলখুশ মেজাজে ঘোষণা করলেন—"বাহবা সাম্যবাদীর দেশ"।

ধন্য মা

চিনের প্রথম গেরিলা বাহিনীর স্রষ্টা 'মসকুইটো মাদার' এর দলের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অক্লান্ত। সেই সূত্রে জেনে নিলেন যোগ্যতম নেত্রী মা-এর দুঃসাহসিক কাণ্ডকারখানা। একবার, পিকিং শহর ঘিরে শ্যেনদৃষ্টিতে মোতায়েন হয়েছে জাপানি সেনার ব্যূহ। যাতে শহর মধ্যেকার গুপ্ত গেরিলা বাহিনীর হাতে অস্ত্রশস্ত্র বা অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ রসদ পৌঁছতে না পারে। 'মসকুইটো মাদার' জিপসী বৃদ্ধার ছদ্মবেশে চূড়ান্ত অভিনয়ের মায়াজাল বিস্তার করে ধোঁকা দিলেন বাঘা বাঘা সেনা অধিপতিকে। ছাগল টানা গাড়ি করে দুধ ভর্তি বিরাট কেঁড়ের মধ্যে কেমন রোমহর্ষক অথচ অনায়াস পদ্ধতিতে গুলি সমেত রাইফেলের গোছা পৌঁছে দিলেন, গুপ্ত ঘাঁটিতে। তখন সমগ্র সেনাবাহিনীর কাছে তিনি ছিলেন ত্রাস!

'ভ্যালা' ঝামেলা

আফ্রিকার কিজাবী'তে পৌঁছে অতিথি হয়েছেন এক পাঞ্জাবীর গৃহে। পরদিন সকালে নিগ্রো 'সোমালি' যুবককে 'গাইড' হিসেবে নিয়ে ঘুরতে বের হলেন। ঘন্টা খানেক ঘোরার পর যখন খুবই ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত, তখন নিগ্রো যুবক একটি উষ্ণ প্রস্রবণে স্নানের নির্দেশ দিয়ে দূরে বসে গেল আপন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে। রামনাথের মনহারা অবস্থা! মেজাজে স্নান করছেন। কিছুক্ষণ পরে উঠতে গিয়ে লক্ষ্য হয়, এ কি! নিম্নাঙ্গ প্রায় তিনগুণ ফুলে জয়ঢাক অবস্থা! লজ্জা-সঙ্কোচের 'একশা' অবস্থা। গ্রামে ফিরবেন কী করে? আসলে জলটাই কেমন করে বিষাক্ত ছিল। বহুক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচির পর ফেরে আপনভোলা যুবকটি। বেহাল অবস্থা দেখে সে তো হেসেই খুন। বেঢপ্‌বাবু গেলেন ভীষণ রেগে। কিন্তু যতই বকা হয় ততই ছোকরার হাসি রোগ

বাড়তে থাকে। কী জ্বালা! শেষে, আর কি করা যায়, অনেক ভেবে পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে রোমান হিন্দিতে যা লিখে পাঠালেন, সেও ভারী মজার —' Hamara Bodan Suj-Giya, Jaldi Char-Pai Layey Char Admi Ana, Cholne Nehe Sekta, Ramnath''.

স্যরি !

চিনে চোদ্দটি বিশিষ্ট মঠ ছিল। যাদের অধ্যক্ষকে বলা হত জীবিত বুদ্ধ। তার মধ্যে দুটি বৃহত্তম। প্রথমটি তিব্বতের লাসায় অবস্থিত। সেখানকার অধ্যক্ষকে বলা হয় দলাই লামা। দ্বিতীয়টি ককোনরে। ককোনরের অধ্যক্ষকে আবার দলাই লামাও মাথা নত করতেন। জনগণের একান্ত বিশ্বাস, তিনি পাখির মত আকাশে বিচরণ করে যখন যেখানে খুশি পৌঁছে যেতে পারেন।

'কি করে সম্ভব'? রামনাথের ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে অধ্যক্ষ স্মিত হাসিতে জবাব দিলেন—'আসলে মন উড়ে যায়। মানুষ ভাবে দেহ যায়।' নিজের বোকামীতে পর্যটক নিজেই তখন লজ্জা পান।

ভবঘুরে ভ্রমণের সময় লক্ষ্য করেছেন, আমেরিকায় যাওয়ার পর ভারতীয়রা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে আটকে পড়ে। আরও নজরে আসে, যারাই এখানে এসেছে, তারাই সবরকমে আমেরিকান হওয়ার জন্য ধ্যান-জ্ঞান করছে। এরকমই এক নব পরিচিত বাঙালির গৃহে নিয়েছেন দুদিনের ঠিকানা। খাবারের বন্দোবস্ত হয়েছে নিরিবিলি ঘেরা জায়গায়। 'যস্মিন দেশে যদাচারঃ' নীতি অনুসরণ করে তাঁকেও অভ্যস্ত হতে হয়েছিল কাঁটা-চামচেয় খেতে। এটাই সে দেশের রীতি, এবং শিষ্টাচারের অন্তর্গত। কিন্তু ভেতো বাঙালির হয়তো বা তাতে মনে মনে হাঁফ ধরে গিয়েছিল। সেদিন একা একা খেতে বসে কি মনে করে খিড়কির পর্দা সরিয়ে লেগে পড়লেন হাঁফ ছাড়াতে। ঝপাঝপ ডালভাত মেখে ডান হাতে 'হাপুস-হুপুস' করে মহাতৃপ্তিতে খাচ্ছেন, অনেক দিন পরে। মুশকিল হচ্ছে, খিড়কির পর্দা সরালেই রাস্তার ওপারের বারান্দা থেকে এঘরের সব কিছু দেখে নেওয়া যায়। তাই একটু যা তাড়া। কিন্তু হলে কি হবে, বাগড়া-গেরো ধেয়ে এলো তৃপ্তির ইচ্ছেকে খান খান করতে। আকস্মিক পাশের ঘর থেকে একজন এসে পড়ে কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে হতভম্ব। তাড়াতাড়ি পর্দা নামিয়ে রক্তচক্ষুতে বললেন, ''আমরা ভাবতাম আপনি অনেকগুলি দেশ দেখে একটু সভ্য হয়েছেন, কিন্তু এখন দেখছি আপনার কিছুই পরিবর্তন হয়নি।'

হাতমুখ ধুয়ে পাশের ঘরে পৌঁছে দেখেন সে ঘরের আর সকলেই মাথা নত করে আছে। তাদের মধ্যে একজন, এমন অসভ্যতার ফল যে এখানে 'উত্তম-মধ্যম' পর্যন্ত গড়াতে পারে শোনালে, রামনাথ কুণ্ঠিত চিত্তে ভুল স্বীকার করে নিলেন।

সাংবাদিকের কলমে

তেহরাণের সংবাদপত্র অফিসে গেছেন। তাঁরা কট্টর সোভিয়েত বিরোধী বলে ঘুরে

ফিরে রামনাথের মুখ থেকে বিরূপ কথা শুনতে চান সোভিয়েত রুশ সম্বন্ধে। 'সাইক্লিস্ট' বারবারই উত্তর দেন, "পাশপোর্ট থাকলেও রুশিয়াতে যাইনি, যাবার ইচ্ছাও নাই। কারণ, ইরানে মাইলপোস্ট না থাকলেও ছোট ছোট গ্রাম মেলে। রুশ বিরাট দেশ। বাইসাইকেলের পথ আছে কি নাই কে জানে?" ব্যস! পরদিন কাগজে রামনাথের নামে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ভয়ানক প্রবন্ধ বের হল—"তিনি রাশিয়ায় গিয়ে দেখে এসেছেন বাইসাইকেলের পথ পর্যন্ত নাই, এমনই বাজে দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি।" সাংবাদিকের অসীম ক্ষমতার 'ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ' হয়ে ভুলেও ওদেশের সংবাদপত্র অফিসে আর পা বাড়াননি।

মালয়েশিয়ার ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর মালাক্কায় পৌঁছতেই 'মলয় ট্রিবিউন' এর এক রিপোর্টার এসে চেপে ধরলেন। একের পর এক প্রশ্নের দমকা ধাক্কায় 'বাপস্‌রে' অবস্থা করে ছেড়েছেন যেন। যাযাবর অবিচল চিত্তে সেদিন জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন, অত্যন্ত সাজিয়ে গুছিয়ে। তিনি রিপোর্টারের মুখে গভর্নমেন্টের দেওয়া সংখ্যা হিসাব মিথ্যা প্রমাণ করে বলেছিলেন, 'এদেশে মরণমুখী মলয়বাসী ক্রমশ লয় পাচ্ছে এবং মরণজয়ী চীনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার স্বীকার করে না; কারণ, চীনারা যদি মেজরিটির দাবি করে।' এ জবাব আদৌ মনঃপূত না হওয়ায় সাংবাদিক ধাঁ করে উঠে বিদায় নিলেন। পরের সকালে লজিং হাউসে বসে খবরের কাগজ খুলতেই দেখেন বড় বড় হেডলাইনে লেখা আছে—

বাঘের মুখে পর্যটক

পৃথিবী পর্যটক মলয়বাসী মিঃ বিশ্বাস মুয়ের শহর ত্যাগ করে মালাক্কা যাত্রার সময় পথিমধ্যে বাঘের কবলে পড়েন। তবে তিনি সাহসী। ঘাবড়ে না গিয়ে উচ্চ চিৎকারে বাঘকে প্রতিরোধ করতে রুখে দাঁড়ান, সাইকেলখানা উঁচিয়ে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। এই সময় পথচারী কয়েকজন দেখতে পেয়ে অগ্রসর হয়। বাঘ পালিয়ে যায়।

—*মলয় ট্রিবিউন*

রামনাথ 'হো-হো':করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললেন—'গতকাল আমার উত্তরে রিপোর্টার মশাই ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় হয়েছিলেন। তখন বুঝি নাই যে, তিনি তাঁর মগজের সংবাদ-তৈরির কলটি সিনেমা-কলের মতো পুরোদমে চালিয়ে লজিং-হাউস হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন। এখন দেখছি তিনি শুধু রিপোর্টার নন, সংবাদের জন্মদাতাও। এমন আবিষ্কার-প্রতিভা তিনি যদি পর্তুগিজ বোম্বেটেদের পূর্ব ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে লাগাতেন, তবে দেশ জোড়া নাম হতো আর মালাক্কারও পৃথিবীর চোখে বিশেষত্ব বাড়তো।'

জুজু'র দাপটে

হংকং-এর ছোট রাস্তায় রক্তাক্ত যুবতী পড়ে আছে। দূরে দাঁড়িয়ে লোক দেখছে। কিন্তু কাছে আসছে না। সংবাদ নিয়ে জানলেন, পাছে ঘাড়ে ভূত চাপে বা 'সুইয়া'

অর্থাৎ দুর্ভাগ্য তাদের পেয়ে বসে এই ভয়ে চিনারা নাকি মৃত বা মৃতপ্রায় দেহ'র বিশেষ আত্মীয় না হলে সহজে কাছে ঘেঁসত না। বিশ্বাস মশাই-এর ধ্যান-জ্ঞান 'গুড়ুম' অবস্থা। তারই মাঝে লাস নিয়ে গেল পুলিশ।

অনেক মানুষেরই একটা সাধারণ স্বভাব—অপরকে নিরুৎসাহ করা বা দুঃসাহসিক ব্যাপার-স্যাপার হজম করতে না পারা। সুবিশাল মহা চিন ভ্রমণ করছেন শুনে কেবল হতাশার বাণী শুনিয়েছে সবাই। কেউ বা ভুতুড়ে ভয়। 'বেঁচে আর ফিরতে হবে না বাছাধনকে' এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে, শঙ্কিতচিত্তে অন্তিম সাহায্য ও শেষ খাওয়া খাইয়ে বিদায় জানিয়েছে অনেকে। আঘাতে ভেঙে না পড়ে, উল্টোখাতে বেয়ে চলা বীরের দুঃসাহসিক মন ততই উল্লসিত এবং উৎসাহিত হয়, এগিয়ে চলায়।

জাপান মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করে বলে, চিনারা জাপানীদের ঘৃণা করে ও পাশ কাটিয়ে চলে। এদিকে রামনাথের পোশাক, হাবভাবও দেখতে কিছুটা জাপানী মত হওয়ায় চিনারা তাঁকে এড়িয়ে চলতে থাকে। কথা তো শুনবেই না, সাহায্যও করবে না। তারা ভেবে নিয়েছে 'এ বেটা জাঁপ্পুন কুই'। অর্থাৎ জাপানী ভুত। দুশ্চিন্তা চেপে ধরে—এরপর আড়ং ধোলাই লাগাবে না তো! বিপদ এড়াতে, তাড়াতাড়ি "হিন্দু ইয়াংসি সাইকাই" (হিন্দু ভূপর্যটক) 'ব্যাজ' বুকে এঁটে নিলেন। আশ্চর্য! মানুষ গুলোর ব্যবহারও সঙ্গে সঙ্গে উল্টে গেল।

হাতি যখন দ'য়ে পড়ে

সেবার চিন দেশে, 'হেঞ্চফোঁ' থেকে চাংসার দিকে চলেছেন; পাহাড়ী পথে। হঠাৎ কজন দুর্বৃত্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত পা বেঁধে সব কেড়ে নিয়ে এক পোড়ো কুঠুরীতে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেল। ওদিকে, নবাগতের গন্ধ পেয়ে সেই বদ্ধ ঘরের বাসিন্দা ইঁদুর. চামচিকে ও আরশোলারা একযোগে অভিযান শুরু করল। অনেক চেষ্টায় পায়ের কসরতে ইঁদুর চামচিকে তাড়াতে সক্ষম হলেও আরশোলাকে আর 'সাইজ' করা যায় না। শত চেষ্টাতেও তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। ঘাড় নেড়ে, শরীর দুলিয়ে কিম্বা পা নাচিয়েও যখন সব চেষ্টা ব্যর্থ হল, তখন হাড়ে হাড়ে টের পেলেন, চিনেদের আরশোলা ভোজনের বদনাম কতো সার্থক। শেষ চেষ্টায় মরিয়া হয়ে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় 'হুপ্'দের মতো লাফালাফি দাপাদাপি শুরু করলেন। এবং এভাবেই ছিটকে পড়লেন আর একটা অন্ধকার ঘরে।

উন্নতির সিঁড়ি

চিনে হাঙ্কোর পথে দ্বিতীয় শ্রেণীতে সুযোগ পেলেও চড়েছেন তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়িতে, সাধারণের অংশীদার হতে। উঠে তাক্ লাগে, গিজ্ গিজ্ করা চেকাবের সংখ্যায়। তবে কি বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীর সংখ্যা অনেক? অবাক চোখে দেখেন, আদৌ তা নয়। টিকিট চেক করে প্রত্যেকে একখানা ঝাড়ু দিয়ে কামরা পরিষ্কার করেই ক্ষান্ত থাকে নি। যাত্রীদের অপরিষ্কার দাঁত নোংরা হাত পা ও ময়লা

জামাকাপড়ের জন্যে শুরু কবেছে বকাঝকা এবং তদারকি।

আঁধারে আলো

চিন দেশে ভূত প্রেত ইত্যাদি সংস্কার ছাড়াও অনেক কুপ্রথা দেখেছেন। মায়েরা সাধারণত ছেলে শাসনে প্রচণ্ড বোখা। চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়। এক মা তার ছেলেকে কোমর থেকে হাটু পর্যন্ত কঞ্চি দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করেও ছাড়ছে না। শিশু দরদী আর থাকতে পারলেন না। পেল্লাই রকমেব দাবড়ি লাগালেন বাচ্চার মাকে। তাতে মহিলা ঘুবে এমনভাবে তাকান, যেন চোখ দিয়ে আগুন বেব হচ্ছে। মন্দিবে গিয়ে নজরে আসে দেবার্চনায় মেয়েদের পিটিয়ে কাঁদতে বাধ্য করা হচ্ছে। দেখেছেন, সর্বস্বহারা 'চাপাই' বাসী বুভুক্ষুর দল কাতাবে কাতারে হাহাকার তুলছে। আব তারই পাশে সাংহাই-এর বুকে ক্যাবারেতে চিনা ধনিক শ্রেণীর দুলাল-দুলালীরা নাচা গানা-খানা-পিনায় মত্ত।

আবার দেখা গেছে, এই চিনেরই সংস্কাব সাধনে ব্রতী যুবক-যুবতীবা কেমন অক্লেশে অতিথির উপকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। রিক্ত ও অভুক্ত ভবঘুরেকে সাহায্যেব জন্যে যেভাবে তিন যুবতী অবলীলায তাদের লজ্জা সরিয়ে শহরের সবচাইতে বড দোকানেব ম্যানেজাবকে কব্জা কবে ১২৫ ডলার ফাঁকা হাতে তুলে দিল, তাতে বামনাথ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। সঙ্কুচিত হৃদয়ে মাথা নত কবে ভাবেন, 'নাবীব ভূষণ লজ্জা, সেটাও ত্যাগব্রতেব জোযারে, কোথায় ভেসে যায়।'

অন্য দেশে, দু'বছব আগে ছেলে মাবা গেছে, পাঁচ বছব আগে স্ত্রী বিয়োগ হযেছে, এই সমস্ত অজুহাতে ভিক্ষার্থীকে দ্বার হতে ফিবতে হযেছে। কিন্তু চিন দেশে মানুষজন তাদেব অতি দুঃসময়েও অতিথিকে বিফল মনোবথ করেনি। তাই তো সে দেশ তাঁর কাছে দারুণ প্রিয।

কি আজব !

আমাদের যেমন না দেখলে বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয —মাত্র সরু দুখানা কাঠি (চপস্টিক) দিয়ে চিনারা কেমন করে ভাত খায়! এমন কি, দেখ'লেও কিছু কম আশ্চর্যের মনে হয় না। ওদেশেও তেমনি, কথা শোনা মাত্র হাজিব হয়েছে ভাতের পাত্র। রামনাথ যখন মেজাজে হাতের সাহায্যে খেযে দেখিযে দেন, তখন সেই অনায়াস ডানহাতি খাওযা দেখে তাদের মধ্যে পড়ে আজব হাসির ধূম। বলে—"কি তাজ্জব ব্যাপার বে ভাই, মিস্টার লিম্‌নাথ পারেও বটে"।

একটা বেঁটে খাটো অতি সাধারণ দর্শনের মানুষ বিনা মূলধনে হাতে একটা সাইকেল নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ও শুধুমাত্র হিমালয়-প্রমাণ মনের জোব-সাহসে ভব কবে দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছেন; এ দেখে পৃথিবীর নানা প্রান্তের বহু মানুষের সন্দিগ্ধ চোখ কপালে ওঠে। জেবায় জেরায় জেরবার করার পর ঢোক গিলে সত্যটা হজম করতে হয়েছে কোনওবকমে, শেযকালে।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জুন মাস। পর্যটন শেষে সবেমাত্র কলকাতায় এসেছেন। 'ভূপর্যটক' আখ্যা পেলে কি হবে; ওদিকে 'ভাঁড়ে মা ভবানী' অবস্থা। সামাজিক প্রতিষ্ঠা তখনো 'দিল্লী দূর অস্ত'। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভেরী বেজে উঠেছে দিক-দিগন্তে। মানুষ তার ভাবী কু-সম্ভাবনায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সে সময় রামনাথও তার ব্যতিক্রম কিছু নন। বাসস্থানের ব্যবস্থা কোনও রকমে হয়ে উঠলেও পেট তো রোজ শুনবে না। একদিন শিয়ালদার পাইকারী বাজার থেকে কিছু ভাল আম সওদা করে ফেরি বিক্রির জন্য বেরিয়েছেন। মৌলালীর কাছে কয়েকজন বিহারী ফেরিওয়ালা ঘেরাও করে নবাগতকে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে থাকে। দুমকা জেলার এক বৃদ্ধ ফেরিওলা তো তাঁর চোখা বাক্যে রুষ্ট হয়ে ভুল করে প্রায় মেরেই দিতে বসেছিল। এমন সময় এক পথচারী চিনতে পেরে এগিয়ে এসে সামাল দেন। তিনি যখন বাউণ্ডুলের পরিচয় দিতে থাকেন; তখন কারুর চোখ ট্যারা, কেউবা শ্রদ্ধায় হতবাক হয়ে যায়। ব্যতিক্রম থাকে একজন। সেই মারমুখী বৃদ্ধ। পথচারীর সংক্ষিপ্ত অথচ বলিষ্ঠ পরিচয় বর্ণনার প্রচণ্ড ধাক্কায় প্রথমে চোখ কপালে ওঠে। রক্তচাপের চোটে শেষে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে পড়ে ফুটপাতে। ক'জনার চেষ্টায় জ্ঞান ফিরলে দেখা গেল বৃদ্ধর একেবারে কাপড়ে-চোপড়ে অবস্থা। তখনও অস্ফুট স্বরে বিড় বিড় করছে— 'বঢ়ী আজীব হৈ বা'। রামনাথ চাপা বিরক্তিতে ফিরলেন, এই বলে—'ত্যাৎতোরি, ব্যাটাচ্ছেলে কিম্ভূত কুথাকার।'

আফ্রিকার উপহার

আফ্রিকাব বনে জঙ্গলে এক ধরনের বিষাক্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকা আছে। নাম ডু-ডু পোকা (Giggers)। সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টির ফাঁক দিয়ে হাত পায়ের নখের মধ্যে ঢুকে পড়ে। যা কোনও ডাক্তার নয়, আলপিনের চেয়ে সরু ধাতব পদার্থ দিয়ে একমাত্র নিগ্রোরাই বার করতে পারে। দংশন জ্বালা ক্রমেই বাড়তে থাকে, একবার যদি শরীরে বাসা বাঁধে। হয় অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করে বাঁচাতে হবে, নচেৎ মৃত্যু অবধারিত। রামনাথের ক্ষেত্রে ডু-ডু পোকা বের করে ক্ষত সারাতে হয়েছে বারবার। ফলে বেঁটেখাটো মানুষটির পরবর্তী জীবনে দেখা গেছে, হাত ও পায়ের কুড়িটি আঙুলের ডগা বিশ্রি রকমের ক্ষয়ে যাওয়া।

প্রকৃতির অন্দরমহলে

আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঢুকে পড়েছেন। প্রকৃতির স্বভাবজ রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ তাঁর বেপরোয়া মনকে করেছে আরও সংহত, গভীর ও সংবেদনশীল। দুচোখ মেলে দেখেছেন, সাইকেলের সামনে অনেক নিগ্রো দিগম্বরী এসে থমকে দাঁড়িয়ে আবার ছুটে পালিয়েছে, তাদের অন্তরতম সরলতা নিয়েই। ন্যাসাল্যান্ডের (উত্তর আফ্রিকা) মায়া (Myah) তে পৌঁছে ন্যাসাদের মধ্যে অভূতপূর্ব স্ত্রীস্বাধীনতা লক্ষ্য করেন। অথচ সেই বিবসনাদের কোনও বিদেশী যদি বক্র দৃষ্টিতে চায়, তাহলে তার চোখ তো যাবেই,

ঘাড়ের সঙ্গে মাথাও আর না থাকাই স্বাভাবিক।

পায়ের তলার মাত্র চার ফুট নিচে থাকা সোনার 'ওর' বস্তাবন্দী হচ্ছে দেখে আশ্চর্য চোখে 'চুনিয়া' খনি থেকে সাইকেল চালু করলেন। অবাক হওয়ার আরও বাকী ছিল। ৫০ মাইল পশ্চিমের এক গ্রামে পৌঁছে দেখেন আজব ব্যাপার! ইতিমধ্যে উলঙ্গ স্ত্রী পুরুষ অনেক দেখেছেন। কিন্তু এখানে অন্য রকম। পুরুষরা সকলেই ইউরোপীয় পোশাকে মোড়া, আর মেয়েবা সম্পূর্ণ 'নাঙ্গা'। অথচ চোখে তাদের সলজ্জ ভাব।

সিদ্ধিদাতার মূল্যবৃদ্ধি

চুনিয়া স্বর্ণখনি অঞ্চলে অদ্ভুত আবদারে ঘেরাও হন। চেলারাম নামে এক ভারতীয় সিন্ধী ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঠাঁই মিললে কি হবে, পর্যটকের সাথে চাকরেরও অধম ব্যবহার শুরু হয়। প্রথমে অতিষ্ঠ করে মারলেও ঘটনাক্রমে চেলার ব্যবহারে পরিবর্তন হতে হতে রাজ খাতিরে পরিণতি পায়। কারণ আর কিছুই নয়। রামনাথ আসার পর তার দোকানে নাকি অভাবিত বিক্রি বেড়ে গেছে। এ তথ্য রটে যাওয়ায় স্থানীয় মানুষদের মধ্যে সে এক নিদারুণ কাড়াকাড়ির প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তাঁকে নিয়ে। অকস্মাৎ নিজের এমনিতরো মূল্যবৃদ্ধিতে রামনাথ পড়েন মহা ফাঁপরে!

পিতা স্বর্গ....

সে সময় ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে চমকে যাওয়ার মত একটি তথ্য আবিষ্কার করেন। জাপানে যারা দারিদ্র্যসীমার নিচের দিকে বাস করে, তারা অনেকে তাদের মেয়েদের গ্রীণ হাউসে (বারবনিতায়) বিক্রি করে সাময়িকভাবে। এক থেকে তিন বৎসর পর্যন্ত চুক্তি থাকে। শরীরের চটক অনুযায়ী দর ওঠে এক হাজার থেকে তিন হাজার ইয়েন পর্যন্ত। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে পর সাধারণত পিত্রালয়ে ফিরে ওষুধ-বিষুধ খেয়ে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে নিয়ে থাকে। পিতা তখন কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়— "আমার কন্যা আমাকে সুখী করবার জন্য তিন বৎসর বারবনিতালয়ে কাটিয়ে এসেছে। তার শরীরে কোন রোগ নাই। যদি কোনও যুবক এই পিতৃভক্ত কন্যাকে বিয়ে করতে চান তবে সত্বর আসুন। বিলম্বে হতাশ হবেন।" এই যুবতীকে বিয়ে করার জন্যে অনেক দরখাস্ত আসে এবং সাতদিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। আগ্রহী যুবকদের ধারণা জন্মায়, যে যুবতী তার পিতাকে সুখী করবার জন্য এমন কষ্ট স্বীকার করে নিতে পিছপা হয় না, সে তার স্বামীর জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারবে।

শিক্ষিত বটে

একদিন সানফ্রান্সিসকোয় মার্কেট স্ট্রিটে গেছেন খবরের কাগজ কিনতে। গিয়ে দেখেন দোকানের সামনে ভিড়ে ভিড়াক্কার। অবাক কাণ্ড! দোকানদার মানুষ নয়, বিশাল আকৃতির কুকুর! দরজা আগলে শুয়ে পিট্ পিট্ করে সব কিছু নজর রাখছে। পাঁচ সেন্ট কাগজের মূল্য নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে একটি সংবাদপত্র উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

ক্রেতা। রামনাথের 'ট্যাবলেট' বুদ্ধি দুষ্টুমী করাব জন্য সুড় সুড় করে উঠল, পরীক্ষা করতে। এমন সময হাঁ হয়ে দেখলেন, ঐ একই বুদ্ধির ধারক-বাহক আর এক ছোকরা চার সেন্ট রেখে কাগজ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই কুকুরটি একলাফে 'ঘাঁক' করে পা-খানি চেপে ধরল। 'ডেঁপো' মানসিকভাবে তৈরি হয়েই এসেছিল। দ্বিরুক্তি না করে পকেটে হাত বাড়াল। পুরো হিসেব চুকিয়ে দিতে তবেই মেলে রেহাই। এদিকে পৃথিবী চষা ডাকাবুকো হলে কী হবে, জীবটির সর্বনাশা হাঁ-এর বিশালত্ব দেখে এবং পরীক্ষা পদ্ধতি আদৌ সুবিধের হবে না বুঝে, তাড়াতাড়ি পাঁচ সেন্ট রেখে পা বাড়ালেন—মনে মনে ছেলেটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে।

চুপ রহো, দারোগা হ্যায় !

ভারত ভ্রমণের সময কাশীতে এক জৈন ধর্মশালাতে যাওয়া মাত্র দারোয়ান খাতির করে 'আইয়ে বাবুজী, আরাম কিজীয়ে' বলে চারপাই দেখিয়ে দিলে, রামনাথ ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলেন। কয়েক মিনিট মাত্র। অগুন্তি ছারপোকার দল তেজী রক্তের গন্ধ পেয়ে 'কটাকট্' কামড় বসিয়ে দিয়েছে। বিশ্বাসবাবুও ঝটিতি লাফ দিয়ে উঠে অবিশ্বাস্য গতিতে মারতে আরম্ভ করলেন পটাপট্। তা দেখে সেই দারোয়ান এমন ভয়ানক চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিল যেন তার ছেলে মরেছে, নযতো স্ত্রী বা মা গঙ্গায় ডুবে মরেছে। মনটা তখন খুব ভাল থাকায় বামনাথ খুব ধীর-মোলায়েম গলায প্রশ্ন রাখলেন—"এই যে চারপাইগুলি রয়েছে, তার কি প্রত্যেকটাই ছারপোকায় ভর্তি?'

দারোয়ান ক্ষেপা গলায় আঘাত হানল—"তুম খুব ধীরে বাত করতা হ্যায়। বাকি তুম শালে বহুত বদমাস। তু জীব হত্যা কিয়া।"

এতটা অসহ্য লাগায় সপাটে চড় কষিয়ে চারপাইটা আগুন ধরিয়ে দিলেন। আশে-পাশের কেউ দারোয়ানকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি। কারণ তাঁর পোশাক দেখে সকলেই দারোগা ঠাউরেছিল। মেজাজে বের হবার সময় আপন মনে বলে উঠলেন—"খাঁকী প্যান্ট-শার্ট জিন্দাবাদ"।

আর কটা দিন কাটিয়ে দে মা

ভারতভ্রমণের সময় বিহার রাজ্যটা একেবারে চষে ফেলেছেন। এরকমই ঘুরতে ঘুরতে, ধানবাদ ছেড়ে গঙ্গাতীর বরাবর যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। আমগাছের নিচে খাটিয়ায় শুয়ে আছে ৮০ ছুঁই ছুঁই শীর্ণকায়, কোটরে চোখ, ফোকলা বৃদ্ধ। গঙ্গাযাত্রায় এসেছেন, কয়েক শ' লোকের সঙ্গে। পুণ্যাত্মাকে দেখতে আসছে হাজারে হাজারে মানুষ। সকলের সামনে খইনি ডলে মুখে দিচ্ছেন। খাচ্ছেন পায়েসান্ন ও অন্যান্য ভালো ভালো খাবার। সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রকৃতির মৃদুমন্দ সমীরণ। দেখতে দেখতে মাসাধিককাল পার হল। ঘটনাক্রমে গতি হওয়ার বদলে টিকে গেলেন বহাল তবিয়তে। ইচ্ছে এখন ঘরে ফেরার। কিন্তু লোকভয়ে ও শাসানির হম্বিতম্বিতে চুপ মেরে গেলেন। ওদিকে স্বেচ্ছাসেবী আত্মীয়-স্বজন-প্রতিবেশীদেরও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে।

গঙ্গাযাত্রী একদিন স্বকর্ণে ফিসফিসানির আলোচনা শুনলেন—"আজ রাতেই যদি বুড়োকে গঙ্গাজলে চুবিয়ে ধরা হয়, তবে তো ঠিক-ঠাকই গঙ্গাযাত্রা হবে।"

মনে মনে—"হওয়াচ্ছি, হারামি কঁহিকে' বলে, প্রাকৃতিক কাজ সারার নামে দে ছুট জঙ্গলে। সেখান থেকে সরাসরি থানায় গিয়ে অফিসারকে বলে, "সাব ডায়রী লিজিয়ে। হামারা লাশ গায়েব করনে মাঙতা।"

'এস আই' তো কাণ্ড শুনেই তার পুলিশী গুদামের সমস্ত অশ্রাব্য ভাষা বুড়োর ওপর উজাড় করে দিল। কি আর করা যায়? মনের দুঃখে দাদু আত্মগোপন রূপ মহাপ্রস্থানের পথ নিলেন। ডায়রী আর লেখানো গেল না। অপরদিকে, সঙ্গে যাওয়া শেষকৃত্যের লোকজনেরা নাচার হয়ে গ্রামে এসে রটিয়ে দিল 'বুড়ো মারা গেছে।' বাস্তবে কিন্তু আরো কয়েক মাস পরে বৃদ্ধর মৃত্যু সহজ-সুন্দর সজ্ঞানে হয়েছিল। যা নাকি পুণ্যাত্মাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

মুখশুদ্ধি-আত্মশুদ্ধি

রামনাথের এক সম্পর্কিত কাকা জানকীনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার। 'ভিজিট' না নিয়ে বিনামূল্যে রোগীকে ওষুধ দিতেন। পরে 'শঙ্করানন্দ' সন্ন্যাস নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন, নানা জনহিতকর কাজে। তারও বহু বছর পরে, বিহার পরিক্রমায় হঠাৎ আবিষ্কার করেন, সেই কাকা বা শঙ্করানন্দ পরেশনাথ পাহাড়ের নীচে ডেরা বেঁধেছেন, ঐরকম কয়েকজন মৃত্যুপথ-অনুসরণকারী গঙ্গাযাত্রীকে রক্ষা করে এবং বাঁচিয়ে তুলে। সংবাদ সূত্রে ভাইপোর পিলে চমকে যায়। অবগত হন, অমন নিষ্ঠাবান ত্যাগী কাকা আগেকার সব কিছু ছেড়ে এখানে শুধুমাত্র ক'জনকে নিযে তোফা আরামে খাওয়া-দাওয়া করে মৌজসে বেঁচে থাকায় ব্রতী হয়েছেন। এবং নীতি নিয়েছেন, যতদিন বাঁচবেন, ধর্ম অন্তত কিছুতেই নয়।

সভ্যতার রকমফের

দক্ষিণ রোডেশিয়ার দক্ষিণ দিকে সভ্যতার আলো না পাওয়া গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে পরিব্রাজক দেখেছেন সেখানে উলঙ্গ মেয়েরা অনায়াসে ঘুরছে ফিরছে। এদের মূল খাদ্য পশুর মাংস হলেও এরা কোন জীব হত্যা দেখতে প্রস্তুত নয়। সে কাজটি ওদেশে সারা হয় আড়ালে এবং মূলত পুরুষ দ্বারা। অথচ ভূপর্যটক বিস্ময়-ব্যথিত চিত্তে লক্ষ্য করেছেন, "কালীঘাটে আমাদের মেয়েরা অবলীলায় পশুহত্যা শুধু দেখছে নয়, পশু হত্যার বদলে নিজ সন্তানের মঙ্গল কামনা করছে।"

অতিথি সৎকার

দক্ষিণ আফ্রিকায় পিটারস্বার্গ ছাড়িয়ে ঢুকে পড়েছেন ভয়ঙ্কর গভীর জঙ্গলে। এও বুঝি দেখার ছিল! সামনেই গাছের ডালে ডালে একদল বামনাকৃতি নিগ্রো। বনমানুষের মতোই অনাবৃত। ক্রমবিবর্তন যাদের পশুত্ব থেকে বেশি এগিয়ে দিতে

পারেনি। অস্ত্র গাছের ডালপালা। খাদ্য বনের ফল-মূল। এছাড়া জানে চকমকি পাথরের ব্যবহার। যার সাহায্যে ছোটো-খাটো জন্তু-জানোয়ার ধরে পুড়িয়ে খায়। পিটপিট করা চোখে গলাগলি ধরে বিচিত্র ভাষায় হাসিঠাট্টা করছে একে অপরের সাথে। নজরে পড়ে, দিনরাত গাছে ও পাথরে বসে পাছা মর্কটদের মতোই কড়া পড়া। ঘুরে ঘুরে নবাগত যখন খুবই ক্ষুধার্ত, এমন সময় হঠাৎ ওপরের গাছ থেকে একটা ন্যাংটো বামন ডাল ঝাঁকিয়ে পায়ের কাছে ফেলে দিল বেশ কয়েকটা টুশটুশে পাকা মিষ্টি ফল। রামনাথ সঙ্গীদের বললেন—"যাচ্চলে, এ যে দেখছি না চাইতেই এক কাঁদি"। মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাড়াতাড়ি সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, সেগুলি 'পেটস্থ' করতে।

পশু নয় শিশু

শ্যাম দেশের জঙ্গলে দুপুরে একদিন পরিশ্রান্ত হয়ে গাছের তলে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এমন সময় একটা বড় গোছের বাঁদর ধীরে ধীরে এসে একটু দূর থেকে প্রথমে লক্ষ্য করল, লোকটা অনিষ্টকর কি না। তারপর নির্ভয়ে কাছে এসে পর্যটকের মাথা থেকে বেছে বেছে কি খেতে লাগল। শুধু তাই নয়, সারা শরীর খুঁটে খুঁটে আরামদায়ক 'ম্যাসাজ' করে দিতে থাকে। শরীরের ব্যথা-বেদনা আশু উপসম হওয়ায়, চলার গতি যায় বেড়ে। রামনাথের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য—"যারা ভালবাসতে জানে এই জগতে তাদের শত্রু থাকতে পারে না।"

আফ্রিকার লিমবী হতে পোর্ট হেরল্ড-এর পথে চলেছেন সাইকেলে চড়ে। চারপাশে উজ্জ্বল সবুজ ঘাসের মধ্য হতে মাটির সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। চলমান অবস্থায় মাঝে মাঝে বুক ভরে ঘ্রাণ নিচ্ছেন মুসাফির। তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে মন- প্রাণ। মনের পর্দায় ভেসে আসে রূপসী বাঙলার চিত্র কথা। হঠাৎ দেখেন, একটি সিংহ শাবক সামনেই দাঁড়িয়ে একনজর ভালোভাবে তাঁকে দেখে নিয়ে যেন কি ভাবল। এবং পরক্ষণে যেন খানিকটা উপহাস ছলেই মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। দারুণ মজা তো! মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন। কিন্তু ঘোর কাটতে না কাটতেই চোখ কপালে! আকস্মিক বনের মধ্যে থেকে বাচ্চাটির মা-বাবা, ভাই-বোনেরা দল বেঁধে বেরিয়ে এল। আবার থাকে? রামবাবু পড়ি মরি করে দমসে প্যাডেল ঘোরাচ্ছেন আর দরদর করে ঘামতে ঘামতে ভাবছেন, একবার যদি ফ্যামিলি আক্রমণের কবলে পড়েন, তাহলে শকুনিদেব মাঝে মরা গরুর মতো অবস্থা হবে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত কিছু ঘটল না সে যাত্রা। সম্ভবতঃ বাচ্চাটিই পরিবারের সকলের কাছে আবদার ধরেছিল—'মাম্‌মা-পাপ্‌পা, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বলছি। দেখছ না, ওটা আমারই মত কেমন আলাভোলা কাচ্চা খোকা।' এবং সকলে নিশ্চয়ই নীরব সমর্থন জানিয়েছিল, হাঁ হয়ে থেকে।

বাপস্‌রে কি তেজ!

তবে একথা ঠিক, স্থায়ী শত্রু না থাকলেও, হঠাৎ হঠাৎ সাময়িক শত্রু তাঁকে

কেবলই বাধা দিয়ে কুরে কুরে খাওয়ার চেষ্টা করে ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ত। এমনকি মাঝে মাঝে প্রচণ্ড রকমের বিচলিতও করেছে। কিন্তু, লক্ষ্যে চির-স্থির অচঞ্চল হিমালয়কে শেষ পর্যন্ত কেউ কখনও টলাতে পারেনি।

কলকাতা থাকাকালিন আফ্রিকা যাত্রার পাথেয় যোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে অনেকে ব্যঙ্গ ভরে আঘাত হানে—"মজা করে ভ্রমণ করবেন আপনি, আর খরচের টাকা দিব আমি, কি আলালের ঘরের দুলালরে।" ভ্রমণ জীবনের দশ বৎসরে এমন তীক্ষ্ণ শরাঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে 'না-না' করে ন'শো নব্বই বার। চিন, আফ্রিকা ও আমেরিকায় শুধু তাঁর সোজাসুজি মতাদর্শের কারণে খুন করতে চেয়েছে অনেকে। আবার, আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে বের হয়ে এসেছেনও বারবার। চিনে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতায় হয়রান হয়ে পড়েছিলেন। এমন বেশ কিছু মানুষের খপ্পরে পড়েছিলেন, যাদের মুখে সরলতার হাসি ও কাছে টানার নির্মল আবেদন। তাদেরই নির্দেশিত 'ঐ ঠিক পথ' এ যেতে গিয়ে বিপথু হয়েছেন বারবার। নয়তো বা কোনও সর্বনাশা খপ্পরে পড়েছেন। হাড়ে হাড়ে মালুম পেয়ে বলছেন—"মুখগুলো নিষ্পাপ দেখতে হলে কি হবে, হতচ্ছাড়াদের অন্তরে কুটিলতার মারপ্যাঁচ।"

ভূপৃষ্ঠের যে যে দেশে গেছেন, সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটা দেশেই অর্থলোলুপ চরেরা সামান্য কিছু পাওয়ার লোভে তাঁর নামে অযথা মিথ্যে নালিশ করে দুর্ভোগের চূড়ান্ত করে ছেড়েছে। শুধু এদের জন্য পুলিশের হাতে অপমান, মার খাওয়া, জেলজীবন ভোগ করা ইত্যাদি যে কতবার ঘটেছে, তার ইয়ত্তা নেই। তবে সব চাইতে খেসারৎ দিতে হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের স্পাইদের কেরামতিতে। মলয়, থাই, ব্যাঙ্কক, চিনদেশ সর্বত্র ভূপর্যটককে বিদ্রোহীদের চাঁই ভেবে ব্রিটিশ স্পাই ক্রমাগত ফেউ লেগেছে। কোথাও দোকানদার, কোথাও সাধারণ মানুষ আবার কোথাও বা সহযাত্রীরা তাঁকে উদ্ধার করেছেন, সে বিরক্তিকর অবস্থা থেকে। শ্যাম দেশে এমনই আঠাকাঠির মতো লেগে থাকা দুই চরকে কিছুতেই কিছু করা যায় না। পর্যটককে তারা অস্বস্তির চরম পর্যায়ে ঠেলে দেয়। শেষে দায়িত্বের বোঝা কাঁধে তুলে নেয় 'বিপুল' ও 'মীড' নামে দুই যুবক। বিপ্লবী থাই যুবকদ্বয় ছিল তাঁর শ্যাম ভ্রমণের সহযাত্রী। তারা নিজেরা সংবাদদাতা সেজে প্রথমে চর দুটিকে একটি কাফেতে তোলে। তারপর তালেগোলে মদ খাইয়ে দিলে মাতালের বেহদ্দ হয়ে ধীরে ধীরে জ্ঞান হারায়। প্রথমে তাদের পকেট থেকে পাশপোর্ট, আইডেনটিটি কার্ড, পিতলের ব্রিটিশ ক্রাউন, পুলিশের টোকন্ কেড়ে নেয়। তারপর দুজনকে থলেয় পুরে সন্ধের সময় জেটি-কুলিদের মধ্যে মিশে গিয়ে তাদের রেখে আসে জাহাজের মাল-গাদায়। জাহাজটি যাবে সুদূর অস্ট্রেলিয়ায়। মীড ও বিপুল অতি সযত্নে দুটি কাগজ গোয়েন্দাদুটির পকেটে রেখে আসতে ভুল করেনি। যাতে লেখা ছিল— 'মালিক প্রার্থী গাধা'।

পর্তুগীজ আফ্রিকার 'লরেনসোমার্ক' শহরে এক গোয়ানীজ চরের ভেল্কি দেখানো রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে 'লডেনাম' (আফিং) থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে নাকালের চূড়ান্ত করে। পরে অবশ্য তাদের ভুল ভাঙে। ক্ষমাও চায়। কিন্তু, বিধ্বস্ত

হয়ে ফেরার পথে চোখে পড়ে, 'স্পাই'টি মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শাণিত ব্যঙ্গের 'কেমন মজা দেখিয়েছি' ভঙ্গিতে হাসছে। পানছোপ্ দাঁত মেলে যেন বলতে চায়—'সন্দেশ রসোগোল্লা কেমন খেলিরে?' 'ব্যস! মাথায় খুন চড়ে যায় নিরপরাধ যাযাবরের। 'ধাঁ' করে ছুঁড়ে মারলেন একটা পাথরের চাঁই। অনেকে মিলে তুলে ধরে বাবাজীবনকে নিয়ে গেল ক'দিনের 'হস্‌পিটাল' আদর খাওয়াতে। এদিকে তাঁর কিছুই হল না দেখে সকলে ধরে নিল—'পৃথিবী পর্যটকের বিরুদ্ধে কেস চলতে পারে না, নিশ্চয়ই'।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য

রামনাথের বুকের পাটার কোনও সীমা পরিসীমা ছিল বলে কেউ কখন শোনেনি, দেখেও নি। তাই তো দেখা গেছে, শিশুকাল থেকেই কেমন সহজাত তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিতে সোজা পথের পথিক। ধীরে ধীরে নিজেকে তুলে ধবতে পেরেছেন সবকিছু অন্যায়-কুসংস্কারের উর্দ্ধে।

ভোররাতে আফগানিস্তানের এক কফিখানায় ঢুকে অর্ডার দিলেন এক কাপ চায়ের। সামনের চেয়ারে মসজিদের মোল্লা হাতের মালা টপকাকে টপকাতে চা খেতে ব্যস্ত। চা পান হয়ে গেলে পর্যটকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, উঠে এসে। পিঠে হাত রেখে কন—"বলুন তো, কখনও প্রেত এবং জিন দেখেছেন কি না?" রামনাথ ঘড়ি শুদ্ধ হাতটা তুলে ধরে বললেন—"এই দেখুন রাত শেষ হতে আর মাত্র দেড় ঘণ্টা বাকি আছে। আজ একাকী বাইরে ছিলাম। ভূত-প্রেত তো দেখিনি কিছু"।

মোল্লা অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে আছে দেখে জুড়ে দিলেন—"আরে মশাই, ভূত প্রেত আমাদের পেটে থাকে।" এবার মোল্লার চোখ ছানাবড়া হওয়ায় খোলসা করলেন —"এর মানে হল, যখনই আমাদের পেট গরম হয়, তখনই নানারূপ স্বপ্ন দেখি।"

অবশ্য ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় পর্যটক মাঝে মধ্যেই স্বপ্ন দেখেছেন। ভূত-প্রেত, দত্যি-দানো সব ওনাকে যেন তাড়া করে ফিরছে। তাও কাকে আক্রমণ করতে ধেয়ে আসে? যে মানুষটা স্কুলে যাওয়ার সময় থেকে কখনও মরণ ভয়ে ভীত হয় নি। হতে পারে, জাগ্রত অবস্থায় একটুও সুবিধে করতে না পেরে ঘুমন্ত অবস্থায় ঝাল মিটিয়ে নেওয়া আর কি?

চিনে নানকিনের পথে পিছনের চাকা ফুটো হয়ে যাওয়ায় সারাচ্ছেন। এমন সময় মরণ ভয়ে ভীত এক যুবক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে "ঘাড়ে গর্দান রাখতে চাও তো পালাও" বলে কোথায় মিলিয়ে গেল। অকুতোভয় মানুষটার থোড়াই কেয়ার। নিশ্চিন্তে নিজের কাজে ব্যস্ত। একটু পরেই এল এক ক্লান্ত সৈন্যদল। সৈন্যাধ্যক্ষ এসে নানাভাবে তাঁকে পরীক্ষা করে দুটি বিস্কুট উপহার দিয়ে এগিয়ে চলল দলবলসহ। সাইকেল সারিয়ে এবার উঠতে হয়। সৈন্যদলের উল্টো দিকে মাত্র চার-পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে উপস্থিত হলেন ভয়াবহ দৃশ্যের সামনে। গ্রামটি পুড়ে ছারখার। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ছিন্নবিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত যুবক ও উলঙ্গ যুবতীদের দেহ। দেশদ্রোহী

চিয়াংকাইশেকের সৈন্যদল দেশপ্রেমিক চিনা গ্রামটির উপর এইমাত্র চালিয়ে গেছে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। ঘরে ঘরে উঠেছে কান্নার রোল। অতএব, নিজের থাকা-খাওয়ার জন্য এখন আর গ্রামবাসীদের বিরক্ত করা সমীচীন মনে করলেন না, ব্যথিত মানবপ্রেমিক। হত্যাকারীর রক্তরাঙা হাত হতে পাওয়া বিস্কুট দুটি ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঢুকলেন গ্রামের প্রান্তে কবরখানায়। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহের গাদার মধ্যে বিছিয়ে দিলেন নিজস্ব কম্বলখানি, রাত কাটাতে।

সাইকেল পথে বদখৎ লোক, গুণ্ডা, ডাকাত, গুপ্তচর, কমিউনিস্ট সব হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয়ে ভীষণ ধাঁধায় ফেলে। স্পষ্টবাদী, একবগ্‌গা মানুষ। তার উপরে দিন-রাত দানবীয় কষ্টের জীবন। অল্পেতেই মাথা গরম হয়ে যায়। যখন পারেন কুলকিনারা করেন। যখন পারেন না, ভেবে ভেবে দিশাহারা হয়ে হাল ছেড়ে মনকে সান্ত্বনা দেন— 'আমি পথের লোক, পথই বিশ্রামের স্থল, মানুষ মাত্রেই মিত্র, অতএব মরণেও ভয় নাই।'

সাংহাই থেকে দুচাকা গড়িয়ে চলেছে পিকিং-এর দিকে। দিনের পর দিন উত্তর দিকে শুধু চলা আর চলা। কত পথ—গ্রাম পার হয়ে রাত কাটিয়েছেন রাস্তার ধারে, পরিত্যক্ত বাড়িতে, না হয় গ্রাম্য হোটেলে। একদিন এমনই কোনও এক আশ্রয়ে মানচিত্র খুলে জায়গার অবস্থানের হদিস না পেয়ে চিন্তান্বিত হন—"হারিয়ে গেলাম নাকি!" পরক্ষণেই মুখময় ভিট্‌রে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে ভাবছেন—"দেশ দেখা যার একমাত্র কাজ, তার আবার হারিয়ে যাওয়া কি? মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো ডানপিটেদের বুকের পাটা একটু পুরু করতে হয়।"

শরীরের ক্ষমতা অসাধারণ থাকায় এবং মনের জোর অপরিসীম হওয়ায় কখনও থমকে পড়তে হয়নি। সেজন্য রামনাথ বিশ্বাস কেবলই এগিয়ে চলার আশ্বাস। একটা চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা ছিল; নিজের উপর এ আস্থা থাকায়, জলপান করার জন্য কখনও জঙ্গলে যেতে ভয় পাননি। তাই নিশ্চিন্তে দেখতে অভ্যস্ত হন সামনেই চিতাবাঘ হরিণ খাচ্ছে। আফ্রিকার ডুডুমা গ্রামে মশার সঙ্গে রাত কাটাতে না পেরে হাতের টিপ বাতি (টর্চ) না জ্বেলে বেরিয়ে পড়লেন। পালে পালে বুনো পশু চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে রামনাথ।

পরীক্ষাই কি কম দিতে হয়েছে জীবনভোর! 'আন্তং' শহরে এসেছেন। ওপারে কোরিয়া। ভারতপ্রেমিক বৃদ্ধ মিস্টার আল্লাদিত্যা নানাভাবে সাহায্য করার আগে বিশ্বপর্যটকের দেশাত্মবোধ কত গভীর এবং তার জন্য কত সাহস সঞ্চিত আছে, জেনে নিতে চান। ছোট ছোট কুমীরে ভরা নদীতে স্নান করতে হুকুম করায় বিশ্বজয়ী খেলার ছলে কাটতে লাগলেন সাঁতার। আধঘণ্টা পরে স্নেহজড়ানো কণ্ঠে বৃদ্ধ ডেকে তুলে বাড়িয়ে ধরলেন সাহায্যের হাত ও শুভেচ্ছা।

আক্কেল গুড়ুম করা বিচিত্র অভিজ্ঞতাও বড়ো কম হয়নি। অতি বিশেষ ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে, কোনও নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছনোর জন্যে দিনে ৮৫ মাইল (১৩৬.৭৯ কিমি.) পর্যন্ত সাইকেল চালাতে বাধ্য হয়েছেন। পা দুটি বিদ্রোহ করত। শরীর ভেঙে

যাওয়ার উপক্রম হয়ে মনটাও বেঁকে বসত। তবু থামা যায়নি কর্তব্যের ডাকে। এর সঙ্গে আছে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা, গ্রাম্য ছেলেপুলেরা নেহাতই মজা করার জন্য 'ফেউ' লাগত। অনেক ক্ষেত্রে দল বেঁধে নবাগতকে উত্ত্যক্ত করা ছিল ছোটদের সাধারণ ধর্ম। ঢিল পর্যন্ত ছুঁড়ত। যেন আজব জীব এসেছে। চিনে হাঙ্কোর পথে এমনতরো হতে থাকায়, শেষে এক দোকানদার বৃদ্ধ বাঁচান। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত রামনাথ তখন বহু বিশেষ মানুষের বক্তব্য সমেত 'অটোগ্রাফ' বইটি দেখতে দেন। বৃদ্ধ মন দিয়ে তা পড়ে ফেরত দেয় এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ভুরিভোজে আপ্যায়িত করে। 'চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়' ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে রামনাথ অন্ধকার পথে চললেন বৃদ্ধের সঙ্গে, শোওয়ার জন্যে। আধ মাইল সেই ছমছমে অন্ধকার পথে একটাই কেবল খটকা লেগেছিল। দাদু'র হাতে অতো বড় রামদা কেন? তাহলে কি ভালোভাবে চানা কাঁঠালপাতা খাইয়ে রামপাঁঠা বলির ব্যবস্থা নয়তো? ঘিরে ধরে নানা দুশ্চিন্তা। ভেসে বেড়ানো শির-শিরে পূতি-দুর্গন্ধের মধ্যে ঢুকলেন একটা পোড়ো বাড়িতে। দেখা গেল, বড়-সড় মাচার ওপর পরিপাটি করে বিছানা পাতা। মশারির মধ্যে টিম টিম করে মোমবাতি জ্বলছে। নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। নির্বাধ ঘুম ভাঙল সূর্য কিরণোজ্জ্বল সকালে। অনেক পথ বাকি। এক লাফে উঠে নামতে গিয়ে কিসে পা লাগতে, চেয়ে দেখে স্তম্ভিত! পর পর আটটি মৃতদেহপূর্ণ কফিনের উপর বিছানা পাতা। দেশীয় নিয়ম মতে আগামী অষ্টমী তিথিতে কবর দেওয়ার জন্য মৃতদেহগুলি অপেক্ষা করছে। চুল খাড়া অবস্থায় তিরিক্ষে মেজাজে বাইরে ছিটকে এসে দেখেন, এক বিরাট কৌতূহলী জনতার ভিড় সাগ্রহে অপেক্ষা করছে, তিনি আদৌ বেঁচে আছেন কি না দেখার জন্য। সকলের মাঝে দাঁড়িয়ে নাটের গুরু সেই বৃদ্ধ জোড় হাতে মেলে ধরেছে সব কটি ছ্যাৎলা ধরা দাঁত। যেন বিনয়ের অবতার। আসলে সেই অটোগ্রাফ খাতায় পাতার পর পাতা জুড়ে চিনা ভাষায় লেখা ছিল, ''লিমনাথ বিশোয়াসী বড়ই সাহসী এবং শক্তিশালী''। অতএব এমনতরো পরীক্ষার আয়োজন—'দেখাই যাক না, কত বড় হিম্মতদার'!

এই অভাবনীয় ঘটনা তাঁর মনে এনে দেয় সাহসের জোয়ার। যাত্রা শুরু করলেন ফুটন্ত উদ্যমে।

নিজের প্রতি

রূঢ় বাস্তবের দ্বন্দ্ব-সমস্যা-সঙ্কুল পথগুলি পার হতে গিয়ে আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন দেহে ও মনে। ফলে মানুষটার প্রকাশভঙ্গি কখনো কখনো হয়ে উঠতো শাণিত ব্যঙ্গের ফলা। অবশ্য এর সাহায্যে নিজেকেও ফালাফালা করতে রেহাই দিতেন না। তবে তার সাথে যে কৌতুক রসের সংমিশ্রণ ঘটতো, সেটা একান্ত নিজস্ব মেজাজের। যা এসেছিল অনেক কষ্টের মূল্যে, সাফল্যের ফলশ্রুতি হিসাবে। শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদ্য। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হওয়া সত্ত্বেও দুজনে এই 'মিল-জুলে'র অনেক কারণের মধ্যে একটি ছিল—উভয়েই স্পষ্ট

কথা প্রকাশের ক্ষেত্রে চমকে যাওয়ার মত 'ক্যাঁটকেটে' পন্থী। একবার এক বিদগ্ধ শিল্পী সুনীতি বাবুর কাছে হাজির হয়ে বললেন—"স্যার, দ্রৌপদীর ছবি আঁকতে চাইছি, ঠিক কেমন হওয়া উচিত মনে করেন?" একটুও কালক্ষেপ না করে যোগ করলেন—"কি আবার উচিত? একটা কেলে সাঁওতাল মেয়েছেলের দুকানে দুটো বালা পরিয়ে দাও। ল্যাটা চুকে গেল। তবে নাকে 'নথ' দিও না যেন। ওটা মুসলমান আমলের আমদানী"।

'নাবিক' উপন্যাসটির উৎসর্গ পত্রে ভূপর্যটক লিখছেন—"যিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, যার উপাধির শেষ নাই, সেই সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে 'নাবিক' সমর্পণ করা হ'ল। কাজটি ভাল কি মন্দ করা হল বলতে পারি না। কারণ আমি হলাম একজন অপণ্ডিত। যাকে এক কথায় বলে 'মূর্খ'। প্রবাদ আছে, দেবতারা যেখানে যেতে ভয় পান, মূর্খ সেখানে অনায়াসে যেতে পারে।"

বৈশাখ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ রামনাথ বিশ্বাস

চিনের লখচাং শহরে চলেছেন। অনেক পথকষ্টের শেষে মজুরদের গ্রামে (কাংসি) হিন্দু পর্যটককে অভ্যর্থনায় ভরিয়ে তুলেছে। তাদের মুখের স্থানীয় ভাষা অজানা। কিন্তু চোখে মুখে ঢেলে দেওয়া স্নেহাশিস ও দুহাতে জড়িয়ে ধরা ভালবাসার মহিমা ভবঘুরের মনে এঁকে দিয়েছে পরতে পরতে। চলতে চলতে বলছেন নিজ মনে—'আজ সবই মনোরম লাগছে। রাস্তা, পাহাড়, নদী-নালা সবই সুন্দর। এ সুন্দরের স্বরাজে আমি 'রামা' কেবল অসুন্দর।' নিজের সম্বন্ধে বলেন—'আমার মধ্যে দুটি গুণ। অজ্ঞতা এবং একগুঁয়েমি।"

মুকদেনের পথে স্ব-দেশপ্রেমিক স্ত্রীলোক ক্ষুধার্ত রামনাথকে দইভাতে তৃপ্ত করলে তার স্বামী এসে সামনেই ঘা-দু'চার লাগিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে, কিছু করতে অক্ষম হয়ে নিজেকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করতে করতে পা বাড়ালেন—"স্ত্রীলোকের উপর এরূপ অত্যাচার করে যারা তারা কাপুরুষ এবং নীরবে সহ্য করে যারা তারাও কাপুরুষ।"

'কালার বার' বা বর্ণ বৈষম্যের পীঠস্থান দক্ষিণ আফ্রিকায় পথ চলতি একানে ঘরে ঢুকে পড়েছেন—"প্রবেশ করে দেখি ইউরোপিয়ান শুয়ে আছে। আমায় দেখে বসতে বলল। বুঝলাম, ইংরেজি উচ্চারণে আমার চেয়েও মহা মহা পণ্ডিত। তবে, 'কালারবার' একে মোহিত করতে পারে নাই, তাই আমার মতো কেলোকেও খাতির করছে"।

ইউরোপ ভ্রমণশেষে ফিরে এসে লিখছেন—"বলতে পারি না, আমার মুখের দোষেই হোক আর শরীরের রং-এর জন্যই হোক, ইউরোপে অতি অল্প স্ত্রীলোকের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। অথচ বিলাত ফেরতা ছাত্রগণ ভারতে এসে যত ভ্রমণকাহিনী লেখেন, শুনেছি, তাদের ভ্রমণকাহিনীতে নারীবন্ধুর বড়ই ছড়াছড়ি।"

অনেকসময় সংবাদপত্রমাধ্যমে তাঁর আসন্ন পৌঁছান সংবাদ প্রকাশ হয়ে যেত।

এরকমই হওয়ার ফলে, ইস্টলন্ডন বন্দরে জাহাজে ভেড়া মাত্র একদল 'স্কোলি বয়' (পিতৃপরিচয় বঞ্চিত) হৈ হৈ করতে করতে উঠে এল জাহাজে। —"আমায় আগিয়ে নিয়ে যেতে তাদের আসরে। সকল সাদা মুখের জনতা সমারোহের ভিতর চির উজ্জ্বল শ্রীমান রামনাথকে খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয় নাই তাদের।"

ইষ্টলন্ডন বন্দর ছেড়ে জাহাজে চলেছেন এলিজাবেথ অভিমুখে। সন্ধ্যার পর ডিনারে বসেছেন। সামনেই এক মলয় দম্পতি। তাদের জন্য নিরামিষ খাবার। এদিকে মূলত আমিষভোজী রামনাথ হাঁফিয়ে উঠেছেন নিরামিষ দর্শনে। এমন সময় বয় এসে আক্ষেপের সুরে বললে—'আপনাদের জন্য স্পেশাল ভেজিটেবিল ডিনার। তাও আবার চর্বিতে রান্না নয়। এতে আমাদের বড্ড বেগ পেতে হচ্ছে।'

অমনি রামনাথের দুষ্টুবুদ্ধি চাগাড় দিয়ে উঠল। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চকিতে বলে উঠলেন—'চর্বি! কোন জানোয়ারের?'

—'কেন, শূকরের। আপনাদের তো তা চলবে না'।

—"ওসব অছিলা ছাড়ান দাও। শূকর তো ভাল, তোমার চর্বি শুদ্ধ রান্না করে আন। আমি সব খাই।"

শুনেই দম্পতি মুখে রুমাল গুঁজে টেবিল থেকে উঠে গেল। বুদ্ধিদাতার নির্দেশ পেয়ে ওদের খাবার কেবিনে পৌঁছে দিয়ে রামনাথের জন্য ইউরোপীয় খানা সাজিয়ে বিস্মিত প্রশ্ন রাখে বয়টি—'আপনি কি খৃষ্টান?' পরিতৃপ্ত রামনাথের সহাস্য উত্তর—'না হে না। আমার ধর্ম জানোয়ার প্রুফ। শূয়োর দূরে থাক, হাতীও তাকে ঘায়েল করতে পারবে না।'

জাহাজ পোর্ট এলিজাবেথ থেকে ভারত মহাসাগর ছেড়ে অতলান্তিক-এ যখন পড়ল, খোলা ডেকে কিছু ইউরোপীয় বাঁদর-নৃত্যে 'হুররে হুররে' বলে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। ভারতীয় হিন্দুটি 'কি আর করা যায়' ভঙ্গিতে চুপচাপ বসেন একপাশে। কয়েকজন আগ বাড়িয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিলেন, 'এমন উল্লাসের কোনও কারণ নেই, তাই'। তখন তারা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ স্বরে বলে—'দেন ইউ কাম আউট অ্যাট থ্রি ইন দি মরনিং, স্যর ব্ল্যাকি'।

মুহূর্ত মধ্যে ততোধিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে রামবাবু ফিরিয়ে দিলেন—'বি ইট সো স্যর হোয়াইটি'। বলেই স্বগতোক্তি জুড়ে দিলেন—'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। ছাই, শত বিপদে পড়েও জিভ আমার সংযম জানে না।'

আফ্রিকার রডেসিয়ায় এক শ্বেতকায় বুয়র মানুষের বাড়িতে উঠেছেন। যিনি আবার তাঁকে 'কুলি' সম্বোধন-এ ঘরের মধ্যে নয়, বারান্দায় ঠাঁই দিয়েছেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘরে ঢুকে খিল দিলেন, চোখের সামনে। বাইরে রইল কেবল গৃহকর্তার পোষা কুকুরটি, পার্শ্বসঙ্গী হয়ে। সে রাত্রের অভিজ্ঞতা থেকে রামনাথ নিজের প্রতি সহজাত ব্যঙ্গের তীরটি ছুঁড়েছেন, টুক করে—"কুকুরটি বড়ই ভাল। সে বোধহয় জানতে পেরেছিল, আমিও তার স্বজাতি। তাই, চুপ করে আমারই পাশে শুয়ে থাকল।"

ওলটপালট

পৃথিবীর অনেক মনীষীই নাস্তিক থেকে আস্তিকতার দিকে ধেয়ে গেলেও রামনাথের জীবনগাড়ি আস্তিকতার ষ্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে নাস্তিকতার অসীম গন্তব্যে চলেছে।

প্রথম জীবনের সব কিছু উলটে-পালটে দেয় অষ্ট্রেলিয়া ফেরত একই সিলেট জেলার এক আধুনিক মুসলমান যুবক। 'গোঁড়ামি দূর করে মনের উন্নতি কর' এমন বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ শেষে চিনা 'ইটিং হাউসে' গিয়ে নিজে খায় শুয়োর মাংস ও রামকে খাওয়ায় গো মাংস। এভাবেই আমাদের 'ইনি' 'জাতের কাঁথা' জলাঞ্জলি দিয়ে পা বাড়ালেন অন্য জগতে।

এর পরের পরিবর্তনটি তোলপাড় করা, বেরিয়ে পড়ে। যখন সাইকেলে ভ্রমণ শুরু করেন, তখন দেখা যাচ্ছে—তিনি ভাগ্য, ঈশ্বর, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। ভোরে উঠে সকল শক্তির উৎস সূর্যদেবকে প্রণাম ও শোয়ার আগে প্রত্যেক দিন ঈশ্বর আরাধনা করতেন। কখনও বা চুটিয়ে গাইতেন রামপ্রসাদী সঙ্গীত। প্রকৃত বৌদ্ধমত ও ধর্ম আর বিবেকানন্দের কর্মপথ তাঁর বরাবরই প্রিয়। স্বামিজীর চটি বই শুধু কাছেই রাখতেন না, দরকার মতো বিলিয়েও দিতেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা।

প্রথম দিকে যে আস্তিক ছিলেন, লিখিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাঁর অটোগ্রাফ খাতায়। মালয়েশিয়া'র 'তানজং মালিম' (TANJONG MALIM) এ পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে খাতায় লিখে রাখলেন—"ধারণা ছিল না এদের সঙ্গে আবার দেখা হবে, কিন্তু ভগবানের দয়ায় হলো।" মালাক্কা যাওয়ার পথে 'বাতুপাহাত' (BATU PAHAT) এ পৌঁছে ১১.৭.৩১ তারিখে লিখেছেন—"আজ সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ভাত জুটে নাই। কাল রাত্রেও ভাত খাই নাই। ভগবান জানেন কখন জুটাবেন।"

জল, ঝড়, অনাহার ও সীমাহীন কষ্টের টানা-পোড়েনে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে মানসিক ভারসাম্য হারাতে চলেছেন, —"আমার জন্য আমিই গর্বিত, আমার জন্য আমিই অনুতপ্ত, আর যদি কেহ থেকে থাকেন, সেই ভগবান, যাকে জানি নাই, শুনেছি তিনি আছেন। কিন্তু তাঁর দেখা কবে পাব? এখনই যে হয়রান হয়ে পড়েছি। পৃথিবীর লোক তোমরা একটু আমার দিকে তাকাও না। একটুও ভালবাস না কেন?" এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, চরম বিভ্রান্তির আবর্তে পড়ে উঁকি দিচ্ছে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুটা সংশয়।

সিঙ্গাপুর, মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি ঘুরে ঢুকেছেন চিনে। সে দেশে তখন চলছে জাপানের ছত্রছায়ায় সর্বনাশা চিয়াং কাইশেকের রাজত্ব। অথচ তলে তলে কমিউনিস্টদের মহাযজ্ঞ চলছে দেশকে স্বাধীন করার জন্য। এক একটি এলাকা মুক্তাঞ্চল করে স্থাপন হচ্ছে 'চালীন সোভিয়েট'। বিস্ময়ের সঙ্গে রামনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, তাদের নেতা মাও-সে-তুঙ ভক্ত-দৃষ্টিতে এখনই পরিণত হয়েছেন প্রায় মহামানবে। এমন মানুষের দর্শনে কাঙ্ক্ষী হওয়ায়, ঘটনাক্রমে তাঁকে চোখ বেঁধে নানা পথ ঘুরিয়ে আনা হলো একটি নির্জন ঘরে। চোখ খুলে রামনাথ দেখেন—তাঁরই

সামনে কুলির পোশাকে দাঁড়িয়ে প্রাণময় সরল হাসিতে ভরা জীবন্ত দেবতা। স্মিত হাসিমুখে জানতে চাইলেন, 'তুমি কার ইচ্ছায় পৃথিবী ঘুরছো'?

রামনাথ স্বভাবত চটজলদি উত্তর দিতে অভ্যস্ত। কিন্তু, আজ যেন কোন অলক্ষ্য বজ্র ইঙ্গিতে থতমত, বেসামাল অবস্থা। কোনও রকমে ঢোঁক গিলে উগরে দেন— 'আজ্ঞে ঈশ্বরের ইচ্ছায়'।

স্মিত মুখ মুহূর্তে আগুনে পরিণত হলো। জলদ গম্ভীর স্বরে আছড়ে পড়লেন— 'না! তুমি নিজের ইচ্ছায় ঘুরছো। নিজের হিম্মতে ঘুরছো। তুমি যদি পঙ্গু হতে, তাহলে কি ঈশ্বর তোমায় এইভাবে সাইকেলে করে ঘোরাতে পারত?'

সূর্য তেজের মহারশ্মি-আহত যাযাবর আস্তিকতার খোলস ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এলেন, পুরুষকারের প্রতীক হয়ে। এখন থেকে নাস্তিক মন্ত্রে দীক্ষিত রামনাথের শুরু হল এক অন্যতর বিজয়যাত্রা, আমৃত্যু।

ইরানে 'মাসাদের' পথে মুসাফির খানায় এক ভদ্রলোক রামনাথের নাস্তিকতা দেখে, এমনকি শোয়ার সময় পর্যন্ত ঈশ্বরের কথা স্মরণ করেন না জেনে অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন রাখেন—''আপনার মত লোক ইন্ডিয়াতে কতজন আছেন?'' একটুও চিন্তা না করে সাথে সাথে ফিরিয়ে দিলেন—'আমি ত আমার মত আর একটি লোকও দেখতে পাইনি।'

মণিপুর ত্যাগের পূর্বে এক অমায়িক দয়ালু পণ্ডিত অনেক হিসেব কষে শুভদিন ধার্য করে দিলেন। কিন্তু পর্যটক এসব মানেন না শুনে দুঃখিত হয়ে বললেন— 'এতগুলি দেশ ভ্রমণ করার পর এসবে অবজ্ঞা, এতো কম কথা নয়।' রামনাথ জানতেন এবং মানতেন, তথাকথিত জ্যোতিষবিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ এবং প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত নয়। যে কারণে বলতে পারেন—'আমার জন্ম এমনই এক পরিবারে হয়েছিল, যে পরিবারে আস্তিক এবং নাস্তিকের সমাবেশ ছিল। সাংখ্য অনেকটা নাস্তিকত্ব সমর্থন করে। বেদান্ত দ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদ নিয়ে মাথা ঘামায়, তাছাড়া ন্যায় অন্যায়েরও সমর্থন করে—এসব কথা ছোটবেলা হতে নিজের ঘরেই শুনতাম। এরপরে পশ্চিমা দেশগুলিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন আমার পরিবারের অনেকেই। আমি হলাম পণ্ডিত-পরিবারের মূর্খ ছেলে। আমাকে শনিবারের বারবেলা এবং মঘা নক্ষত্র ভয় দেখাবে কি করে?'

পরবর্তীকালে কেউ যদি তাঁকে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করতেন—'আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন?' তাদের কৌতূহলে জল ঢেলে নির্বিকার চিত্তে বলতেন, 'আমি শুধু আমার আমিত্বে বিশ্বাসী।'

নাস্তিকতার সূত্রে গভীর আত্মবিশ্বাসী অথচ ঠোঁটকাটা স্বভাবের পরিচয়ও কম রেখে যাননি। বুলগেরিয়ার 'সোফিয়া' শহরের রেস্তোরাঁয় 'গ্যাঁট' হয়েছেন। সঙ্গে আছে পিটার নামে এক ছাত্র, দোভাষী। পিটার একজন বিশেষজ্ঞ জ্যোতিষিকে রামনাথের হাত দেখতে অনুরোধ করে। যাঁর দেশজোড়া খ্যাতি এবং তিনি নাকি যা বলেন, সত্যি হয়। জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠ ভূগোলক চষে বেড়ানো হাতটি টেনে গম্ভীর মুখে

'হুঁ' বলেই কপাল কুঁচকে শুরু করলেন—'বিয়ে হয়েছে, ছেলেপিলেও আছে, দেশে ফিরে যাবার জন্যে মন খুব অস্থির হয়েছে'।

চিরকুমার মহামান্য জ্যোতিষীকে শুনিয়ে পাশ ফিরে পিটারকে খোলসা করলেন—'এরূপ বর্বরদের শাস্তি দেবার জন্য এদেশে কি কোনও আইন নেই'। 'নিখুঁত ভবিষ্যৎ' বলার দফারফা করতে সরাসরি জুড়লেন—'তোমাদের নিজের ভাগ্যটা একবার দেখ না বাবু। অপরের ভাগ্য গুনে কি লাভ হবে? যদি নিজের ভাগ্য নিজে গুনতে পার, তবেই তো সকল লেঠার আপদ চুকে যায়।'

কেবলমাত্র

জীবনে অনেক সাধু দেখেছেন। কিন্তু চীন ঘুবে আসার পর থেকে আর কোনও সাধুকে সম্মান প্রদর্শন করতেন না। শুধু ব্রহ্মদেশের 'পেগু' থেকে 'রেঙ্গুন'গামী পথে এক অসাধারণ 'ফুংগী' সাধুর প্রতি দারুণ ঔৎসুক্য অনুভব করেছিলেন, তাঁর নিজ মতবাদের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজে পেয়ে। এই বিরলজাতীয় সাধুটির সঙ্গে তাঁর যে যে বিষয়ে মিল ছিল : — উভয়েই নিরীশ্বরবাদী। এঁরা মানতেন ভক্তি দুর্বলতার লক্ষণ। কাম এবং ক্রোধ মানুষের মিত্র। লোভ এবং মাৎসর্য মানুষের শত্রু।

১৯৩৪ সাল, বর্মা থেকে শিলং হয়ে দেশে ফেরার পথে পা ভেঙে হস্‌পিটালে ভর্তি হন। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব নানা কারণে তাঁকে এড়িয়ে গেলে, সে সময় এক আশ্চর্য উদার বৈষ্ণবীর স্নেহাশ্রয়ে দ্রুত আরোগ্য লাভ করলেন। সসাগরা পৃথিবী পরিক্রমায় অনেক রকমের সাধুসঙ্গ পেয়েছেন। কিন্তু কেউ তাঁকে তাঁর নিজস্ব পথের ধ্যান-ধারণা থেকে এক চুল টলাতে পারেনি। অতি বিশেষ ঐশী-ক্ষমতাসম্পন্ন একমাত্র এই সাধিকাই বামনাথের জীবনে অভূতপূর্ব সংশয়, সংস্কার ও অসীম শ্রদ্ধার আবর্তে ফেলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে কেবলমাত্র ঐ একবারই।

উদ্বুদ্ধ

মাথা উঁচু করা সমস্ত বড় মাপের মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বৈষম্য তাঁদের মনের তারে অন্য সকলের চেয়ে অনেক আগে বাজে। এ বৈষম্যের বারুদ হয়ত প্রকৃতি দেবী তাঁদের অন্তরের কুলুঙ্গিতে সাজিয়ে রেখে দেন, স্তরে স্তরে। কেবল আগুনটি ধরাবার দায়িত্ব পালন করেন এই মাটিরই অন্য কোনো মহৎ ব্যক্তিত্ব অথবা কিছু গুরুতর ঘটনা। রামনাথের ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বের ব্যতিক্রম ঘটেনি।

জ্ঞান হওয়া থেকে দেখেছেন, জমিজমার উপসত্ত্ব থেকে জমিদারীর স্টাইলে তাদের সংসার চলত। আর তা চালু রাখতে গরিব-গুর্বোদের ওপর শাসন-শোষণ দেখে কষ্ট পেতেন। দেশের সর্বত্র এক বিশেষ শ্রেণী কর্তৃক দুস্থ মানুষকে আরও দুঃখী করার হাজারো অপকৌশল দেখে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতেন। স্বার্থান্ধ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধর্মের আড়ালে বিশাল সাধারণ শ্রেণীকে কুসংস্কারে বেঁধে ফেলে। তাতে শিউরে উঠে মুক্তির

উপায় খুঁজতেন। প্রতিবাদে ফুঁসে উঠতে ইচ্ছে হোত। কিন্তু বড্ড ছোট যে তখন। তবু যজ্ঞের আগুনে আহুতির ব্যাপারে প্রথম পুরোহিত ছিলেন বাল্যকালের শিক্ষাগুরু কালীপদ বাবু। মনুষ্যত্বের পাঠশালায় অ-আ-ক-খ'র হাতে খড়ি দিয়ে যাত্রা শুরু করান তিনিই। যত দিন গড়ায়, এই শিক্ষা ততই দুর্বার গতি নিয়েছে।

গ্রামে রামনাথের লেখাপড়া হরিশ্চন্দ্র হাইস্কুলে। প্রধান শিক্ষক শ্যামাচরণ দে একজন নীরব দেশকর্মী এবং আদর্শ শিক্ষাবিদ। ডিগ্রির শিক্ষায় 'রামা'কে তিনি বিশেষ নড়াতে চড়াতে সক্ষম হন নি বটে, কিন্তু ভিতরকার দীক্ষায় ভিত্‌টি গেঁথে দিয়েছিলেন, অত্যন্ত দক্ষ আচার্য্যর ব্যঞ্জনাময় হাতে। তিল তিল করে বিকশিত হয়েছে প্রভাবিত সেই জীবনধারা। নিরালা ক্ষণে ভূপর্যটকও অনুভব করেছেন পূজনীয় শিক্ষকের অবদান, কৃতজ্ঞচিত্তে।

সংস্কারাচ্ছন্ন যুগ-অন্ধকারে, যাতায়াত ব্যবস্থার শোচনীয় পঙ্গু অবস্থায় এবং বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে সমস্তরকম কল্পনার অতীত ত্যাগ স্বীকার করে লক্ষ্যে পৌঁছতে যে অমানুষিক মনের জোর প্রয়োগ করেছিলেন, তার পিছনে অনেকখানি অবদান ছিল চারণ কবি মুকুন্দদাসের একটি বাণী। বিপ্লবী কবি একবার উপদেশসূত্রে বলে গিয়েছিলেন—"যারা আশীর্বাদ চায় তারাই দুর্বল, তারা নিশ্চয়ই অন্যায় কাজ করে। অতএব তাদের জন্য আমি এক নতুন আশীর্বাদ রচনা করেছি। 'আশীর্বাদং শিরশ্ছেদং বংশনাশং দিনে দিনে'। বুক ফুলিয়ে চল। দেখবে, আশীর্বাদের দরকার হবে না। আশীর্বাদ এসে তোমাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে।" আর পিছনে ফিরে তাকান নি কখনও। কোন ছোটবেলায় শেখা এই বুক ফুলিয়ে চল' মন্ত্রই তাঁকে জীবনভোর দাপিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, সারা পৃথিবীময়। 'পথ' সম্ভবত জন্মলগ্ন থেকেই রামনাথকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। তাইতো 'পথ'ই তাঁর কাছে প্রাণ, 'পথ'ই গান এবং একমাত্র জীবনসখা ঐ 'পথ'। শেকস্‌পীয়রের "Cowards die many times before their death; the valiant never taste death but once." এই মহৎ শব্দগুচ্ছের টংকার তুলে তিনিই পারেন কবি বাণীর অনুরণন ঘটাতে—

"আগে চল আগে চল ভাই
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কি বা ফল ভাই"।

সিঙ্গাপুর থেকে সাইকেলযোগে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে যে মানুষটি অবিরত তলে তলে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন, তিনি হলেন নোয়াখালি জেলার গৌরীশচন্দ্র সিংহরায়। ক্ষয় এবং থাইসিস রোগে আক্রান্ত, ডান হাত নুলো, যমের মুখে গলা বাড়ানো, বহুদর্শী শীর্ণকায় মানুষটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন এক গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে দেশত্যাগী। জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেওয়ার লোভনীয় ঘোষণা সে দেশে ঝুলছে। বর্তমানে সিঙ্গাপুরে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় ছাড়াও তাঁর অধীনে ছিল চিন, জাপান, কোরিয়া, প্রভৃতি দেশের 'আন্ডারগ্রাউন্ড' বিপ্লবকামী অসংখ্য যুবক যুবতী।

ইনিও পৃথিবীটাকে পাক দিয়েছেন। তবে সাইকেলে নয়, জাহাজে চড়ে। দেশ বিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ যোগাযোগ। যে কোনও রকমের মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করতে তাঁর ছিল অসাধারণ বাগ্মীতা ও স্বপ্নাতীত যাদুক্ষমতা। জবাবি মন্তব্যেও ছিলেন অতি তৎপর। এহেন মানুষটি রামনাথের বাসায় কোনও বাইরের লোক এলে মুহূর্তে বনে যেতেন চাকর। অন্য সময়, তাঁর বন্ধু থেকে পরামর্শদাতা হয়ে অভিভাবক পর্যন্ত। সিঙ্গাপুরে 'রামসিঙ্গা' ছদ্মনামের এই ত্যাগব্রতীকে রামনাথ 'মহামানব' তুল্য মনে করতেন। শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দেবতার মতো। অথচ কি আশ্চর্যরকমের মহান বিচ্ছেদ! দু'চাকায় ভর করে সে সময় ইউরোপ ভ্রমণে ঘুরতে ঘুরতে বিলেতে পৌঁছেছেন। লন্ডনের এক নার্সিংহোমে ভূপর্যটকের চোখের সামনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন এই মহাবিপ্লবী। রক্তাক্ত ক্ষয়রোগেই।

দৃঢ় পদক্ষেপে সিঙ্গাপুর ডক হতে ফিরছেন আমাদের 'সুপারভাইজার'বাবু। থমকে দাঁড়াতে হয়!

—মুসা ভাই, কেমিতি অছ? (হুজুর কেমন আছেন?)

—বেশ ভাল আছি, তুমি কেমন আছ?

—ভল আছি আজ্ঞা, আপনঙকু যে আম্ভে মানে চাহুঁ।

(বেশ ভাল আছি হুজুর, আপনাকে যে আমরা চাই)

—এর মানে?

—এহার মানে ক'ণ হোই পারে আজ্ঞা, আপনঙকু আম্ভেমানে চাহুঁ। আম্ভে পাইবু নুহে, কাটি নেবু। (এর মানে কি হতে পারে হুজুর, আপনাকে আমরা চাই। আমরা পাব নয়, কেড়ে নেব।)

—(রূঢ়স্বরে) আমাকে চাও মানে? বাজে কথা শোনার সময় নাই। কি চাও বল?

—আজ্ঞা, আগামী রবিবার আপনঙকু খুআইবাকু চাহুঁ।

(আজ্ঞে, আসছে রবিবার আপনাকে ভোজন করাতে চাই।)

ইয়া মোটা পৈতে গলায়, পরণে আধ ময়লা গামছা, এক উৎকলবাসী কুলি নিখুঁত ওড়িয়া বুলিতে পথ আটকে অভূতপূর্ব নিমন্ত্রণের জোরালো আবেদন রাখল।

রবিবার গেলেন। পাতে পেলেন তাঁর প্রিয় মেনু খিচুড়ি। এবং যথারীতি অতীব তৃপ্ত হলেন। এটাই তো কাম্য ছিল। ছুঁচ হয়ে পেটুক ঠাকুরের হৃদয়ে বাসা বাঁধল মহ্‌তাব। উপরোক্ত টেররিস্ট দলের একনিষ্ঠ সদস্য। উড়িষ্যাবাসীর ছদ্মবেশে খাঁটি বাঙালি। আত্মসুখী চাকুরেটিকে ঘরছাড়া করাবার প্রথম সোপান হিসেবে বাসায় পৌঁছে দিল প্রকাণ্ড এক দুর্লভ 'অ্যাটলাস' ম্যাপের বই। রামবাবু মহাখুশি। এতে বহু কিছুর সাথে দক্ষিণ আমেরিকা, তিব্বত, মধ্য-আফ্রিকা এবং গোবী মরুভূমিতে পায়ে হাঁটা পথেরও চিহ্ন দেওয়াছিল। কিন্তু তখনো ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন নি উৎকলবাসী 'কুলির' দেওয়া বই একদিন পথের নির্দেশ হবে এবং সে নিজে এমন ঘরকুনোকে দেশভ্রমণে টগ্‌বগে অশ্বশক্তির যোগান দেবে।

পরে যখন চাকরী চলে যাওয়ায় বিষণ্ণ মনে ঘরে বসে দিন কাটাচ্ছেন, তখন এই

উৎকল 'কুলি' মহ্‌তাবের উদাত্ত কণ্ঠের চারণ গান তাঁর ব্যথাকষ্ট প্রশমন করতে প্রভূত সাহায্য করে। এছাড়া তার সুধা মাখা কথাবার্তা রামনাথকে দেশ ভ্রমণের উন্মাদনায় অনেক দূর পৌঁছে দেয়। তার কথায় পাসপোর্টের দরখাস্ত ঠুকে তারই নির্দেশ অনুযায়ী চাকা দুটি গড়িয়ে দেন পৃথিবীর বুকে।

সিঙ্গাপুর থেকে সাইকেল যোগে বিশ্বভ্রমণের প্রস্তুতি চলছে তখন জোরকদমে। সাইকেলের 'পার্টস' পুরোপুরি খুলে আবার 'ফিট্' করায় রপ্ত হচ্ছেন, এক সাইকেল মিস্ত্রীর কাছে। নিজেকে যোগ্য তৈরী করছেন, প্রতিদিন দশ বারো ঘন্টা সাইকেল চালনায় অভ্যস্ত করে। পাশপোর্ট ভিসা ইত্যাদির কাজও প্রায় সারা। শেষ যেতে হয় জার্মান কন্‌সাল অফিসে। বন্ধু মজিদকে কন্‌সাল সাহেবের কাছে ঠেলে দিয়ে নিজে বসে আছেন দূরে এক কোণে, কাঁচু-মাচু ভঙ্গিতে। ভাবী পর্যটনের চিন্তা-ভাবনায় বিভোর হয়ে। জার্মান কনসাল পণ্ডিত লোক। তিনি এটা লক্ষ্য করে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন—"তোমার আজও আড়ষ্টতা কাটেনি। তুমি হয় তো ভ্রমণের আনন্দই পাবে না। ভ্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে অজানাকে জানা এবং আবিষ্কার করা, তাও বেশি হবে না তোমার দ্বারা, আপন শক্তিতে যতদিন না আস্থাবান হও। জার্মান পর্যটক দেখেছো? তারা মনে করে 'দুনিয়াটা আমার'। কাজেই তারা পারে সুবিধা আদায় করতে, সকল শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে। সকল কাজে ইচ্ছাশক্তি করবে প্রয়োগ। ভাব্‌বে 'আমি সর্বশক্তিমান, আমার কাছে সবাই পরাজিত, আমি কারো চেয়ে হীন নই, বুঝলে?'

—'হ্যাঁ স্যার, প্র্যাকটিশ করবো। এখনো ভ্রমণ আরম্ভের দেরি আছে।'

—'হ্যাঁ, তাই কর। তোমাদের জাতি হারিয়ে ফেলেছে প্রাচীন আর্য জাতির প্রভাব। জার্মানদের দিকে তাকাও, প্রতিটি লোক দিকপাল, কেন? অবিমিশ্রিত আর্যরক্ত তাদের ধমনীতে। তোমাদের ভিতর মিশ্রণ, মুসলিমের অধীনতা—তোমাদের সর্বনাশ করেছে। পরাজিতের মনোবৃত্তি ত্যাগ না করলে দুনিয়া কোন জাতিকে সম্মানের আসন দেয় না। তুমি আমার কাছে এসেছ অপর একজনের কাঁধে ভর করে। সাহসীরা তা করে না। আর পৃথিবী ভ্রমণে চাই দুঃসাহস।"

যেটুকু বা উৎসাহ উদ্দিপনার বাকি ছিল, দুধর্ষ জাতির যোগ্যতম পণ্ডিত প্রতিনিধির মুখের কথায় একেবারে দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। বারুদতো অন্তরে সাজানই ছিল।

এই সুবিশাল পৃথিবীকে যে যে ভরসাতে কব্জির আয়নায় দর্শন করা সম্ভব হয়েছিল, সেটা তাঁর নিজের ভাষায় হলো এই, "প্রথম—আমার শরীরের মজবুত গঠন। দ্বিতীয়—মহাত্মা গান্ধীর দেওয়া অনুপ্রেরণা। তৃতীয়—একজন জার্মান বলেছিলেন, 'সব সময় মনে রাখবেন, এই পৃথিবীতে যত লোক আছে, তারা সবাই আপনজন এবং 'world is yours'। এই তিনটি শক্তির ওপর নির্ভর করে আমি পৃথিবী ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম"।

আবার উল্টোদিকে, অপরকে মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে কতভাবে, তা বলে বুঝিয়ে শেষ করা যাবে না। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। ভ্রমণ অন্তে অজস্র বাঙালি যুবকের

মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার এনেছিলেন আপন মহত্ত্বের কারু-কুশলতায়। বাঙালির কর্মবিমুখতার শুকনো পাতায় আগুন ধরিয়ে 'খাক্' করে ছেড়েছিলেন। আর চলমান দু'চাকার জীবনে সেই ক্লান্তিহীন কর্মযজ্ঞের গণ্ডি ছিল সারা বিশ্বজুড়ে।

রামনাথ ন্যায়কে 'ন্যায়' অন্যায়কে 'অন্যায়' বলতে বিন্দুমাত্র পিছু পা হতেন না। এর জন্য বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় অপমান ও নাজেহালের একশেষ হতে হয়েছে বহুবার। এমন কি মার খেতে হয়েছে একাধিকবার। মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য! দাবিয়ে রাখা যায়নি। সব-হারাদের পাশে দাঁড়িয়ে, দরকার হলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হওয়া চাইই চাই।

কেপটাউন থেকে জাহাজে আমেরিকা যাত্রায় চলেছেন। জেটিতে প্রচুর পরিচিত বন্ধু-বান্ধব এসেছে, শেষ কথা ও বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। এমন সময় তিনজন সাংবাদিক বিদায়বাণী শুনতে চাইলে উদাত্ত কণ্ঠে শুরু করলেন—"দক্ষিণ আফ্রিকার জল এবং ফলের তুলনা অন্য কোন দেশের সঙ্গে হয় না। জোহানেসবার্গের স্বর্ণখনি এবং কিম্বার্লির হীরের খনি জগৎ বিখ্যাত। কিন্তু ঐ 'কালার বারটা' (বর্ণবৈষম্য) আমার মোটেই সহ্য হয়নি। ...দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যাচারিত কালো, ব্রাউন এবং বাদামী একত্র হও, যাতে মানুষ বলে পরিচয় দিতে পার। কেউ তোমাদের সাহায্য করবে না, করতেও পারে না। উপরন্তু তোমাদের মাঝে ভাঙন এনে দেবে। ইউরোপীয়ান নিজেদের 'আফ্রিকানেরাব' বলে পরিচয় দেয়। তোমরা নিজেদের 'আফ্রিকান' বলে পরিচয় দাও। দেখবে, স্বাধীনচেতা মানুষ, পরাধীন ভারতবাসী, মরণবিজয়ী চীন তাতে যোগ দেবে। মুষ্টিমেয় বুয়র (শ্বেতকায় শাসক শ্রেণী) তোমাদের পদদলিত করে রাখতে পারে না, পারবে না।"

সুবৃহৎ আফ্রিকায় তাঁর ভ্রমণ একদিকে ছিল অন্ধকার ভেদী, অন্যদিকে নবজীবনের চারণ গানে উদ্দীপ্ত। বহু নিগ্রো তাঁর সঙ্গ ও পরামর্শগুণে স্বজাতির উন্নতিকল্পে ক্ষুদ্র ভেদাভেদ ভুলে সারাজীবন লড়াই করে যায়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। 'ট্যাবোরা'তে কয়েকজন গ্রাম্য নিগ্রো তাঁকে ধরে প্রশ্ন রাখে, কি করে নিগ্রোদের শরীরের অবয়ব পরিবর্তন হতে পারে? তিনি মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণ হতে উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন, শ্যাম ও মালয়দেশে এখনও ভারতবাসী, আরব এবং ইউরোপীয়ানদের কাছে কন্যাদান করতে পারলে পিতামাতা সুখী হয়। গ্রামের মানুষও বরকে নানা সুবিধা দিয়ে থাকে। তাঁর পরামর্শমতো সেদিন থেকেই গ্রামে সাময়িক বিবাহ প্রথা চালু হয়। অথচ, পুরনো নিয়মমত ভূমিসম্পত্তির মালিক স্ত্রীলোকেরই রইল।

সেন্ট হেলেনা দ্বীপে থাকত ড্যানিয়েল নামে এক শ্বেতকায়। কালোদের আচার ব্যবহারে রপ্ত এবং যার শরীরে ছিল নিগ্রোরক্ত। এছাড়া আফ্রিকা সফরে ছিল 'তারু' নামে নিগ্রোসঙ্গী। রামনাথ তাদের রাজনীতির শিকার ও শোষণ হতে মুক্ত হওয়ার জন্য নিখুঁত পথের হদিস দিয়েছিলেন। যার প্রেরণায় সেই থেকে তারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিগ্রোদের মধ্যে সর্বত্র স্বাধীনভাবে শুরু করে কাজ। শুধু কি এই? নিগ্রো জাতির মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সরিয়ে, ধর্মের অন্ধত্ব দূর করে যাতে ব্যাপক সমঝোতা-

একতায় গাঁটছড়া বাঁধে এবং সুবিধাজনক 'সোহেলি' ভাষা সকলে সাধারণ ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে, তার জন্য দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন।

হল্যান্ডে আমস্টারডাম শহরের উপকণ্ঠে একটি ব্যারাক বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। এক বিচ্ছু ছেলে বিশ্ব পথিককে 'ব্লেকী-ব্লেকী' বলে 'প্যাঁক' দেওয়া শুরু করলো। মেজাজ খিঁচড়ে থমকে দাঁড়াতেই একজন ভদ্রলোক বের হয়ে সাদর অভ্যর্থনায় ভিতরে ডেকে নিলেন। জানালেন, এটি দুষ্টু ছেলেদের শিষ্ট করার শিশু সদন। ঠাণ্ডা হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'ওঃ তাই বলুন।' ঘুরতে ঘুরতে নজরে পড়ে, এককোণে একটি ছেলে গারদের মতো করা একটি ঘরে আবদ্ধ। বাকি সব ভালো ছেলের মতই ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে। শুনলেন, ছেলেটি নাকি বেতাল ধরনের পাজী। অনেক চেষ্টার পর জানা গেছে, সে নাকি পাক্কা চোরের মত অন্যদের জামা-প্যান্ট ব্লেড চালিয়ে কেটে দেয়। বইয়ের পাতা ছিঁড়ে স্নানাগারে ফেলে আসে। সকলের জন্যে তৈরি সুপে নুন ঢেলে অখাদ্য করে তোলে। জেরবার অসহায় শিক্ষক উপায় জানতে চাইলে, রামনাথ প্রথমে নিজের সাইকেল ছেলেটাকে দিয়ে সঙ্গী করে পাঠালেন আর দুটি ছাত্রকে। আধ ঘণ্টা পরে খুশ্‌মেজাজে ফিরলে জানতে চান—কেমন লাগল?

সানন্দে জবাব দেয়—'বেশ সাইকেল স্যার। ইচ্ছা হচ্ছিল ফুটো করে আনি, কিন্তু ফুটো করলে তো ফিরে আসতে পারতাম না, সে জন্যেই ফুটো করিনি।''

রামনাথ মাস্টারকে বললেন, 'ওষুধ পাওয়া গেছে। এর প্যান্ট-কোট এর সামনেই ছিঁড়বেন এবং ওর খাদ্যে এমনি ভাবে নুন দেবেন যেন খেতে না পারে। খেতে বসে বুঝবে তার যেমন কষ্ট হচ্ছে অপরেরও সেরূপ কষ্ট হয়। আর প্যান্টের ছিদ্র দিয়ে যখন ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকবে, তখন সে বুঝবে ছেঁড়া কোট প্যান্ট পরে অন্য লোক কত কষ্ট পায়।'

অনুমান করা গিয়েছিল, এবার সে দুঃখিত হবে। কিন্তু আশ্চর্য! নুনে ভরা পরেজের পাত্রটি এক পাশে সরিয়ে দিয়ে 'ট্যাবলেট' মার্কা ছোকরাটি 'হ্যা-হ্যা' করে হেসে উঠে কলকল সুরে ঘোষণা করল, ''এমন করে আমাকে জব্দ করা যাবে না। এবার আরো বেশি করে ছেলেদের 'টাইট' দিতে হবে।'' মাস্টার আঁৎকে উঠলেন এবং পরের দিনই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, মতিগতি ফেরানো অসম্ভব মনে করে।

ছেলেটির আচরণে রামনাথের কিন্তু খুবই আনন্দ হয়। কারণ, একমাত্র তিনিই অনুভব করতে পেরেছিলেন, ইচ্ছাকৃত দুষ্টুমীর পিছনে ছিল ভুল। অতএব বহিষ্কৃত ছেলেটিকে বগলদাবা করে এগিয়ে চললেন আন্তর্জাতিক 'দি হ্যাগ' শহরে। এমন মানুষের মহৎ সঙ্গগুণে ছেলেটির ভুল বুঝতে সময় লেগেছিল মাত্র এক মিনিট। আরো তিন দিন সঙ্গ দিয়ে ছেলেটিকে রেল ভাড়া দিয়ে তার নিজের ঘর 'প্যারা'তে পাঠিয়ে দেন। পরে একে অবলম্বন করে 'লা মাতিন' ফরাসী সাপ্তাহিক'এ 'দুষ্টু ছেলের আত্মজীবনী' নাম দিয়ে ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। সব চাইতে বড় কথা, যে দুরন্ত শিশুটিকে পৃথিবীর সবাই দূরে সরিয়ে রাখতে চাইল, তাকেই

রামনাথ আবিষ্কার করেছিলেন তৃতীয় নয়নের সাহায্যে। আপন প্রজ্ঞার আলোকে সম্ভাবনাময় বীজটিকে মেলে ধরতে সাহায্য করেছিলেন মাত্র। আর কি বিস্ময়কর ছিল তাঁর লক্ষ্যভেদের নির্ভুল শক্তি। ছুটিয়ে দেওয়া সেই ছেলেই পরবর্ত্তীকালে পরিণত হয় সে দেশের জাতীয় বীর'-এ।

আফ্রিকা। ভদ্রলোক শ্বেতদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের ইন্ধন জুগিয়ে কেপটাউনে সমস্ত অশ্বেতদের মধ্যে একতার উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন। একদিন এক জনসভায় বোঝাচ্ছেন, 'শুধু অহিংস হলে হবে না। সব প্রতিরোধ বিফলে যাওয়ার পর, দরকার হলে সহিংস পথ গ্রহণ করে সর্বশক্তিতে অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে।' এমন সময় আকস্মিক খবর আসে, এক গর্ভবতী ভারতীয় নারীকে গাড়ির নিচের তলায় দাঁড়াতে পর্যন্ত দেয়নি, গায়ের রং কালো হওয়ার জন্য। উপায়ান্তর না দেখে অতি কষ্টে উপর তলায় উঠতে গিয়ে পিছলে পড়ে মারা যায় এবং মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সকলের সঙ্গে রামনাথও দাবানলের মতো জ্বলে উঠে কর্মপন্থা ঠিক করে দিলেন। পবের দিন শুরু হলো—পদানত নয়, বীরত্বময় প্রতিরোধ তথা আফ্রিকার শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রাম। মিসেস সরকারের রক্তের বেদি মূলে মানবপ্রেমিক আর্তি জানাচ্ছেন, "অভিশপ্ত দেশ মুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হোক।"

দূরদৃষ্টি

ভুবন জুড়ে সীমাহীন ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচিয়ে সোনা করে তুলতে পেরেছিলেন বলেই দেখার চোখ ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। যেন চুলচেরা বিচারে সক্ষম একজোড়া অতি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন দূরবীন। যাবতীয় বিষয় ঘটনার অন্তঃস্তল পর্যন্ত এক লহমায় পড়ে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারতেন, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। অন্ধকারে ফেলে রাখা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্টের মতো নিগ্রোদের সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যৎবাণী—"অনেক ইউরোপীয় পর্যটক এই নিগ্রোদের কাঁধে চড়ে বহু 'সাফারি' করেছেন, অনেক আরব এই নিগ্রোদের রক্তে নিজেদের ছোর৷ লাল করেছে। কিন্তু নিগ্রোরা এখনও বেঁচে আছে। বেঁচে থাকবে। তারা একদিন মানুষও হবে।"

ইউবোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে জাপান তখন থাবা বসিয়েছে চিনের ওপর। রাজত্ব চালাচ্ছে ওদেরই আজ্ঞাবহ চিয়াং কাই শেক। সব দিক থেকে শোষণের চূড়ান্ত। এই সময় ১৯৩১এ রামনাথের চিন ভ্রমণ। সে দেশে ঢুকেই বুঝলেন—'বর্তমানে চীনাদের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব জাগরণ এসেছে। তার ফলে বিদেশী স্বার্থের এই মারাত্মক নাগপাশ হতে মুক্তি পাওয়ার যে সম্ভাবনা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ' চিন দেশ থেকে ফিরে এসে ১৯৩৩ এর জানুয়ারিতে আরও জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন "লাল চীন হবেই হবে"। তাঁর লেখা "মরণ বিজয়ী চীন" (এখনকার 'চিন' শব্দটি আগে লেখা হতো 'চীন'।) প্রকাশ হয় ১৯৪১-এ। আর চিন স্বাধীনতা অর্জন করে নিয়েছিল ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে।

তিনি দক্ষিণ রডেশিয়া থেকে পিটার্সবার্গ, প্রিটোরিয়া, জোহানেসবার্গ,

লরেনসোমার্ক, পিটার মরিটজবার্গ, ডারবান, কেপটাউন, যেখানে গেছেন, সেখানেই ভারতীয়দের বুঝিয়েছেন, নিগ্রোরা কিভাবে ইন্ডিয়ানদের হৃদয়হীন ব্যবহারে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে। আর অর্ধ নিগ্রোরা ইন্ডিয়ানদের সন্ততি হয়েও কিপ্রকারে মানবিকতার প্রাথমিক অধিকার হতেও বঞ্চিত। "এরূপভাবে বুয়রের (শ্বেতকায়) চক্ষে, নিগ্রোর দৃষ্টিতে, অর্ধ নিগ্রোর হৃদয়যন্ত্রে অবাঞ্ছিত মূর্তিতে পরিণত হয়ে হয়ে একদিন যে তাদের দক্ষিণ আফ্রিকা পরিহারই অনিবার্য হবে। তার প্রতিষেধক আজই তাদের আবিষ্কার করা দরকার। সে প্রতিষেধক আর কিছুই নয়—কেবল দরকার তাদের সুখ দুঃখে সমবেদনা, মানুষ বলে তাদের সঙ্গত অধিকার দেওয়া।"

আফ্রিকার প্রতি সভায় ভারতীয়দের তিনি বুঝিয়েছিলেন, 'আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যদি আপনাদের এদেশে বাস করতে ইচ্ছে থাকে তবে নিগ্রো এবং অর্ধ নিগ্রোদের সাথে ঐক্য রেখে বাস করতে হবে। নতুবা জাঞ্জিবারের কাছে পেম্বাদ্বীপে আরবগণ ইন্ডিয়ান মুসলমানদের যেমন করে তাড়িয়েছে, আপনারাও তেমন করে বিতাড়িত হবেন।'

সে সময় অনেকেই তাঁর ওপর বীতশ্রদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হয়েছিল বটে; কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়।

প্রায় সহায়সম্বলহীন হয়েও শুধুমাত্র দেশের মাটিকে ভালবেসে স্বাধীনতার জন্য ভিয়েতনামীদের মরণপণ সংগ্রাম রামনাথকে আমৃত্যু মুগ্ধ করে রেখেছিল। সেই কোন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে দেশটা ঘুরে এসে আপন প্রজ্ঞালোকের গভীরে ডুব দিয়ে "ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর" বইটির ভূমিকায় লিখছেন—"ইন্দোচীনের বীরগণ, তোমরা মানুষের কল্যাণে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছ। তোমাদের প্রশংসা আমার মত নরাধমের দ্বারা সম্ভবপর নয়। তোমাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস এবং অপূর্ব কর্মদক্ষতার ফল পরবর্তী মানুষ ভোগ করুক, এই হল তোমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যার পেছনে পাবার কিছুই নাই, তাকেই বলে নিষ্কাম কর্ম—সেই নিষ্কাম কর্মের সুফল ফলবেই। ভিযেতনামের বিদ্রোহী বীরগণ, তোমরা অমর হয়ে থাকবে।" আজ সারা পৃথিবী জেনেছে—সাম্রাজ্যবাদীদের ঘুম কেড়ে, তাদের নিজ অমর পতাকায় ধরিয়ে দিয়েছে দক্ষিণা বাতাসের দোল।

ভারত ভ্রমণের সময় আসামে বাঙালিদের কার্যক্রম পাঠ করে অভূতপূর্ব প্রজ্ঞা থেকে সাবধান করেছিলেন— 'বন্ধুগণ, এখানে এসে চাকুরীর দাবী না করে যাতে ব্যবসা ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারেন, সে চেষ্টা করুন। দেখবেন এদেশ আপনাদের হয়ে যাবে। অসমীয়াদের দূরে রেখে 'বেঙ্গলী ক্লাব' করলে এদেশে থাকতে পারবেন না। হিন্দুস্থানীর বাড়িতে শনিপূজা হলে অসমীয়ারাও নিমন্ত্রিত হয়, তারা আসে, আনন্দ করে এবং হিন্দুস্থানীদের নিজেদের লোক মনে করে। আপনারা অসমীয়াদের দূরে রাখার চেষ্টা করেন, সেজন্য ঘৃণিত হন। ভবিষ্যতে হয়ত বিপদেও পড়তে পারেন।" কথা কটি বলে গিয়েছিলেন, সেই কোন ১৯৩৩ সালে। আর আজ! 'বিদেশী খেদাও' আন্দোলনের আড়ালে আসামে সাম্প্রতিক বেদনাদায়ক ইতিহাস স্বাক্ষর রেখে গেল,

তাঁর দূরদৃষ্টির অকাট্যতা। সম্ভাব্য সমস্ত রকমের মানব সমাজের কম্পন তাঁর মানস সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ত, আগাম।

সততার দায়

লক্ষ্য করা গেছে, মা বসুমতীর কোলে-কাঁখে বেড়ে ওঠা, সোজা পথের পথিকগুলিকে বেপথু করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। সৎ মানসিকতা তাদের অস্থি-মজ্জা-স্নায়ুর অনু-পরমাণুতে সঞ্চারিত হয়ে এমনই মিলে মিশে যায়—যা দেখে, যা বোঝে, তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করতে বা ন্যায়কে ন্যায়, অন্যায়কে অন্যায় বলতে হৃদয় কখনও কাঁপে না। রামনাথও তাই অনায়াসে বলতে পারতেন— "ভাবের ঘরে চুরি করতে আমি শিখিনি।"

চিন দেশে গুপ্ত সমিতির অনেক যুবক-যুবতীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। সম্পর্ক গড়ে ওঠে স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে। এরই মাঝে একদিন এক ডিটেকটিভ্ এসে আচমকা কিছু প্রশ্ন করে ফেলায় উনিও মাথা ঠিক রাখতে না পেরে সোজাসুজি অনেক কিছু বলে দেন। ব্যস! বন্ধু বিচ্ছেদ। সভ্য-সভ্যারা কাছে আসাই বন্ধ করলে তাঁর সে কি বিচ্ছেদ-বেদনা! বহু ক্ষেত্রে সত্যি কথা বলতে গিয়ে বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই স্বভাব বদলাতে পারেন নি। এ সম্বন্ধে তাঁর সহজ স্বীকারোক্তি—"মুখ খুলেছি তো এমন একটা বক্তব্য মুক্তি পেয়ে গেল, যে সবাই তাতে অসন্তুষ্ট হল। আসলে, আমার দ্বারা মিথ্যা বলা হয় না। কারণ, মিথ্যা বলে দেখেছি ধরা পড়ে যাই। সত্য কথা মনে থাকে, মিথ্যা কথা মনে না থাকার জন্যই ধরা পড়ে যাই। বাস্তবিকই আমি কোন কথাই সাজিয়ে গুছিয়ে সেয়ানার মত বলতে পারি না।"

নিপীড়িত মানুষের অধিকারে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে, বিবেকের কাছে সৎ থাকতে গিয়ে 'মুখফোড়-ঠোঁটকাটা' অপবাদও কম নেননি। আফ্রিকা সফরে একের পর এক সমিতি আহূত জনসভায় ভাষণ দিয়ে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। একদিন ডারবানের সাগর বেলায় ঘুরে বেড়িয়ে উপভোগ করছেন গোধূলীবেলার অপরূপ সৌন্দর্য। এলাকাটি শ্বেতকায়দের জন্য নির্দিষ্ট হওয়ায় অনেকেই কটমট করে তাকাচ্ছে। কিন্তু মুখের ঋজু কাঠিন্যতা দেখে ভরসা করে কেউ কিছু বলতে পারছে না। এমন সময় এক গোয়ানিজ ভদ্রলোক এসে তাঁদের গীর্জার প্রার্থনা সভায় যোগদান করতে অনুরোধ করায় দুর্মুখ জিভ্‌টি সুড়সুড় করে উঠল—'দেখুন, আপনার ভগবান শুধু গীর্জার ঘরের কয়েদী, কিন্তু আমার ভগবান সারা দুনিয়ায় কোটি কোটি মানবরূপে বিরাজিত। এখানে বসে প্রার্থনা করুন যোগ দিচ্ছি। কয়েদ খানায় যাব না। তাছাড়া শুনেছি, আপনারা ভারতীয় ভিন্ন অন্য কাকেও গীর্জায় প্রবেশ করতে দেন না। আগে নিগ্রোদের জন্য অবারিত দ্বার করুন, তারপর আসবেন। নিগ্রোর কি ভগবানেও অধিকার নাই আপনাদের মতে। আর ভগবানের দ্বার রক্ষক আপনারাই!'

এমনতরো আক্কেলগুড়ুম করা বাক্যবাণ কজন আর হজম করতে পারে? ভদ্রলোকও তাই মনে মনে মুণ্ডুপাত করে, মানে মানে কেটে পড়লেন 'স্যুট' করে।

এরকমই সত্যি কথা বলতে গিয়ে কম ফ্যাসাদ-ঝুটঝামেলা ডেকে আনতে হয় নি। তখন চিনে জোর প্রচার—'মহাত্মা গান্ধী ভারতকে স্বাধীন করার জন্য জোরকদমে লড়ছেন'। হোটেল খুঁজে দেওয়ার ফিকিরে এক ছোকরা তাঁকে পৌঁছে দিল বিপ্লবীদের ডেরায়। তাদের প্রথম জিজ্ঞাসাই ছিল, মহাত্মা গান্ধীর কত সেপাই-বন্দুক-কামান আছে? সত্যদর্শীর ঝটিতি জবাব—'কিছুই নাই''। হয়ে গেল! সোজা অন্ধকার ঘরে বন্দি। সারারাত দুশ্চিন্তা-অনিদ্রায় কাটাতে হলো, 'হরি-মটর' চিবিয়ে।

অর্থদর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সাধনদর্শনে বুঝে নিয়েছিলেন 'টাকা মাটি মাটি টাকা'। আর রামনাথ সর্বহারা পর্যটক-দর্শনে অনুভব করেছেন, অর্থ পর্যটককে প্রলোভনের পথে নামিয়ে সব লক্ষ্যের ইতি টানতে চায়।

ঢুকে পড়েছেন ডাকাত অধ্যুষিত চিন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। অমন দোর্দণ্ড ডানপিটে হয়েও আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, টাকাকড়ি হাতে এসে পড়লেই মনের মধ্যে কেমন লোভ এসে উঁকি-ঝুঁকি মারে। আবার, পাছে কেউ এসে তা কেড়ে নিয়ে রিক্ত, হৃতসর্বস্ব করে ছেড়ে দেয় তার জন্য বুক ঢিপঢিপ হতেও ছাড়ান দেয় না। এ জ্বালা হতে মুক্তি পেতে, শেষে 'ধ্যুত্তোর ছাই' বলে, পকেটে আত্যন্তিক প্রয়োজনীয় চার ডলার মাত্র রাখেন। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার বাকি ৯৫ ডলার টেবিলের ওপর ডাকাতদের জন্য রেখে, হাঁফ ছেড়ে নিশ্চিন্তে শুলেন—দরজা হাটখোলা রেখে।

আফ্রিকার ভয়ালগহন অরণ্যপথে চলেছেন। নানারকম ভীতির চলচ্চিত্র মনের পর্দায় দাগ কেটে যাচ্ছে। সাধারণের দানের টাকা পকেটে আছে বলে এবং জন্তু-জানোয়ার ওনাকে খেয়ে ফেললে তাদের দানের সার্থকতা হবে না বলে পকেটের সব অর্থ সঙ্গী নিগ্রোদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে চলতে শুরু করলেন। সাথে সাথে মরণভয়ও দূর হল। আবিষ্কার করলেন, ''টাকা মানুষকে মনেপ্রাণে গরীব করে''।

নাছোড়বান্দা

আমাদের চারপাশে মূলত দুরকমের গোঁয়ার-গোবিন্দ দেখা যায়। এক 'নেগেটিভ' বা নঞর্থক ধরণের। যাদের কাজকর্মের ফল সমাজে বা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সাধারণত হানিকর হয়ে দাঁড়ায়। দুই, যার ফলশ্রুতি 'পজিটিভ' বা সদর্থক। এই শেষোক্ত দলের মানুষগুলিই পৃথিবীতে কিছু কাজের কাজ করে যেতে সক্ষম হয়। কর্ম ও জীবনধারা অনুসরণ করে রামনাথকেও এ শিরোপা দেওয়া চলে, স্বচ্ছন্দে। মানুষটি নিজস্ব বিচারের নিরীখে যা একবার ভাল মনে করতেন, তার প্রতি মরণ-কামড়ে ধরে থাকবেনই। নীতির কারণে যে কোনও মানুষের সঙ্গে মুহূর্তে বিচ্ছেদ ঘটাতে বুক কাঁপত না। সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, এমন রীতিনীতি বা মানুষের বিরুদ্ধে লড়ে যেতেন আদাজল খেয়ে। এমনই একবগ্গা। কিছু জানবার ইচ্ছে হলে, লেগে থাকতেন ছিনেজোঁকের মত। যতক্ষণ না জানতে পারছেন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারতেন

না। দুর্দমনীয় মনোবলের কারণেই সকল প্রতিকূলতা জয় করেছেন, অনেকটা ভোজবাজীর মত।

রডেসিয়ার এক জায়গায় সাইকেল রাস্তা না থাকায় ট্রেনে চলেছেন। ওখানকার শাসকশ্রেণীর মানুষজন ফ্যাসিস্ত ভাবাপন্ন ও সাম্রাজ্যবাদী। এমনই এক শ্বেতকায় ইমিগ্রেশন অফিসারের দল কামরায় উঠেই বোমাটি ফাটালেন—'হ্যালো ব্ল্যাকী (কালো আদমী) কেমন আছো?' যাঁকে বললেন, তিনি কি এহেন ভাষা-মাধূর্য জিন্দেগীতে হজম করার বান্দা? মোটেই না। সুতরাং বিদ্যুৎগতিতে ভেসে এল পাল্টা প্রশ্ন—'Ye, How do ye do?' অর্থাৎ তোরা কেমন আছিস? ঘটনার আকস্মিকতায় ঘাবড়ে বুঝতে না পেরে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দেখে জুড়ে দিলেন—'হ্যালো শ্বেত নিগ্রো, কেমন আছ'? ওরা চিৎকার করে প্রতিবাদ করল—'আমরা নিগ্রো নই, ইউরোপীয়ান'। রামনাথ চোখে ছদ্ম বিস্ময় রেখে দুহাত মেলে কাঁধজোড়া 'স্রাগ' করে সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'সে কি! ব্যবহারে তো কই সে পরিচয় পেলাম না!' বুদ্ধির দৌড়ে অপদস্থের একশেষ হয়ে. আর কথা না বাড়িয়ে সকলে কাজে মন দিল গুট্‌গুট্‌ করে।

সংস্কারের উর্দ্ধ্বে

ছোটবেলায় দেখেছি, মানব-সেবায় উৎসর্গীকৃত এক সাধকের আঙিনায় লেখা ঝুলত—''ওরে ও ন্যালাখ্যাপা, জাতিতে কি আসে যায়? হৃদয় মহৎ যার সেই তো মহাশয়।''

রামনাথ বিশ্বাস এমনই একজন সংস্কারমুক্ত কাম্য মহাশয়। সারাজীবন লড়াই চালিয়ে গেছেন সব রকমের কুপ্রথা, সংস্কার ও মানুষে মানুষে বিভেদের বিরুদ্ধে। এ সম্বন্ধে নিজের সোচ্চার ঘোষণা—'ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলাম বলেই, বর্ণবৈষম্যকে ভাল করে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি সেই পাপ বর্ণবৈষম্যকে যেমন ঘৃণা করি, ভারতের অন্তঃস্থলের কালো দাগ জাতিভেদকেও তেমনি ঘৃণা করি।' যে সমস্ত ঝোঁক বা প্রবণতা মানুষকে এক পা অগ্রসর হতে সাহায্য করে না, বরং বদ্ধ জলাশয়ের পঙ্কিলতায় আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ফেলতে চায়, তার বিরুদ্ধে আজীবন দাঁতে দাঁত দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। এ সম্বন্ধে নিজেই বলেন গলা তুলে—'চিরাচরিত অভ্যেসের দাস হওয়া আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কাজেই আমি পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি।'

বিবেকানন্দ খ্যাত চিকাগো পৌঁছে ঢোঁক গিলে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়, তাঁর সেই বিশ্বখ্যাত বক্তৃতা মঞ্চটি এখানকার বেশির ভাগ মানুষই জানে না। শহরটি বিখ্যাত বরং খুন ও ডাকাতির জন্য। এ হেন শহরে কালা আদমীর জন্য বাসস্থান যোগাড় করতে কালঘাম ছুটে যায়। শেষে সাদাদের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াই.এম.সি.'তে স্থান পান যে ঘরটিতে,-তার নম্বর ১৩। ভবঘুরে অনেক চেষ্টার পর রুমটিতে ঢোকার সুযোগ পেলেন এইজন্য—আমেরিকানরা 'অপয়া'র প্রচ্ছন্ন ভীতিতে ১৩ নম্বরটিকে এড়িয়ে

চলে। ম্যানেজার বিদ্রূপের স্বরে, 'কি করবেন, নেবেন?' জিজ্ঞাসা করায় বিশ্বপথিক সারা মুখে স্মিত হাসি ছড়িয়ে জবাব দেন, 'আমার কাছে আর এসবের মূল্য কি আছে? জন্মই তো পুরো তেরশো সালে, হ্যাঃ' বলে গটমট করে ঢুকে পড়লেন অপয়া-অবহেলিত ঘরটির মধ্যে, নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করতে।

তখন চলছে আফ্রিকা সফর। সংবাদপত্র মাধ্যমে আগেই রটে যায়, ''মানবপ্রেমিক ভূপর্যটক আসছেন।'' এর ফলে, পোর্ট এলিজাবেথ ও কেপটাউনে জাহাজ হতে নামার সময় এতো অসংখ্য মানুষ অভ্যর্থনা জানাতে আসে যে দমবন্ধ হবার অবস্থা। শুনতে থাকেন, সব মানুষের ক্ষোভের কথা। একের পর এক সভায় যোগদান করে প্রাণ খুলে ভাবধারার আদান প্রদান ঘটিয়ে তাদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন, স্থির সংকল্পে। অথচ মাসখানেক আগে কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে পণ্ডিত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান এসেছিলেন। কিন্তু আহূত হয়েও, কোনরকম অশ্বেত প্রতিষ্ঠানের সভায় যোগদান করেন নি। কারণ, যেখানে হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট চর্মকার ও সেক্রেটারি নাপিত, সেখানে আপ্যায়িত হতে হয়তো তাঁর সংস্কারে বেধেছিল। কিন্তু, এজন্য ভারতীয়রা দারুণ মর্মাহত হন। এটা ঘটনা। কিন্তু রামনাথের (যদিও দেশে তাঁরা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ এবং সবচাইতে বড় কথা, জমিদার শ্রেণী) সে সংস্কারের বালাই নেই। জোর করে দাবিয়ে রাখা, চির অন্ধকারে বিসর্জিত আফ্রিকাবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা ও নিদারুণ কষ্টে অভিভূত হয়ে মনের মধ্যে তাঁর তখন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো ভেসে উঠেছে বিশ্বকবির বাণী—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।।
সনাতনী মনোবৃত্তির একমাত্র পরিণতি চিরদুঃখের শ্মশানে—
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যু মাঝে হবে তবে চিতা ভস্মে সবার সমান।।

চিনের রাজসিংহাসন দেখে ফিরছেন। বিস্মিত গাইড প্রশ্ন করে, 'আমি বরাবর দেখছি, ভারতবাসীরা এটি দেখে মাথা নত করে। তুমি করলে না কেন?' কঠিন স্বরে জবাব ভেসে এল—'আমি ওসব পছন্দ করি না'। পরক্ষণেই মনে মনে ভাবছেন, ''যে দেশে ভক্তের ভগবান বর্তমান. ভক্তির আবরণে ঢাকা দিয়ে সে দেশের লোক না করতে পারে এমন কাজ নাই।' ভূপর্যটক কখনও কারুকে প্রণাম করতেন না। বরং সম্মান দিতেন মানুষকে ও তার কাজকে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় (মহাত্মাজীর অহিংসা আন্দোলনের আদি পরীক্ষা কেন্দ্র) ডারবানের ফিনিকস্-এ গেছেন মহাত্মা গান্ধির বাড়ি। পুত্র মণিলাল গান্ধী ও পুত্রবধূ অভ্যর্থনা করেন। রামনাথ জেনেছেন, এবং দেখেওছেন, ভারতীয়রা গান্ধীজির

বাড়িতে গিয়ে অনেকটা সময় গদগদ হয়ে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু প্রথাবিদ্রোহী দু মিনিটে সব কিছু দেখে বেরিয়ে এসে বলেছেন—'মহাত্মাজীকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তা বলে যেখানেই তিনি পদক্ষেপ করেছেন, সে মাটি, সে কাঠ, সে ইট-পাথরও অমরাবতী বনে গেছে, আর সেখানে গিয়ে ভূমি লুণ্ঠিত হয়ে মাথা ঠুকতে হবে, এমন অন্ধবিশ্বাসের দাস আমি কোনকালেই ছিলাম না, আজও নাই।''

অথচ, বিংশ শতাব্দী পার করেও মানুষ তার মনের জল-জঙ্গলে অন্ধ সংস্কারকে কেমন আশ্চর্যজনক তোয়াজ করে চলেছে, তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মানুষ-রক্তের স্বাদে পাগল এক বিরাট হিংস্র বাঘ। প্রায় দিনই কোনও না কোনও গ্রাম থেকে ওঠে হাহাকার ধ্বনি। সে কি ট্র্যাজিক ও মর্মন্তুদ করুণ কান্নার রেশ! প্রতিরোধের জন্য সকলের সব চেষ্টা বিফলে গেলে সরকারের শরণাপন্ন হতে হয়। সব দিক খতিয়ে সরকার থেকে তখন ঘোষণা করা হয় বাঘটি 'নরখাদক', এবং সেইমতো ওটাকে মারবার জন্য আসে যোগ্য শিকারী। অভিজ্ঞ শিকারী তার অব্যর্থ নিশানায় মেরেও ফেলে। এই পর্যন্ত ঠিকঠাক চলে হিসেব মতো।

কিন্তু, এর পরেরটাই সব হিসেব গুলিয়ে দেওয়ার! ঠেলায় করে যখন বিশালকায় নিশ্চল মরদেহটি বয়ে আনা হয়, তখন সেটি ঘিরে ধরেছে কাতারে কাতারে গ্রামবাসী। হাত জোড় করে সেকী কৌতূহলী এবং শ্রদ্ধা-ভক্তি জড়ানো দৃষ্টি তাদের অনেকের চোখে-মুখে। যেন জাতীয় বীরের প্রতি সম্মান জানাতে কেউ আর নেই ঘরের মধ্যে। এখানেই শেষ নয়। নিথর জীবটির গায়ে-পায়ে-মাথায় সিঁদুর লেপটে একের পর এক পুরুষ ও মেয়েরা মাথা ছোঁয়াচ্ছে সেই হিংস্র থাবায়। যে থাবার কুটিল-ভয়াল নখ থমকে দিয়েছে তাদের প্রিয়জনের হৃৎস্পন্দন। এ ভিড় কাহানিতে আছে তারাও—যাদের স্বামী অথবা আত্মীয় পরিজন শেষ নিঃশ্বাস নিয়ে সোজা ঢুকে গেছে ঐ শয়তানের পেটে।

মধুর আলাপন

এমনিতে খুব একটা সাজিয়ে গুছিয়ে ভেবেচিন্তে কথা বলতে পারতেন না। যেমন যেমন মনেব কোণে উঁকি দিত, তেমনই বের হয়ে আসত গলগল করে। আলাদাভাবে চেষ্টাকৃত ভাষা বা বাচনভঙ্গীর প্রকাশ ওনার দ্বারা কখনওই সম্ভব ছিল না। এমনই মাটি ঘেঁষা মানুষ। যা ওনার জানার বাইরে, অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত নয়, তা কিছুতেই বানিয়ে বলতে পারতেন না। ফলে, সহজাত প্রকাশ ভঙ্গীটিই ছিল কতকটা চাঁচাছোলা। পালিশের উজ্জ্বলতা সে ভাষায় থাকত না বটে, তা বলে, কিছুতেই ভদ্রতার মাত্রা ছাড়িয়ে যেত না। কেবল, কোনও রকম ধাক্কা খেলে, বাক্যালাপের ধরণটাই পাল্টে যেত। মুহূর্তে নিয়ে যেতে পারতেন সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির পর্যায়ে। যা রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকরসের ভিয়েনে হাজির করতো, অনায়াসে।

ভিয়েতনামে সাইগনের হোটেলে ভোরবেলা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। এমন মিষ্টি

সকালটা মাটি করতে, কড়া নেড়ে মহম্মদ নামে এক দোভাষী ডেকে তোলে। 'এক্ষুণি আসছি' বলে চললেন বাথরুমে। এই সুযোগের ফাঁকে স্থানীয় বিপ্লবীদের সহযোগী একটুকরো কাগজ তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছে। যাতে লেখা আছে, 'নবাগত দোভাষী আসলে ফরাসি পুলিশের স্পাই'। কর্তব্য স্থির করে নিয়ে, এলেন বেশ কিছুটা পরে। ঘরে ঢুকেই একগাল হেসে শুরু করলেন—''স্নান করে আসতে হল বলে কিছু মনে করবেন না। চলুন রেস্তোঁরায় যাই। জানেনই তো আমি গরিব লোক। আজ আপনার সাহায্য নিয়ে সকালের খানাপিনা সারা যাক'।

মহম্মদের চোখ চড়কগাছ হল। বিস্ময়কণ্ঠে বললেন, 'খানা তারপর পিনা! এ কেমন কথা? আপনি তবে মদ্যপায়ী?'

—'আরে যত ভবঘুরে দেখবেন, তাদের কোনটার চরিত্রে দোষ নাই বলুন তো? এখন চলুন দেখি রেস্তোঁরায়।'

মহম্মদ চমকে আঁতকে উঠে 'আদাব-আরজ্' জানিয়ে মান এবং ট্যাক সামলাতে হুমড়ি খেয়ে বিদায় নেন।

দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনায় জাহাজঘাট হতে জাপানের 'সিমনোসেকী' শহরে প্রবেশ করা মাত্র পুলিশ কর্তৃক নজরবন্দি হলেন। মনমেজাজ ভেঙে পড়ার উপক্রম হল, ভাবী কু-সম্ভাবনায়। পরদিন সকালে পুলিশ অফিসার এসেই বত্রিশপাটি দাঁত বের করে যেন কতকালের চেনার মতো প্রথম সম্ভাষণ করল—তুই সিঙ্গাপুর থেকে কি করে এতদূর সাইকেলে এলি রে?

সাইকেল বাবুর মেজাজ সপ্তমে চড়লেও ত্বরিত করণীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে ততোধিক সহজ সুরে জুড়লেন—আরে, আর বলিসনারে দুঃখের কাহিনী। সেই দুঃখের কাহিনী না শোনাই ভাল। এখন খোলসা কর দিকিনি, ব্যাপারখানা কি?

—আচ্ছা, ঠিক করে বলতো, আমাদের দেশে তোর আসার কারণ কি?

—আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করার ইচ্ছা রে।

—আমাদের দেশে কিছুই দেখবি না?

—দেখব আর কি বল? কাল রাতেই সব বুঝতে পেরেছি। মাছ ভাজাতে তোদের দেশে নুন দেয় না। গুড়ে চোবায়। এমন দেশে দেখার কি আছে বলতো? তবে আজ সকালবেলা এই পথ ধরে কতকগুলি স্ত্রীলোক যেতে দেখলাম, বাস্তবিকই তারা সুন্দরী।

—তোর চাই না কি?

—কি করে আর চাইব বল? ভয়তো হয়, গুড়ে চোবানো মাছের মতই শেষে যদি 'ওয়াক-থু' করতে হয়!

ঠেকায় পড়লে এমনি 'ফট-ফটাস্' জাতীয় চমকানো কথোপকথন ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী।

প্রাণ নিয়ে

এই সুবিশাল ভ্রাম্যমান জীবন ফুলে ফুলে বিছানো সুখের হবে না, সেটাই

স্বাভাবিক। কিন্তু যেটা বিশেষ লক্ষ্যণীয়—চরম মুহূর্তে কেমন উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে অথবা কারুর সাহায্যে নিজের জীবন বাঁচিয়েছেন, বারবার। দক্ষিণ ভিয়েতনামে 'তম্‌কে' হতে যেদিন 'তোরেন' নামক স্থানে যান, সেদিন এক অপ্রত্যাশিত বিপদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছিল। অনেক কষ্টের পর পাহাড়ের মাথায় উঠে একটু বিশ্রাম নিয়ে এগিয়ে চললেন। সুশীতল বাতাস বয়ে চলেছে। দুপাশের অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছেন। এমন সময় চমকে দেখেন, পথের পাশে এক উদ্ভিন্ন যৌবনা যুবতী মধুর ইঙ্গিতে আবাহন করছে। কয়েক মুহূর্তমাত্র। থমকে দাঁড়িয়ে যেইমাত্র অনুভব করলেন—'যাত্রাপথে যুবতীর হাসি কেবল পর্যটকের পক্ষে ফাঁসি', সঙ্গে সঙ্গে পড়ি কি মরি করে ছুটিয়ে দিলেন গাড়িটিকে। অতিরিক্ত উত্তেজনার জন্য হাঁফিয়ে পড়ায় নিরাপদ দূরত্বে থামলেন। পথের ধারে বিশ্রামার্থ ঘর পেয়ে বাঁশের মাচায় উঠে শুতেই ঘুম আসতে দেরি হল না। কিছু পরে ঘুম ভাঙতেই আক্কেল গুড়ুম। দেখেন, কতকগুলি লোক ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র সমেত চারপাশে ঘিরে অপেক্ষা করছে। ওদের নিয়মানুযায়ী ঘুমন্ত অতিথিকে মারতে নেই বলে। চরম অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করেই বিদ্যুৎ লহমায় লাফ দিয়ে সাইকেলে চড়া মাত্র সকলে তুলে ধরল তাদের মারাত্মক অস্ত্র। কিন্তু ছোঁড়ার মুহূর্তটুকুর ফাঁকে ততোধিক ক্ষিপ্রগতিতে আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে গেছেন, নাগালের বাইরে।

দক্ষিণ আফ্রিকার 'মেসিনা' গ্রামের নদীতে নেমে হাত মুখ ধুতে গিয়ে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। মাত্র পঞ্চাশ হাত দূরে সাঙ্ঘাতিক হায়না লকলকে জিভ বার করে নদীর জল খাচ্ছে। মাথায় বিদ্যুৎ শিহরণ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। কি করা কর্তব্য, ভেবে নিচ্ছেন একলহমায়। কিন্তু কিছুই করতে হল না শেষ পর্যন্ত। বন থেকে ভেসে আসা বিচিত্র শব্দে হায়না মশাই পরিষ্কার 'সুড়ুৎ' করে পালায়।

বর্ণ-বৈষম্যের পীঠস্থান দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতপল্লীতে নিঙড়ে নেওয়া ক্লান্তির মধ্যে আশ্রয় ও খাবারের সন্ধানে ঢুকতে গিয়ে খোয়ারের চূড়ান্ত হতে হয়। পচা ডিম মুখে ছুঁড়ে মেরে 'হাউ নাউ ব্ল্যাক বুব' (এখন কেমন কালো বেকুব) বলে দলবল নিয়ে তাড়া করেছে। বেগতিক বুঝে 'থু-থু' করতে করতে এক লাফে সাইকেলে বসে 'চোঁ-চাঁ' পালাতে পথ পান না।

আর একদিনের ঘটনা। সাদাদের বিভেদ নীতিতে ব্যতিব্যস্ত এবং কালোদের আতিথেয়তায় ধন্য; এরকম একটা সময়ে, আফ্রিকার পাহাড়ী জঙ্গলে ঝরণার জল খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, একটা পাথরের ওপরে হেলান দিয়ে। হঠাৎ দেখেন একটা বিশালাকৃতির কালো ভালুক আঁচলা ভরে ঝরণার জল খেয়ে বন কাঁপানো তীব্র 'হুক্' আওয়াজ তুলল। সেটা তৃপ্তির কি অতৃপ্তির বোঝা গেল না? তবে দেখা গেল, কুচকুচে রোমশ হাত দুটি বাড়িয়ে 'আয় আমার বুকে আয় ভঙ্গিতে' থপ্ থপ্ করে আওয়াজ তুলে দ্রুত ধেয়ে আসছে। গতিক ভাল নয় বুঝে, নিজস্ব বাহনটিকে ঝড়ের বেগে চালু করে যা ভাবলেন তা তাঁর নিজস্ব ভাষাতেই তুলে দেওয়া যাক—"একবার করে আড়চোখে চেয়ে দেখি, আর হু-হু শব্দে চলি। কালো হলেও ভালুকের আলিঙ্গন

অভিপ্রেত নয় একেবারেই। দু'পাশের পাখীকুলের করুণ কাকলী, দেবদারুর শিরশির শিহরণ লক্ষ্য করবার অবকাশ নাই। বড় একটা গাছে বসে বন মানুষটা 'হুম-হুম' করছে। ভেংচি কাটছে হয়তো, কিন্তু কে সেদিকে নজর দেয়।''

সঙ্গীসাথীসহ আফ্রিকার ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটছেন, রাত্রে। ভৌতিক নিস্তব্ধতার মধ্যে একসময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সকলে। আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যায়, চারিদিকে অনেকগুলি বাতি জ্বলছে। অভিজ্ঞ সহকারী পীতম সিং চটজলদি বন্দুক তুলে দমাদম কতকগুলি ফায়ার করতেই সব নিভে যায়। জানা গেল একদল চিতাবাঘ ক্রমশ মরণফাঁদে ঘিরে ধরছিল।

আরও সামনে চলেছেন। সকলের গতি তখন নিঃশব্দপ্রায়। কিছুর গন্ধ পেয়ে একজন নিগ্রো সাথী তাড়াতাড়ি শুকনো পাতার ওপর পেট্রল ঢেলে আগুনের লেলিহান শিখা তুলতেই কোথা থেকে যেন ভূমিকম্পের টাল-মাটাল ও 'হুড়মুড়-দুড়দাড়' আওয়াজ। বুনো হাতির দল পালাচ্ছে। ওরাও আসছিল মানুষকটিকে পায়ের তলায় পিষে মারতে।

বালবালা থেকে গাওএন্ডা (GWANDA) চলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা মুখী। হঠাৎ গাছের মড়মড়ি, ভূমিকম্পের থরহরি কম্প। থমকে দাঁড়াতে হলো, মাথায় নিয়ে চরম বিপদ। সামনেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড! একপাল বুনো গরুর মাঝে প্রকাণ্ড এক সিংহ। পশুরাজের একটা অন্তত গরু চাই ই। অন্যদিকে গরুগুলি প্রাণ বাঁচাবেই। দরকার হলে সিংহটাকে ফুঁড়ে ফেলে। আমাদের ইনি বাহনসমেত চক্রব্যূহের সামনে পড়তেই শিউরে উঠলেন। শুধু রোমহর্ষক হুঙ্কারধ্বনি! একজনেরও খেয়াল হলে রামবাবুকেই আগে পেড়ে ফেলবে। সুতরাং পড়িমরি করে সাইকেল ছোটালেন হাওয়ার বেগে।

আমেরিকা সফরে সাংবাদিক ধরণে তথ্য যোগাড় করতেন। সে সময় ও দেশে ভারতীয় হিন্দুদের দারুণ উৎকণ্ঠা ও ভীতিতে কাটাতে হতো। কারণ, ইমিগ্রেশন বিভাগ কর্তৃক নানা ছুতোনাতায় ও'দেশ থেকে বহিস্কাবের নির্দেশ পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাঁর তথ্য যোগাড় করার ভঙ্গি দেখে ভীত হিন্দুরা মনে করে 'ব্যাটাচ্ছেলে নিশ্চয়ই ইমিগ্রেশন বিভাগের হিন্দু কর্মী।' অতএব, শত্রু খতম করতে নিয়োগ করে পেশাদার খুনী। একদিন রাত হবে তখন বারোটা। নাইট 'শো'তে সিনেমা দেখে 'হাওয়ার্ড স্ট্রিট' ধরে ফিরছেন। হঠাৎ পিছনে কে পিস্তল ঠেকাল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন, সাক্ষাৎ সমনরূপী এক আমেরিকান। রামনাথ বরাবরই জানতেন জীবন তুচ্ছ। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হয় তা 'অমূল্য সম্পদ'। কোথা থেকে হাজির হল আপৎকালীন উপস্থিত বুদ্ধি। পুরোপুরি নিগ্রো স্টাইলে বললেন, 'বস, গিভ্ মি এ বাট' অর্থাৎ সিগারেটের বাকি পোড়া টুকরোটা দিয়ে বাধিত করুন। আমেরিকানটি কয়েক মুহূর্ত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়েছিল মাত্র। তারপরেই সপাটে বেশ কয়েকটি লাথি কষিয়ে এবং পোড়া টুকরোটা হাতে দিয়ে বললো—'অসভ্য নিগ্রো এখান হতে চলে যা, তুই আজ খুব বেঁচে গেলি'। রামনাথ পাশের রেস্তোঁরা থেকে নিগ্রো প্রথায় কফি চেয়ে টুপিটা আরও টেনে ফুটপাথের ওপর খেতে বসলেন। যাওয়ার সময় খুনিটা পিঠে

আবার একটা লাথি ঝেড়ে বলতে বলতে চলে যায়— 'এই গাধাটা আজ বেঁচে গেল। শয়তান হিন্দুটা গেল কোথায়? ওকে পাওয়া মাত্র হত্যা করতে হবে।'

মালয়েশিয়ায় 'মূয়ের' শহর থেকে 'মালাক্কায়' যেতে নদী পার হতে হবে। ফেরিবোটের মাঝি অপেক্ষা করছে রবার বাগানের তিনজন অস্ট্রেলিয়ান সাহেবের জন্যে। ওরা আসবে তিনটে আলাদা মোটরে চড়ে এবং গাড়িশুদ্ধই পার হবে। বোটটি ছিল এমনই বড়-সড়। নৌকাজীবি শুনিয়ে রাখে, শ্বেত দেবতাদের সঙ্গে পার হতে হলে দশ সেন্ট মুদ্রা লাগবে। 'তাই সই' ভেবে, আগে ভাগে উঠে এক কোণে দাঁড়ালেন। কিন্তু সাহেবরা পৌঁছেই কালা আদমীকে দেখে ঘোষণা করে বসল— 'আমরা এই নিগারের সঙ্গে পার হবো না।'

মলয় মাঝিটা ছিল খুব বেপরোয়া ডানপিটে। সে তাড়াতাড়ি বললে—'তুই যদি অর্ধ ডলার দিস, তোকেই আগে পার করে দেব।' পর্যটক রাজি হতেই বোট হু-হু করে ছেড়ে চলল। দেবতারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। পারে নামিয়ে অর্ধ ডলার ট্যাঁকে গুঁজে কান্ডারী মেজাজে বাহাদুরী নেয়—'অন্য মাঝি হলে আজ আর পার হতে হোত না, তোকে নামিয়ে শাদাগুলোকে আগে পার করতো।'

কিন্তু এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। ওরা ছিল অস্ট্রেলিয়ান শ্রমিক। বিদেশে আশাতীত রোজগার করে দিনরাত ফূর্তি নিয়ে থাকে এবং কথায় কথায় মাতাল হয়। উপরন্তু অশ্বেত ওদের চোখে 'মনুষ্য-পদ-বাচ্য' নয় । শ্রী বিশ্বাস যখন খেয়া পার হয়ে পথ ধরেছেন, তখন তিনটি মোটরের তিন মাতালই জিঘাংসায় ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে চাপা দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নরহত্যা তখন তাদের কাছে খেলা মাত্র। সেই সর্বনাশা খেলা থেকে যখন অভূতপূর্ব উপায়ে নিজেকে বাঁচাতে হিম্‌সিম্ খাচ্ছেন তখন শেষ মোটরচালককে মুখ বাড়িয়ে বলতে শুনলেন—'ফরচুনেট' । রামনাথের সেই মুহূর্তে বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর 'আমরা ও তোমরা' মনে পড়ে—...'তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ...সুখ তোমাদের ideal, দুঃখ আমাদের real .....তোমাদের ভাল আমাদের মন্দ, ও আমাদের ভাল তোমাদের মন্দ, সুতরাং অতীতের আমরা ও বর্তমানের তোমরা, এই দু'য়ে মিলে যে ভবিষ্যতের তা'রা হবে— তাও অসম্ভব।'

রোজনামচার টুকিটাকি

যেহেতু ভ্রমণের প্রথমদিকে ভাগ্য ঈশ্বর ইত্যাদিতে বিশ্বাস ছিল, সেইহেতু ভোরে ঘুম ভাঙলেই প্রথম কাজ সূর্য প্রণাম ও নাম স্মরণ। খোলা আকাশের তলে অথবা নিরাপদ আশ্রয়ে যেমনই হোক না কেন, শয্যা ছেড়ে টুকিটাকি কাজের পর পেট এবং বাহনটির যত্ন-আত্তি সেরে চাকা দুটি চালু করে দিতেন 'ফুল মোশানে'। ফূর্তিতে মেলে দিতেন উদাত্ত কণ্ঠ—"আমি উচ্চ আশায় পাল তুলেছি হরি কৃপা পবনে ভেসে যায়"।

সারাদিনে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল (৪৮.২৮০২০কিমি.—৮০.৪৬৭০০ কিমি.) পর্যন্ত সাইকেল ঠেলে তবে ক্ষান্ত হতেন। বিশেষ প্রয়োজনে কখনো কখনো একশো

কিলোমিটারের সীমা ছাড়িয়ে চালাতে হয়েছে। ভ্রাম্যমান জীবনে সবচাইতে বেশি সাময়িক বিশ্রাম নিয়েছেন চায়ের দোকানে। কারণ আর কিছুই নয়, হরেক রকম মানুষের মিলনস্থল এখান থেকে অর্থ ছাড়াও প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা যেত, অনেক সহজে। দুপুরবেলা পথের ধারে হোটেল বা কোনও গৃহস্থ বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজ এবং সাময়িক বিশ্রামের ব্যবস্থা। খবর নিয়ে যদি জানা যায় যে সন্ধের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছে কোথাও রাত কাটানোর ব্যবস্থা মিলতে পারে, তবেই দুপুরে গাড়িটি ফের চালু হোত। নচেৎ, ঐ দুপুরের ঠিকানাতেই ঘাঁটি গাড়ার ব্যবস্থা পাকা করতেন। আবার এমনও হয়েছে—দিনের বেলা যাতায়াতের অবস্থা অনুকূল না বুঝলে রাতভোর চলতেন নিস্তব্ধ জনহীন রাস্তা দিয়ে। সাইকেলের টিম্‌টিম্ করা তেলের আলো কতটুকুই বা পারে অন্ধকারের বুক চিরতে। সে তুলনায় খোলা আকাশের তারাগুলি অনেক বেশি প্রিয়সঙ্গী মনে হোত। মনদরিয়ায় খোস মেজাজী বাতাস লাগলে গলা ছেড়ে ধরতেন প্রিয় বৈষ্ণব সঙ্গীত—"এমন মধুর হরিনাম নিতাই কোথায় পেয়েছে।" কখনও বা শ্যামাসঙ্গীত। তেমন হলে, রাতের বুকে কম্পন তুলতেন চারণ কবির গানে।

খাদ্য তালিকায় সবচাইতে প্রিয় ছিল মাংস। তারপর মাছ। তবু মাছ-ভাতের 'কম্বিনেশনে' যেমন খুশি হতেন, তেমন আর কিছুতেই নয়। খিচুড়িতে দারুণ আসক্তি। এটি ছিল তাঁর বিলাসভোজনের অন্তর্গত। তবে, ঘন দুধের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে গরম রুটি পেলে 'ডুব দে মন কালী' বলে ঝাঁপ দিতেন। আর ভাল দুধের পায়েস দেখলে, উড়ে যেতে ইচ্ছে হোত।

ইউরোপ ভ্রমণে বুদাপেস্ত থেকে ভিয়েনা যাওয়ার পথে জনৈক ভদ্রলোকের ব্যবস্থাপনায় ওঠেন এক ফার্ম হাউসের বিশ্রামাগারে। সাথী 'জন লিকো' ভেতরে খবর দিতে গেলে পরিব্রাজক তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে ভাল মানুষের মতো বসে রইলেন। পরিচয়ে খুশি হয়ে ফার্মের মালিক ঘন দুধের সাথে 'ওটামিল' ও প্রচুর চিনি সহযোগে সুস্বাদু পায়েসের প্লেট ধরলে 'সুড়ুৎ' করে সাবাড় করলেন। মালিক দোভাষী লিকো'র মারফৎ যখন জানতে পারলেন পরেজ ভাল লেগেছে, তখন প্রশ্ন করলেন, অতিথি এরূপ কয়প্লেট পরেজ খেতে পারবে? মুহূর্তে উত্তর মিলল—'ষোল প্লেট'। তক্ষুণি আদেশ দিয়ে ১৬ প্লেট ভর্তি করে পর পর টেবিলে সাজিয়ে সাগ্রহে নজর রাখেন। মানীর মান রাখতে পর্যটক মশাই প্লেটগুলি উজাড় করতে লাগলেন টপাটপ্। নির্বিকার চিত্তে সমস্ত খেয়ে বিরাট একটা ঢেকুর তুলে বড় এক গ্লাস জলও নামিয়ে দিলেন, ঢক্‌ঢক্ করে। এহেন ভোজনলীলা দেখে বীরের সাথে আলাপের ইচ্ছায় মালিক-কন্যা এগিয়ে এলে মোটেও পাত্তা দিতে প্রস্তুত হন না আমাদের পেটুক ঠাকুর। তবে মনে রাখতে হবে, মানুষটি আদৌ 'একালষেঁড়ে' ছিলেন না। বরং উল্টো। একা খাওয়ার প্রবৃত্তি ছিল না। আশেপাশে সকলের সাথে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খেতেই ভালবাসতেন।

সুদীর্ঘ পরিক্রমায় বহু মিনিট, ঘণ্টা ও অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছিলেন—ক্ষিদে যখন

তিষ্ঠুতে দেয় না, তখন ভাল ভাল খাবারের কথা মনে হলে সে আগুন আরও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। অতএব, অনেক মাথা চেলে উনি ভাবতে সুরু করতেন কুইনাইন, নিমপাতা, চিরেতা এসবের কথা। তা হলেও কতক্ষণ সেই মারণ-ক্ষুধা এভাবে দমিয়ে রাখা যেত শেষ পর্যন্ত, সেটা অবশ্য জানা যায় নি। ভদ্রলোকের চিন্তা করবার শক্তি ছিল অসাধারণ। কেবল, যখন খাবার কিছুতেই আর মিলত না, ক্ষিদের চোটে সে শক্তি নাকি তখন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ত।

শোয়ার আগে ডায়েরিতে দিনলিপি লেখার অভ্যেস ছিল। কিন্তু সেই যুগে তাঁর যাত্রাপথ কতটা কঠিন ছিল, তা কল্পনা করাও কঠিন। বিদেশে অমানুষিক কষ্ট-অত্যাচার সয়ে সয়ে এমনকি বহুবার মার খেয়ে অনেক সময় মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার মতো হয়েছে। চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে গিয়ে দিনলিপি লিখতে ভুলে যেতেন। লিখলেও, দিন তারিখ সব ওলট-পালট হয়ে যেত। সে সময় কখনও বেভুলে হাসছেন—একাকীত্বের হাসি। কখনও বা ভেঙে পড়ে মনে হোত, এত কষ্ট করে কি লাভ হবে? এই অমূল্য ত্যাগ স্বীকারের সার্থকতা কোথায়? পরক্ষণেই 'মহান কর্তব্যের গুরুদায়িত্ব' মনে পড়লে আবার প্রেরণা ফিরে পেতেন। একঘেয়ে চলায় মাঝে মাঝে যখন উন্মাদ অবস্থার শিকার হয়ে পড়তেন, তখন মনের মাঝে আশা জাগিয়ে তুলতেন—ঐ তো আসছে নতুনগ্রাম, জনপদ বা শহর। যেখান থেকে পাবেন অনাস্বাদিত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা। নয়া দেশের মানুষের সূত্রে মিলবে নব নব ধ্যান-ধারণা। যার জন্য সব কিছু পিছনে ফেলে এই বেরিয়ে পড়া। যা তাঁর একান্ত কাঙ্খিত। একটানা প্যাডেল ঘোরানোর ধকল ও ক্লান্তিতে মাঝে মাঝে মোক্ষম 'হোমসিক্' এর কবলে পড়তে হোত। তখন মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করে দেশের কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন—এ রোগ এমনই মারাত্মক যাতে পর্যটকের সর্বনাশ ত্বরান্বিত হয়।

ভ্রমণ জীবনে তাঁকে অনেকবার কাটাতে হয়েছে বন্দিদশায়। একঘেয়ে যন্ত্রণাময় অসহ্য সময় কাটানোর জন্য বিচিত্র পথ আবিষ্কার করে নিতে হয়েছে। সেরকম দুটি সহজ উপায়ের মধ্যে প্রথমটি হোল, ভগবান বলে একটা বৃহত্তর জীবের সৃষ্টি করে আরাধনা করা। আর তা ইচ্ছা না হলে, মনকে—দেহের মন ও প্রাণের মন দু'ভাগে ভাগ করে, একের সঙ্গে অন্যটির কথা বলানো। তিনি দ্বিতীয়টিই অনুসরণ করতেন। কোনও দিন হয়ত খারাপ রাস্তার উপর দিয়ে সাইকেল চালাতে হয়েছে অনেকটা দূর পথ। অত্যধিক পরিশ্রমে দূর্বল হয়ে শরীর ভেঙে পড়তে চাইলে নিজস্ব এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় শরীরকে সতেজ করে নিতেন। প্রথমে শবাসনের ভঙ্গিতে শুয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নাকের দিকে চেয়ে থাকলে দুর্বলতা কমতে থাকে। তারপর, হাত-পা মিনিট দশেক শিথিল করে শুয়ে থাকলেই পূর্ণ বিশ্রাম। এছাড়া আর একটি অভ্যেস ছিল, স্নান না করে থাকতে পারতেন না। যে সময়েই পৌঁছান, যতই ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হোন না কেন, চেষ্টা করতেন—যেভাবে হোক গুছিয়ে স্নান সেরে সতেজ হয়ে নেওয়া।

ভাষা সমস্যার বিপদ হতে উদ্ধার পেতে যখন যে দেশে যেতেন, সেখানকার

ছাপাখানায় গিয়ে সে দেশের ভাষায় বিজ্ঞপ্তি পত্র বা ভিক্ষাপত্র ছাপিয়ে নিতেন, পোস্টকার্ডের আকারে। সেগুলি আঞ্চলিক মানুষকে বিলি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল, কিছু অর্থ প্রাপ্তিযোগের আশা এবং 'উল্টা বুঝলি রাম' হতে নিষ্কৃতি মেলা। সেই অঞ্চলের মানুষজনেরা বুঝে নিত, লোকটা ঠিক-ঠাক পর্যটক।

কোনও অঞ্চলে পৌঁছে সেগুলি একে একে বিলি করে হয়ত চেয়ার টেবিল টেনে কফি বা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন। তা পড়ে কেউ এগিয়ে এসে সাহায্য করতো। অনেকে তাঁর ভ্রমণ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে নানা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে আনন্দ পেত। কেউ কেউ সেগুলি ফেরৎ দিয়ে নীরবে চলে যেত। আবার দু-একজন হয়তো অপমান করতো নির্মমভাবে। ফলে, মাঝেমধ্যে অবশ্যই তা মনকে পীড়িত করতো। কিন্তু উপায় কি? বেরিয়েছেন যে নিঃস্ব নীতিতে অগাধ বিশ্বাস রেখে।

কয়েকটি নিজস্ব ত্রুটি সম্বন্ধে ছিলেন বরাবরই সজাগ ও সোচ্চার। কোনও বিশেষ অঞ্চলে পৌঁছানোর জন্য সাইকেল চড়া রাস্তা না থাকায় সময় বিশেষে ট্রেন, নৌকো বা জাহাজের সাহায্য নিতে হয়েছে। তা বলে, মাটির স্পর্শে চাকা দুটি গড়াতে না পারায় বিবেকের দংশন কম পেতেন না।

মনের সায় না থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীর কথায় বা কাজে নীরব সমর্থন জানাতে হয়েছে। কারণ, সেক্ষেত্রে অনন্যোপায়। তাদের সাহায্যের আত্যন্তিক প্রয়োজন ছিল। সুস্থ যাত্রার স্বার্থে বিবেকের দংশন-পীডন সহ্য করতে করতে হাঁফিয়ে উঠতেন সে সময়টুকু। এমনিতে মিথ্যা কথা বলা তাঁর দ্বারা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু, কারুকে বাঁচাবার দরকার হলে চেষ্টা করেও তা করতেন।

উপদেশ শুনতে শুনতে মানসিক শক্তি অনেক সময় দমে যেত। তাই, উপদেশ একদম বরদাস্ত করতে পারতেন না। বলতেন —'তত্ত্বকথা আমার নিকট তিক্ত ওষুধ'। তবু, পর্যটনের স্বার্থে সকলের কথা শুনতেন। কিন্তু কাজ করতেন নীরবে। একেবারেই নিজের ইচ্ছেমত। এছাড়া নিজেকে ছোট করা হয় বলে, অনুনয়-বিনয় করার অভ্যেস একেবারেই ছিল না। মাথা উঁচু রাখার এমনই সহজাত বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কখনও কারুর পায়ে লুটিয়ে পড়তে পারতেন না। সে যতো বড় লোকই হোক। অথচ, কাউকে কিছু ফরমাস করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হয়ে অনায়াসে 'অর্ডার' করতেন। ভদ্রলোকের ছিল এক ধরণের মোক্ষম গোঁ; যে পর্যন্ত ইপ্সিত কাজটি না করতে বা বিষয়টি না জানতে পারছেন, সে পর্যন্ত লড়ে যেতেন, একেবারে আদা-জল খেয়ে। সে জন্যেই সর্বত্র চালু নাম— 'গোঁয়াড় রামা'। তার উপরে রাগটি ছিল মোক্ষম ধরণের। একদম চন্ডালে। একবার মাথায় চড়লে আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। একটা কিছু করে তবেই ক্ষান্ত।

আরও একটি স্বীকৃত ত্রুটি—"সেই দোষটি হল, অপরের কথা সহজে বিশ্বাস করতে রাজি নই"। আসলে, এই স্বীয় উক্তির পিছনে ছিল প্রতিদিনের অগণিত তিক্ত অভিজ্ঞতার মূল্যে যাচিয়ে নেওয়ার স্বভাব। বরাবর জানা; ভারতে জোর গুজব, চিনেরা আরশোলা খায়। ছোটবেলায় পাঠশালার গুরুমশাই এর মুখে শুনেছেন,

চিনের প্রাচীর এতই চওড়া পাশাপাশি ১৭টি ঘোড়া চলে এবং যথেষ্ট খোলামেলা জায়গা দখল করে সাতটি ঘোড়া উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে পারে টগবগিয়ে। কিন্তু মনের মধ্যে একটা দ্বিধা-সন্দেহের খোঁচা বরাবর কাজ করে যেতই। বড় হয়ে সাধ মিটিয়ে নেন। সরেজমিন তদন্তে দেখেছেন, দুটোই বাজে কথা।

বাস্তবে, তাঁর মধ্যে পল্লবগ্রাহী স্বভাব একটুও নেই। যা কিছু বৈশিষ্ট্য তা একেবারেই নিজস্ব অননুকরণীয় তুলির টানে রাঙানো। সেই অনুসারে, যখন যেখানে পৌঁছান, নিজের কথা ভুলে সে দেশের লোক বনে গিয়ে সেখানকার কথাই কেবল মাথার মধ্যে বনবনাতে থাকে। দেখা গেছে, এমনভাবে কোনও অঞ্চলের রীতিনীতি ও মানুষজন সম্বন্ধে অনেক গভীরে যাওয়া সম্ভব। এবং অর্জিত অভ্যাসের মাধ্যমে যেতেনও।

সাধারণ মানুষের স্বভাবই হল, উদ্ভট ব্যাপার-স্যাপারে অতি সহজে বিশ্বাস করা। তিনি কিন্তু সে পাত্র মোটেও না। অনেক কষ্ট করে সিঁড়ি ভেঙে আকাশ ছোঁয়া চিনের প্রাচীরে উঠেছেন। এমনিতেই পরিশ্রমে রীতিমত ক্লান্ত। এমন সময়ে একজন নিজেকে মোগল বংশধর পরিচয় দিয়ে মহাপুরুষের ভঙ্গিতে সামনে উদয় হলেন। ক্রমে খাপ খুলে মেলে ধরেন সাজাহান প্রমুখ মোগল সম্রাটদের মূল্যবান দলিল। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। অর্থাৎ ভাল দামে বিক্রি-বাটা সেরে বেশ কিছু প্রাপ্তিযোগ। রামনাথ প্রথমে একনজর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মোগলের চোখে চোখ রেখে, পরক্ষণেই সেগুলি খপ্ করে ধরে হাওয়ায় ছুঁড়ে দিলেন। ঠগের নিজস্ব কঞ্চিগাছাটি কেড়ে নিয়ে পট্ করে সাইজমত ভেঙে তাড়াতাড়ি মেপে দেখলেন, প্রাচীরটির উপরিভাগ নয় হাত মাত্র অর্থাৎ সাড়ে তের ফুট চওড়া। যার উপর দিয়ে গুজব অনুযায়ী, সাতটা ঘোড়া খোস মেজাজে পাশাপাশি কখনোই ছুটতে পারে না। এটি ওনার 'রোজনামচা'র রীতিতে নিশ্চিৎ হওয়ার দরকার ছিল। ওদিকে তখন ঘটনার আকস্মিকতায় সাজাহান উত্তর-পুরুষের হয়ে গেছে বাক্‌রোধ! বিস্ফারিত নেত্রে বিহ্বল-স্থির।

এছাড়া অচেনা-অজানা ভাষা প্রচলিত দেশে বছরের পর বছর ঘুরে হাজারো অসুবিধের মধ্যে কাজ চালিয়ে নিতে হয়েছে। আর তা করতে করতে এমনই 'ম্যাজিক্যাল' পর্যবেক্ষণ শক্তি আয়ত্বে এনেছিলেন যে, মানুষের মুখ দেখেই 'থট্‌রিডিং' অর্থাৎ সে কি ভাবছে তা বুঝে ফেলার দুর্দান্ত ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। ফলে প্রতিপক্ষের চমকে ওঠার মুহূর্তেই উনি প্রয়োজনীয় কাজটুকু সেরে ফেলতে পারতেন। এছাড়া, প্রতিদিনের চলার পথে তাঁর এক বিশেষ নীতি ছিল, ঘুমন্ত মানুষকে জাগ্রত না করা। এতগুলি বৎসর বিদেশে ঘাম ঝরিয়ে লক্ষ্য করেছেন— "কোনও পুলিশ নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগায় না। কিন্তু যারা ধর্ম মেনে চলে তারা নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করা আমোদ মনে করে।"

গোলক দর্শনে অসীম আগ্রহ থাকলেও ভদ্রলোকের নৃ-তত্ত্বে ছিল চমকে দেওয়ার মতো গভীর জ্ঞান। ভূ-তত্ত্ব ও মাইনিং ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে আগ্রহ-অনুরাগ যে কত সুদূর প্রসারী, যাযাবর জীবনে বহুবার তার স্বাক্ষর রেখেছেন। তখন ভ্রমণের শেষ পর্যায়।

আমেরিকা সফরে ব্যস্ত। সাধারণ অনেকের ধারণা 'বিল্ডিং' এর ভারে নিউইয়র্কআস্তে আস্তে একদিন ডুবে যাবে। এ সম্বন্ধে তাঁকে ঘিরে ধরে বাজিয়ে দেখতে চাওয়ায় অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে বুঝিয়েছিলেন, তা কোনও দিন হবার নয়। এ চিন্তা বাতুলতা মাত্র। তখন সকলে বুঝতে পারে, ভদ্রলোক শুধু মাটির উপর ঘুরেই সন্তুষ্ট নয়, মাটির নিচেকার সংবাদও রাখেন। খুশি হয়ে বিখ্যাত 'রকফেলার' বিল্ডিং'এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাঁর নিজের বাড়িতে ভূপর্যটককে আপ্যায়িত করেন ভূরিভোজে।

জীবন দর্শনে নারী

একবগ্গা মানুষটি মহিলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু মানসিকতা পোষণ করতেন, একটু অন্য ধরণের। শৈশবে তা প্রোথিত থাকলেও আসলে চিন দেশের নারী জাতি তাঁর ধ্যান-ধারণাকে আমূল পাল্টে দেয়। খোঁজ খবর করে জানতে পারেন, অনন্যমনা কর্মী মাদাম সান ইয়াৎ সেন দেশের অসংখ্য মানুষকে ভেসে যাওয়া থেকে অভূতপূর্ব উপায়ে ফিরিয়ে এনেছেন, মুক্ত পৃথিবীতে। চিনা নারীর নিরহঙ্কারী কাজ, সেবা, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব রামনাথের মনে আমৃত্যু গুণ গুণ করে গেয়ে উঠত।

মালয়েশিয়ার মালাক্কায় বিপ্লবী 'ত্রিয়দ'দের সাহায্যে এক অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করেন। শুধু তাই নয়। অপহরণকারী সে মলয় মুসলমানের ঘরে বসেই মেয়েটিকে শুদ্ধি করে পুনরায় হিন্দু ধর্মে এনে হিন্দু ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তবে শান্তি।

'লালচীন' বইতে লাইচিন নামে মেয়েটি অর্ধগৃধ্নু জমিদারের পোষা সেবাদাসী হতে বাধ্য হলেও শেষ পর্যন্ত কেমনভাবে প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলে উঠল, তার মর্মস্পর্শী ছবি এঁকেছেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষটি নারী জাতিকে সম্মান দিতেন 'মায়ের জাত' হিসেবে। এমনকি তাঁরা তাঁকে অপমান করলেও। তা বলে, কোনও পুরুষকে নয়। বাপস্‌রে! গর্জে উঠতেন সিংহবিক্রমে। আবার এটাও লক্ষ্য করার মতো, নারী জাতিকে শ্রদ্ধা-ভক্তির কারণে অন্ধ 'সার্টিফিকেট' দিয়ে বসেন নি। সেক্ষেত্রে তুল্য মূল্যর বিচার বিশ্লেষণে ভাস্বর হয়ে উঠেছে তাঁর ঋজু বক্তব্য, ''মানবের মেরুদন্ড মানবী। মানবীই পুরুষের শক্তি—পুরুষের রক্ষাকবচ। এই মানবী যদি দানবী হয়, পুরুষেব রক্ষণাবেক্ষণে সদা প্রসারিত কল্যাণি হস্তের অভাবে তখনই জাতির মেরুদন্ড ভেঙে যায়। স্বাধীন জাতির পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরই মা-বোন, গোলাগুলি নয়। তার দানবী তান্ডবলীলায় ভাসিয়ে দেয় জাতিকে অন্তহীন সমুদ্রে।''

প্রতিবাদী

দর্শনধারী রামনাথের আলোচনা প্রথমেই সারা হয়েছে। সে রূপ এক নজরে বাইরে থেকে দেখে নেওয়ার। কিন্তু যা অনুভূতির পর্দায় পর্দায় দাগ কাটে, তা হলো—তাঁর প্রতিটি কথায় ও কাজে একটা প্রচন্ড ঝলসে ওঠা তেজস্বী মনুষ্যত্বের ছাপ পাওয়া যায়। এটি একমাত্র বজ্রের সঙ্গে তুলনীয়। যার জন্য, উদ্যত অস্ত্র হাতে ভয়ংকর

দুর্বৃত্তও তাঁর সামনে অনেক সময় খেই হারিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ত। চিনে একবার ডাকাতে সর্বস্ব লুটে নিতে এসে উল্টে কিছু গুঁজে দিয়ে ফিরে যায়। এমন বহু ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত এসেছে প্রায় 'ছপ্পড়' ফুঁড়ে।

সাংহাই কোয়ানের গ্রীক দোকানে বসে রামনাথ মেজাজে জাপানি ঘোল খাচ্ছেন। এমন সময় দুজন মাঞ্চুকো সৈনিক এসে বেজায় চালে দোকানে 'আসাই বিয়ার' অর্ডার দিল। অথচ কি আশ্চর্য! খোস মেজাজে খেয়ে দেয়ে গা-ঝাড়া মেরে উঠে পড়ে। কিছুতেই দাম দেবে না। উল্টে দোকানদার একজনকে জাপটে ধরতে গেলে বাকিজন মাথায় চালিয়ে দিল খালি বোতল। রক্তাক্ত কান্ড! আর কি চুপ করে থাকা সম্ভব? রামনাথ ঝাঁপিয়ে পড়লেন সংহার মূর্তিতে। বাবাজীরা পালাতে পথ পায় না। পৃথিবীর অতিথি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বেচারী দোকানদারের সেবায়!

একবার পিকিং-এর পথে টিয়েনসিনে'র হোটেলে ঢুকতে ব্যস্ত। এমন সময় দেখলেন, জাপানের লেজুড় চিয়াং কাই শেকের চর একটি নিরীহ চিনা যুবাকে চাবুক পেটাই করে চলেছে, নিষ্ঠুরভাবে। চোখের সামনে এতবড় অন্যায় দেখা পীড়িতের সাথী রামনাথের কুষ্ঠিতে লেখা নেই। সোজা গিয়ে লোকটিকে বললেন রোখা-উত্তেজিত কণ্ঠে —'You whip him I whip you'. অর্থাৎ—'তুমি যদি একে চাবুক মারো, আমিও তোমাকে মারবো। লোকটি ক্রোধান্ধ হয়ে ঘুরে রামনাথের ওপর চাবুক তুললে বিদ্যুৎগতিতে রামনাথ কেড়ে নিয়ে লোকটির গায়ে দাগিয়ে দিলেন 'সপাং' করে। হৈ-হৈ-রৈ-রৈ' হুইসেলের মাঝে প্রতিবাদী অক্ষত অবস্থায় ঢুকলেন হোটেলে।

তখন কর্মক্ষেত্র সিঙ্গাপুরে। এক সন্ধ্যায় ব্রিটিশ সৈন্যদের গান-বাজনার জমপেস্ অনুষ্ঠান চলছে। চাকরীর সুবাদে রামনাথও আমন্ত্রিত। দিলখুস মেজাজে মুখে পাইপ ধরিয়ে উপভোগ করছেন মনোরম অনুষ্ঠান। এক সৈনিক শিল্পী অসাধারণ সুর তুলে বাজিয়ে চলেছেন বেহালা। শেষ হতেই মনের অন্তস্তল থেকে রামনাথ হাততালি দিয়ে উঠতে এক জাঁদরেল ইংরেজ অফিসারের অসহ্য লাগে। চট্ করে সরে এসে ফস করে বলে বসে—তোরা এ জিনিস দেখেছিস?

একে ছাইচাপা বিপ্লবী মন। তার ওপরে জাতীয়তাবোধে সদা জাগ্রত। ঘা খেয়ে দাবানলের মতো জ্বলে ওঠে। জানে না তখন কোনও 'ছিরি-ছাঁদ'—হ্যাঁরে! তোরা যখন বনমানুষ ছিলি, কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেতিস, তখন আমাদের দেশে এ ধরণের বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার হয়ে গিয়ে উপভোগ করেছি।

ক্ষিপ্ত মিলিটারি অফিসার পিঠে একটা চড় কষিয়ে দেওয়া মাত্র রামনাথ পাইপের জ্বলন্ত আগুন সাহেবের মুখে ঢেলে মুখপোড়া করে দিয়ে ফিরলেন নির্বিকার মেজাজে। যেন কিছুই হয় নি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ তখন চরমে। চারিদিকে সাদাদের 'হু-হুঙ্কার' ভাব। ভূপর্যটক জাহাজে চড়ে 'স্মোকিং রুম'এ ঢুকেছেন। চমকে এক লাল মুখো সোজা এসে বলে বসল—'এই, তুই বেরো এখান থেকে।'

বুক চিতিয়ে চোখে জ্বলন্ত স্থির দৃষ্টি রেখে পাল্টা প্রশ্ন রাখলেন—'কেন?'

স্পর্ধা দেখে গলায় সমস্ত ঘৃণা উজাড় করে 'ডার্টি নিগার' বলে গলা ধাক্কা দিতে উদ্যত হওয়ামাত্র স্তব্ধ হতে হয় রামনাথের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে—'দাঁড়া জানোয়ারের বাচ্ছা! তোরও টিকিট আছে, আমারও আছে। তোকেও যেমন কেউ পয়দা করেছে, আমারও তাই। কোথাও লেখা নেই—তোর আমার অধিকার আলাদা। তুইও মায়ের দুধ খেয়েছিস, আমিও খেয়েছি। তবু কোন দুধের উপকার বেশি, দেখ্' বলেই পলকের মধ্যে সপাটে চালিয়ে দিলেন 'বিরাশী সিক্কার' এক ভয়ঙ্কর ঘুঁষি। নাক ফেটে সাদা মুখ লালে লাল হয়ে কুপোকাৎ।

রামনাথের চোখ, মুখ, হাত , পা এবং মন সমস্তই অন্যায়ের প্রতিবাদে সদা মুখর। আফগান-ভারত সীমান্তে হাজির হয়েছেন কাস্টমস্ হাউসে। অফিসারটি ভারতীয়। পাঠানদের পাসপোর্টগুলি প্রায় না দেখেই শীলমোহর করে ছাড়ছেন। কিন্তু তাঁরটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করায় অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে মনে মনে বললেন, 'একটা গোলাম অন্য একটা গোলামকে স্বাধীন দেশে যেতে দেখতেও রাজী নয়।' কাজের ধরণ দেখে ক্রমশ অসহিষ্ণু অবস্থা বাড়তে থাকে। বহু পরে শীলমোহর পড়তেই ফুঁসে উঠলেন—'আঘাত লেগেছে নিশ্চয়ই, আমাকে আটকে রাখতে পারেন নি বলে? দাসসুলভ মনোবৃত্তির এটাই বৈশিষ্ট্য। নিন ছাড়ুন' বলে, পাসপোর্টটা ছিনিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। হতবাক্ অফিসারটি কাজে মন দেন নীরবে।

সমুদ্রযাত্রায় বোম্বাই থেকে আফ্রিকা যাওয়ার জন্য জাহাজের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। বাকি আছে কেবল ডাক্তারী পরীক্ষা। নির্দিষ্ট দিনে পৌঁছে দেখেন থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা শুধুমাত্র আন্ডার প্যান্ট পরে খালি গায়ে সব লাইন দিয়েছে। পরীক্ষা হবে অস্বাস্থ্যকর চালা ঘরে। আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় রামনাথের ব্রহ্মতালু আগুন। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, এক দালাল হাজির। 'দশ টাকা ঘুষ দিলে ব্যবস্থা হয়ে যাবে' বলে ফেলায় রামনাথ এমন মোক্ষম শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ করেছিলেন যে, বেচারী ফিরে তাকাবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল সেদিন। এরপর মেজাজে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্যান্যরা ব্যঙ্গ করে 'ফার্ষ্ট ক্লাস ' অথবা 'সেকেন্ড ক্লাসের' যাত্রী হতে বলায় (''সাহেব বাহাদুর, ইধার সে থার্ড কেলাসকা ফাসিন্দার খাড়া হ্যায়, সেকেন্ড কেলাস আউর ফাষ্ট কেলাস ইধার মে নাহি হ্যায়'') হুঙ্কার ছাড়লেন 'চুপরও ষ্টুপিডের দল'! তাঁর প্রলয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে নেমে এল ভৌতিক নীরবতা। নিস্তব্ধতার মাঝে ইউরোপীয়ান ডাক্তার গট্‌মট্ করে ঢুকেই বিদ্রোহী মানুষটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সহকারী ভারতীয় ডাক্তারদের প্রশ্ন করলেন, 'একে জামা-কাপড় খুলে দাঁড়াতে বলা হয় নি?'

তাদের হতচকিত মুখ দেখে নিজেই সামনে হাজির হয়ে রুখে উঠলেন—'শোন ডাক্তার। যদি এরা কাপড় খুলে দাঁড়াতে বলতো, তবে আমি তাদের কি বলতাম জানি না। তোমাকেই বলছি, কাপড় আমি খুলব না। আমি তোমার মতই সভ্য এবং ভদ্রলোক। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটেছি বলে পচে যাই নি।' ডাক্তার অন্যদিকে তাকিয়ে 'আনফিট্' বলে সাহেবি কেতায় ঢুকে গেলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার

পর যখন হাতে 'সার্টিফিকেট' এল, তখন চমকে উঠে দেখেন—ওটাব ওপর ম্যাজিকে লেখা হয়ে রয়েছে 'ফিট্'।

আর চিন্তা কি? দিলখুস মেজাজে গুণগুণ করতে করতে সিঁড়ি ভেঙে জাহাজে উঠছেন। হঠাৎ পথরোধ করে রক্তচক্ষুতে একজন বলে উঠল, 'পাশপোর্ট কোথায়? বাড়িয়ে ধরতে লোকটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তা থেকে অনেক কিছু টুকে নিতে থাকলে বেরিয়ে এল ঠোঁটকাটা বাক্যবাণ—'আটকিয়ে রাখতে পারবে না। লিখে রাখ যত পার'। জাহাজে ওঠার পর মুখ হতে থুথু ফেলে বলেছিলেন, 'লোকটা আমারই স্বদেশবাসী'।

তখন 'ট্যুর' করছেন চিনদেশে। রাত থাকতে বেরিয়ে পড়েছেন পিকিং শহরের দিকে। বেশি সময় নিয়ে শহরটিকে ঘুরে ফিরে দেখার ইচ্ছে সেদিন। সঙ্গী একজন রাশিয়ান অপরজন জার্মান। আবছা অন্ধকারে লক্ষ্যে পড়ে একটা লোক বেমালুম রাস্তার তার কাটছে। রামনাথের তো মাথার ঘিলু ফুঁসে উঠল। ধরবার জন্য বলিষ্ঠ পায়ের তাল ঠুকতেই, বুদ্ধিমান জার্মান সঙ্গীটি বোঝায়—'লোকটা মাঞ্চুকো হলে আপনার মাঞ্চুরিয়া যাত্রায় সর্বনাশ হবে। আর যদি বিপ্লবী হয়, তাহলে এখানেই আপনার ভবলীলা সাঙ্গ হবে। কি দরকার ঝুট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া।'

বোঝানোর ধাক্কায় 'তা বটে' বলে ঢোক গিলে শুরু করেন পথ চলা। কিন্তু বুকে পাষাণ ভারের কষ্ট, এতো বড় অন্যায় চোখের সামনে দেখেও হজম করতে হল বলে।

তখন, বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় কংগ্রেসীদের খুব প্রভাব ও প্রচার। 'টাংগা' থেকে নীল পদ্মের জন্মভূমি 'কুল-মানজার' বা মান্দার পর্বত দেখতে চলেছেন। সঙ্গে আছে নিগ্রো পথ প্রদর্শক 'তারু'। কিন্তু ভারতীয় চেকার সাহেব 'তারু'কে রামনাথের সঙ্গে কিছুতেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠতে দিতে রাজি নয়। তার জন্য চাটাই বিছানো তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থা। অনেক বুঝিয়েও যখন কিছুতেই পারা গেল না, তখন নিজ সংহারমূর্তি ধরে হুঙ্কার ছাড়লেন—'তোমার আইন তোমার কাছে রাখ। নতুবা মেরে হাড় ভেঙে দেব।' চেকারবাবু 'কংগ্রেসী' বলে গালি দিয়ে কামরা ত্যাগ করে মানে-মানে।

হল্যান্ডে গেছেন, নিজের আত্মপরিচয় গোপন রাখা এক বাঙালি প্রফুল্ল চক্রবর্তীর অফিসে। নামী হীরা মুক্তার ব্যবসায়ী। ছদ্ম ইংরেজ নাম 'ম্যাকলিয়ড'। রঙ যেন ফেটে পড়ছে। অফিসের বয় থেকে কেরাণি সকলেই জানত, তাদের সাহেব সাহেবই। রামনাথ যখন ভিজিটিং কার্ডে পরিষ্কার বাংলায় লিখে দিলেন নাম-ধাম-উদ্দেশ্য, কেরাণী লাফ দিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাকলিয়ড কি এ ভাষা বুঝবেন?'

রামনাথ নির্লিপ্ত কণ্ঠে জানালেন, 'নিশ্চয়ই বুঝবেন। এ ভাষা অনেক যত্নের সঙ্গে তাঁর বাবা শিখিয়েছিলেন।' কেরাণী কার্ডটি ব্যাজার হয়ে দ্বাররক্ষককে ধরায়। দ্বাররক্ষক ততোধিক বিষণ্ণ বদনে চলে গেলে রামবাবু চেয়ারটি টেনে মেজাজে বসে পড়লেন। তা দেখে কেরাণীর চোখ উঠল কপালে।

'বুয়র' জাতের দ্বারোয়ানটি ফিরে এসেই লাল চোখে ফোঁস করে উঠল,

—তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তুমি চেয়ারে বসলে কেন?

—আমার ইচ্ছা, তোমার আপত্তি আছে না কি?

—নিশ্চয়ই আপত্তি আছে, আর কখনও বসবে না। বুঝলে? কালো লোকের চেয়ারে বসতে নেই।

নাঃ! আর সহ্য করা যায় না। এতক্ষণে দুঃসাহসী বাঘের হুঙ্কার ছাড়লেন,

—চুপ করে থাক সাদা কুকুরের বাচ্চা, আর একটি কথা বলবি তো দু'ঘা লাগাব। এটা দক্ষিণ আফ্রিকা নয়, আম্‌স্টারডাম্!

দ্বারোয়ানের দেমাকি অভিজ্ঞতার খাতায় এমনতরো প্রতিরোধের ভাষা-ভঙ্গি লেখা ছিল না। সুতরাং থতমত খেয়ে পথ করে দিল, এক পাশে সরে গিয়ে। আমস্টারডমের সুপ্রীম কোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর দেখেছেন। এবার সিনেমায় গিয়ে ডাচদের বাহাদুরীপূর্ণ প্রাচীন জাহাজ তৈরীর কলাকৌশল যুক্ত একটি 'ফিল্ম' দেখে ঢুকলেন চিড়িয়াখানায়। আপন খেয়ালে সব কিছু দেখে বেড়াচ্ছেন। আচমকা একটা ডাচ্ সোঁ করে এগিয়ে এসে বলে বসল—তুমিও কি চিড়িয়াখানার জানোয়ার? আর যায় কোথা! রেগে 'টং' হয়ে ছুঁড়লেন মোক্ষমতীর—'নারে, তোদের দেশটাইতো চিড়িয়াখানা, দেখতে এসেছি সেজন্যই।' এখানেই শেষ নয় কিন্তু। এর পরেও পাঠককে নিজস্ব মতামত জানিয়ে তবে ক্ষান্ত—'এরূপ বেয়াড়া লোক অনেক দেশেই থাকে এবং অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা ঘাড়ে এসে পড়ে। এসব লোককে কোন মতেই প্রশ্রয় দিতে নেই।'

রামনাথ আমেরিকার দরিদ্র ঘিঞ্জি পল্লী 'গ্যাথো'তে ঘুরতেন নিগ্রো সেজে। নিগ্রোদের পোষাকে ও চালচলনে। দরকার হলে রাত্রেও। ডেমোক্রেসীর দেশ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দেশ আমেরিকাতেও তিনি দেখেছেন, 'দারিদ্র্যের জন্য তিনজন রাস্তায় মরে পড়ে আছে,' লেখা হয়নি। সংবাদপত্রে বের হয়েছে— 'গ্যাথোয় আজ তিনজন লোক 'হীট ওয়েভ' সহ্য করতে না পেরে মারা গেছে।' এখানে দেখেছেন বাঁচার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেমনভাবে ইহুদীদের মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে। সামান্য একটুকরো রুটির জন্য বচসা ঝগড়া করছে। বৃদ্ধ বৃদ্ধকে বলছে, 'আজ আর কিছু খেতে পাই নি।' এত যন্ত্রণার্ মধ্যে দেখলেন, খ্রিস্টধর্ম প্রচারকরা আমেরিকার জাতীয় পতাকা টাঙিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পাপীদের পরিত্রাণার্থে ডাকছে, কিন্তু খেয়ে বাঁচবার জন্য কেউ একটি পয়সাও নিরন্নদের দিচ্ছে না। তখন আর থাকতে না পেরে সামনে গিয়ে চোখা ভঙ্গিতে তেড়েফুঁড়ে উঠলেন—কালো লোকের আবার ঈশ্বর কি? আপনাদের মত শ্বেতকায়দের সেবা করা, আপনাদের কথা মেনে চলাই কালোদের ধর্ম। আপনারাই হলেন আমাদের ঈশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে 'লেকচার-টেকনিকে' পাপী উদ্ধার করার সমাধি ঘটে গেল।

সাউদাম্পটান থেকে জাহাজে চড়বেন, আমেরিকা যাত্রায়। কালো আদমী দেখে অফিসার চমকে উঠলেন। কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে চলল একের পর এক জেরা। শেষে, 'সঙ্গে কত টাকা আছে?' প্রশ্ন করায় রামনাথ ফুঁসে

উঠে বললেন, 'শুধু আমার বেলা এই অশিষ্ট প্রশ্ন কেন? পরাধীন দেশের লোক বলে?' অফিসার তখন থমকে কয়েক পলক দেখে নিয়ে তুলে ধরলেন টেলিফোন। অন্য প্রান্ত থেকে নিশ্চিত হয়ে শোনালেন আশ্বাসবাণী— 'পরাধীন জাতের মধ্যেও সিংহের জন্ম হয়। চলুন আপনার পিঠের ঝুলিটা এগিয়ে দিই' বলে, সত্যি সত্যিই ঝোলাটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বীরের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন।

রক্তমাংসের মানুষটি সারাজীবনে কখনও মরণভয়ে ভীত না হলেও একবার মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য সে চিন্তায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। ব্রহ্মদেশে 'মৌলমিন'এর পথে চলেছেন। পাহাড়ী পথে হঠাৎ দেখা যায় ভীষণ আকৃতির, চোয়াল উঁচু, ছোটো কপালযুক্ত দুজন 'কোরিন' উপজাতির মানুষ ভয়ঙ্কর রামদা হাতে এগিয়ে আসছে তাঁরই দিকে। বিশ্বপথিক মুহূর্তের জন্যে ভাবলেন, 'সভ্য পৃথিবীর অনেকটাই দেখা বাকি রয়ে গেছে। হয়ত আর হোল না।' কিন্তু না। 'চেষ্টা করে দেখাই যাক না' চিন্তায় পরক্ষণেই কর্তব্য স্থির করে পালিয়ে যাওয়ার বদলে এগুতে থাকলেন ওদের সামনে। একই ধরণে। কেবল চোখ দুটির চাহনি করে নিয়েছিলেন বাঘের চেয়েও হিংস্র। বিপদ আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে সরে পড়ল।

শৈলেন্দ্রনাথ দে নামে এক বিপ্লবী যুবককে সঙ্গে করে ভারত ভ্রমণে বের হয়েছেন। কুচবিহারের পথে আশ্রয়ের বন্দোবস্ত এক ওভারসিয়ারের বাড়িতে। ডালভাতের ব্যবস্থা হলে দেখা যায়, সহযাত্রী শৈলেনকে ঘরের ভিতর খেতে বসিয়ে পরিব্রাজককে বেড়ে দেওয়া হয়েছে বাইরে। চোয়াল শক্ত হলেও ভ্রাতৃতুল্য যুবকের স্বার্থে খেতে বসলেন। এর উপরে খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র থালাটা ধুয়ে দিতে বলায় চকিতে বুট দিয়ে থালাটা 'সুট' করে এক টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—'আরি হ্যালার হ্যালা(শ্যালকের শ্যালক) হেই মশয়, আর একটাও ফালতু মাত মাতইন্নাতো (কথা বলবেন না তো)। আমি কেউর বাপর চাকর নয় যে থালা মাজতে বইমু। এই নেউকা এক টেকা। সকালবেলা কেউরে দিয়া ধুইয়া লইবা।'

চিরকাল একের নম্বরের গোঁয়ার-গোবিন্দ। কথ্য ভাষা ছিল রীতিমত গেঁইয়া ঘেঁষা। স্বভাবে দুর্মুখ। বিশেষ করে, যার সঙ্গে বনত না—চোয়াড়ে এবং কথ্য ভাষায় দরকার হলে যা তা গালাগালি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতেন।

বিশ্ব জয় করে দেশে ফিরেছেন। অনেক নাম তখন ভূপর্যটকের। চারিদিক থেকে ডাক আসছে। কোথাও বক্তৃতা, কোথাও মিটিং, কোথাও বা বন্ধুত্বের আবাহন। এক সংস্কারপন্থী পুরনো হিন্দু বন্ধুর বাড়িতে এল নিমন্ত্রণ। রক্ষা করতে হয়। না গেলে, 'অহঙ্কারী' আখ্যা পেতে হবে অহেতুক। নানা দেশ বিদেশের গল্প শেষে শুরু হয় উপাদেয় খাদ্য-তালিকার ভোজনপর্ব। খাওয়া তখন অর্ধপথে। সমুদ্রপারে বিদেশ ঘোরা। কত রকমের জাত-বেজাতের সঙ্গে ওঠা-বসা, ঘোরা-ফেরা, ছোঁয়া-খাওয়া করে বেড়িয়েছে। সুতরাং অস্পৃশ্যকে বলা হলো, খাওয়া শেষ হলে বাসন-কোসন ধুয়ে জায়গাটা যেন গোবর জল ছড়া দিয়ে দেওয়া হয়। ব্যস! ঘষা খাওয়া বারুদের মতো জ্বলে হেঁকে উঠলেন—এ্যাইও, চুপ রও ভূত কুনখানকার। তুমরার ভগবতীকে আমি

খাইরে হালার পুয়া হালা; ইতা জানস্ নি? তুম্‌রার জাতির কঁ্যাথায় আগুন। তুমরার খাওয়ান লগেরও মুহে মুতি। চললাম।

খাবার শুদ্ধ বাসনগুলি খোলামকুচির মত ছুঁড়ে পা বাড়ালেন দুম্-দাম্ করে। টুকরা করা ছেঁড়া কাগজের মতো খাবাবগুলি ছড়িয়ে রইল সারা উঠোনময়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত মানুষটির শির ছিল চিরউন্নত। কোনও অবস্থাতেই তাঁর প্রতি অবিচার বা অশালীন ব্যবহার হজম করতে পারতেন না। পাল্টা আঘাত হানবেনই।

পথিক দুর্দান্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘুরে ঘুরে একদিন ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত। উঠেছেন রেলওয়ে স্টেশনে। অশ্বেতদের জন্য বিশ্রামাগারে কোনও রকম বসার আসন পর্যন্ত না থাকায়, জেদী রামনাথ ইউরোপীয়দের বিশ্রামাগারে ঢুকলেন আর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙতেই অনুভব করলেন কে যেন ঠেলছে বিশ্রী রকমভাবে। চোখ মেলে চেয়ে দেখেন, স্টেশন মাস্টার জুতোর ডগা দিয়ে পিঠে 'কিক' করছে আর বলছে। —'গেট আউট' (বেরিয়ে যা)।

আহত অবস্থায়—'ইয়েস' (হ্যাঁ যাচ্ছি) বলে উঠে দাঁড়িয়েই নিমেষের লহমায় স্টেশন মাস্টারের পেটে সজোরে বসিয়ে দিলেন ভীম লাথি।

কঁকিয়ে উঠে পেট চেপে 'উঃ আঃ' করতে করতে হেঁট হয়ে বেরিয়ে গেল মাস্টার, সঙ্গে আনতে রাইফেল।

ভীতচকিত মানুষ সাধারণত বিপদের গন্ধ পেলে উল্টো দিকে ছুটে পালাতে মরিয়া হয়ে ওঠে। রামনাথের ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত : উনি বরং ঝাঁপিয়ে পড়তে ভালবাসেন। হতে পারে, জ্ঞান ভান্ডারটি মহা মূল্যবান করে তোলার আত্যন্তিক আসক্তি। আবার এমন বললে ভুল হবে না, বিপদকে বরণ করে নেওয়ার সহজাত প্রবণতা ওনার জীবন ধারার মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। সর্বনাশের গভীরে ডুব দিয়ে অভিজ্ঞতার মণিমুক্তো কুড়িয়ে আনায় রোমাঞ্চকর সে আনন্দই আলাদা। 'তাথৈ তাথৈ' নেশার ঘোরে মন-ঘোড়া তাই টগবগিয়ে ছুটতে চায় উত্তেজক উন্মাদনায়। চিন দেশে ইয়াংসী নদীর তীরে বসে চিনে বাদাম খেয়ে মোড়কটি ফেলতে যাবেন, নজরে পড়ে কাগজটিতে লেখা আছে—'জাপানী যুদ্ধ জাহাজ হতে গোলাবর্ষণে চীনের বৃহত্তম ছাপাখানা কমার্শিয়াল প্রেস ধ্বংস।' আর কি বসে থাকা যায়? সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে হল পাখির মত ধ্বংসক্ষেত্রে উড়ে যেতে। কিন্তু, উপায় যে নেই। অগত্যা দমা মন নিয়ে চললেন গদাই লস্করী চালে, সাইকেলে। যেতে কিন্তু হবেই।

আবার বিপদে ঝাঁপ দিতে গিয়ে উল্টো বিপত্তি, প্রতিবাদে মুখর হতে যেয়ে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, এমন ঘটনাও কম ঘটেনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় কালোদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ, 'বুয়রদের' পার্কে বসার জন্য দৈত্য আকৃতির এক শ্বেতকায় আকস্মিকভাবে এসে রামনাথকে প্রচণ্ড প্রহার করতে থাকে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও দানবীয় শক্তির কাছে সেদিন হার মানতে হয়। ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়েন। কিন্তু, তাঁর সেই রুখে যাওয়া বীরত্বের মুগ্ধ স্বীকৃতি দিতে সাহেবটি ভুল করেন নি—"off you inky....but pleased to see you raise your hand against me...your

tribe never dares......for the first time in my life....get out."।

চিনদেশের সাংহাই যাত্রায় রাত কাটিয়েছেন 'নিংপো' গ্রামের এক ভগ্নদশা পোড়ো ঘরে। ভোরবেলা, তখন ভালভাবে সূর্যও ওঠেনি। জাপানী স্বার্থ দেখে এমন একজন চিনদেশীয় সৈন্য, সোজা ঢুকে কথা নেই বার্তা নেই মেরে দিল পাঁচ আঙুলের দাগ বসানো মারাত্মক চড়। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? ২/৩ সেকেন্ড মাত্র। তার মধ্যে সামলে উঠে মুহূর্তে পাল্টা আঘাত হানলেন। মুখে একখানি ভয়ঙ্কর ঘুঁষি জমাতেই বেচারি ছিটকে পড়ল। হলে কি হবে, সে জাতে সৈনিক। অতএব, পড়েও রাইফেল ঘুরিয়ে ধরে। রামনাথও কম যান কিসে? নিমেষে লাফ দিয়ে হাত মুচড়ে রাইফেল কেড়ে বুকে বসালেন প্রলয় লাথি। ঘর থেকে বাইরে ছিটকে পড়ল বীরপুঙ্গব। আহত সৈনিক পালিয়ে গেলেও বিদ্রোহী গন্ধ পেলেন নিকট বিপদের। গেরুয়া পতাকা শুদ্ধ 'হিন্দু পর্যটক' লেখা সাইকেলটা বাইরে রেখে, নিজে সন্ন্যাসীর ধরণে সেজে নিয়ে বাগিয়ে ধরলেন পরিত্যক্ত বন্দুকটি।·কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈনিকটি ফিরে এল, সঙ্গে নিয়ে সৈন্যদল। তাঁর 'হুঁশিয়া'র' শুনে, সেনাধ্যক্ষ নিরাপত্তার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রথমে বন্দুক ও টোটার পেটী ফেরৎ নিয়ে নেয়। পরক্ষণেই সবাই মিলে পঙ্গপালের মতো ঘিরে ধরে শুরু করল নারকীয় মার। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তাক্ত রামনাথ লুটিয়ে পড়লেন অজ্ঞান হয়ে। সে যাত্রায় গ্রামবাসীদের অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষায় পুরোপুরি সেরে উঠতে সময় লেগেছিল দুমাস। এমন বার বার ঘটেছে। অথচ উল্টোটাও কম তো ঘটে নি। আর তা ঘটেছে চক্রাকার আবর্তনের ছন্দে। পৃথিবীর মানুষ তাদের অতিথিকে সেবা-যত্নে সারিয়ে তুলে, শুনিয়েছে মনুষ্যত্বের জয়গান। রামনাথও ভোলেন নি। কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে এ হেন পর্যটকের প্রতি মানুষের মহান কর্তব্যের কথা লিখে গেছেন; সেই সমস্ত মানুষগুলিকে অমরত্বের স্বীকৃতি দিয়ে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, অ্যাতো কিছুতেও রামনাথকে কেউ কখনো দমিয়ে রাখতে পারে নি বা দেখেনি। সেরে উঠেই আবার যে রামা সেই রামাই! 'এইতো' ঘটে য'ওয়া ঘটনা, যেন স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। ঘুরছেন, ফিরছেন, সব ঠিক আছে। তবু যেইমাত্র অন্যায়ের সামনাসামনি হলেন, অমনি দোর্দণ্ড প্রতাপ রামনাথ খড়্গাহস্ত! প্রতিবাদের জ্বলন্ত প্রতীক!

স্মরণীয়

দ্বিচক্রের তালে তালে সুবিশাল ভ্রাম্যমাণ জীবনে মনের পর্দায় স্থায়ী দাগ কেটে যাওয়ার মতো ঘটনা কত যে ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে কখনও বা ভেসে ওঠে মণীষিদের ছবি। টোকিওতে পলাতক রাসবিহারী বসুর বাড়ির সামনে দেখা করতেই বসু আলিঙ্গন করে সহাস্যে বললেন—'চলুন ঘরে যাই।' পরক্ষণেই উৎকণ্ঠায় ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন রাখেন—'বাড়ি হতে পালিয়ে আসেন নাই তো?' রামনাথের সলজ্জ জবাব—'পালিয়ে আসার সময় চলে গেছে স্যার। এখন আমার বয়স হয়েছে।'

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাস নাগাদ ভূপর্যটক দেশের মাটিতে পা রাখেন। তারপর কিছুদিনের জন্য ওঠেন হ্যারিসন (বর্তমান মহাত্মাগান্ধী রোড) রোডের 'প্যালেস' হোটেলে। ১৯৪০-এর জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হন এবং জেলে অনসন ধর্মঘট শুরু করেন। ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়ে গৃহে অন্তরীণ থাকাকালে ২৬ শে জানুয়ারি, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ছদ্মবেশে দেশত্যাগ করেন। এই ঐতিহাসিক অন্তর্ধান ভারতের জনমানসে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। উপরোক্ত ক'মাসের মধ্যে নেতাজীর দূত 'প্যালেস' হোটেলে তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করে—বিভিন্ন দেশে কিভাবে যেতে হবে, তার হদিস নিতেন। তবে সব চাইতে বেশি আগ্রহী ছিলেন, আফগানিস্থানে যাওয়ার ব্যাপারে। রামনাথ কোনও কারণে তাঁকে আফগানিস্থানে যেতে বার বার মানা করলেও শেষ পর্যন্ত নিপুণ ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সে দেশের নাড়ীনক্ষত্র, এমনকি ম্যাপ পর্যন্ত এঁকে দিয়ে। পুরনো কাবুল শহরের শোরবাজার অঞ্চলে একটি বাড়িতে সুভাষচন্দ্র কিছুদিন বাস করেন। আফগান প্রেসিডেন্ট থাকাকালে নাজিবুল্লা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর সরকার ঐ বাড়িটিকে মেরামত ও সংস্কার-যোগে জাতীয় স্মারকরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করে মহান বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন।

ইউরোপ সফরের সময় ইটালির মুসোলিনী, জার্মানীর হিটলার লোক মারফৎ তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু শুধুমাত্র নীতির কারণে তা প্রত্যাখ্যান করে বলিষ্ঠ কলমে জানান—''আমি আপনাদের দেশ দেখতে ও জনসাধারণের সঙ্গে মিলতে এসেছি। নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই।''

একবার আফ্রিকার গহীন জঙ্গল এলাকার আঞ্চলিক নিগ্রো বাসিন্দারা ঘেরাও করে জানতে চায়, কোথা থেকে এসেছে দুচাকায় ভর করে এই অদ্ভুত জীবটি। তিনি নানাভাবে ও ভাষায় বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে বললেন 'আমি গান্ধীর দেশ ভারতবর্ষের মানুষ।' কারণ, জানা ছিল আফ্রিকায় গান্ধীজির খুবই কদর। কিন্তু এখানে সেটাও বিফল হলো। এবার প্রমাদ গুণতে হয়। কারণ দু'একজনের প্রকৃতি ও নড়াচড়া খুব একটা সুবিধের মনে হচ্ছিল না। দায়ে পড়ে অনেক মাথা খাটিয়ে এবং বুক ঠুকে পাড়েন রবি ঠাকুরের নাম। আর সকলে নির্বাক থাকলেও দেখা গেল, একজন জোয়ান মতো ছেলে নড়ে চুড়ে বসল। সে জোহানেসবার্গে সামান্য কিছু পড়াশুনো করে কিছুকাল হল ফিরেছে। মহান কবির নাম তার স্মৃতিতে জেগে ওঠায় তড়িঘড়ি সে আর সকলকে বুঝিয়ে দেয়। ব্যস! সকলে মিলে সাইকেল আরোহীকে এমন খাতির-যত্ন শুরু করলো, যেন মনে হয়, ইনি বুঝি এইমাত্র স্বর্গ হতে নেমে এসেছেন, পৃথিবীর মানুষকে স্বর্গের সুলুক-তল্লাস উপহার দিতে। ছোট ঠাকুরও বিনাবাক্যে অতিপ্রসন্ন চিত্তে বড় 'ঠাকুরের' অমরত্ব কামনা করে কয়েকদিনের জন্য আসন পাতলেন, সেই অজ জঙ্গলা গ্রামে।

পোড় খাওয়া মানুষটি সঙ্গত কারণেই যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনি ঠোঁটকাটা। রেখে ঢেকে কথা বলা স্বভাবের ত্রিসীমানায় প্রবেশপত্র পায় না। ভূ-প্রদক্ষিণ অন্তে চললেন শান্তিনিকেতনে। উদ্দেশ্য—বিশ্বজয়ী সাইকেলটি বিশ্বকবিকে উপহার দিয়ে নিজে ধন্য

হবেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ পাড়লেন সেই কথাটি—'রামনাথ, তোমার লেখা আমি পড়ি।'

অবিশ্বাস্য ছোট্ট এই বাক্যটুকু কানে পৌঁছানোমাত্র চিরাচরিত স্বভাব তেড়েফুঁড়ে আছড়ে পড়তে চেয়েছিল। কিন্তু ইনি যে স্বয়ং 'রবি ঠাকুর' বলে কথা। তবু, শত হলেও রামনাথ তো বটে। মেঝের দিকে নতদৃষ্টিতে মাথা চুলকে বহু চেষ্টাকৃত ধীর গলায় উগ্‌রে দিলেন—'গুরুদেব, অধমের কাছে মিথ্যা বলে লজ্জা দেন কেন?' এক পলক অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে মুচকি হেসে গুরুদেব হাঁকলেন— 'অনিল, 'দেশ' পত্রিকাগুলো নিয়ে এসে দেখাওতো পর্যটক মশাইকে'। কবির প্রিয় পাত্র অনিল চন্দ ত্বরিতে বেশ কয়েকটি পত্রিকা তাঁর হাতে ধবিয়ে দিলে রামনাথ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, তাঁরই লেখা পাতার পর পাতা ভ্রমণকাহিনীগুলিতে বিশেষ বিশেষ জায়গায় কবিগুরুর নিজের হাতে দাগ দিয়ে 'আন্ডার লাইন' করা। লজ্জা সঙ্কোচে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। মসৃণ আয়না-সদৃশ 'রাম'টাকে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে এবং চম্‌কে চম্‌কে উঠে ভাবছেন, 'এও কি সম্ভব! আমার মতো অধম লেখকের লেখা বিশ্বকবি এভাবে পড়েন;'

অন্যদিকে মাথা দুলিয়ে সকৌতুকে অথচ স্নেহশীল দৃষ্টিতে রসিক কবি উপভোগ করছেন রামনাথের বেহাল অবস্থা। সেই মুহূর্তে গুরুহৃদে কি গুণগুণিয়ে উঠেছিল?—

'বিশাল বিশ্বের আয়োজন,
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।'

(ঐকতান)

দুষ্টুমী

বেরিয়ে পড়ে ফিচলেমিও কম করেন নি। বুলগেরিয়ায় ঘুরছেন দেশ-ঘরের দিকে। পথের পাশে কৃষক মজুরেরা কাজ করছে। তারা পরিচয় পেয়ে ঘিরে ধরল এবং সাধু 'সুন্দর সিং' কে এবং কোন ধর্ম মেনে চলেন, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন রাখে। 'সুন্দর সিং' কোরিয়া, সিরিয়া, লেবাননের গোঁড়া খৃষ্টান মহলে বহুল পরিচিত ব্যক্তি হলেও তিনি ঐ নামটুকু ছাড়া কিছুই জানতেন না। কিন্তু এটা খবর রাখতেন, ধর্ম ব্যাপারে ভারতীয় সার্টিফিকেট সারা পৃথিবীতে সাদরে গ্রাহ্য। মাথায় দুষ্টু পোকাটা নড়তেই বলে উঠলেন মনে মনে, 'চাষাদের কে না ঠকায়? যারা ঠকায় না তারাই হল একের নম্বরের মূর্খ'। প্রকাশ্যে জুড়ে দিলেন—'সাধু সুন্দর সিং ভারতের লোক। তিনি যিশুকে দেখেছেন।

বর্তমানে তিনি হিমালয়ে বাস করছেন। কেল্লা ফতে! শুনেই চাষারা কপালে ও বুকে ক্রস চিহ্ন এঁকে সামনে ধরে প্রচুর খাদ্য। তা অবশ্য খেলেন না। কারণ ইচ্ছে করে যে ঠকিয়েছেন, বেচারীদের।

চিনের নানকিন-এ প্রথম রাতটা কাটাতে না কাটাতেই ভোরবেলা বিভিন্ন সাংবাদিকের দল হোটেল ঘরে ছেঁকে ধরে। এমনকি রয়টারের সাংবাদিকও উপস্থিত। ভ্রমণের প্রাথমিক কথা বলার পরে প্রথমে একজন প্রশ্ন করেন,—'চিন দেশের অনেক স্থানে তো বেড়িয়েছেন, দেখে কেমন মনে হল?' সোজা-সংক্ষেপ উত্তর মিলল—'বেশ ভালই।' এরপরই প্রশ্নবাণে একেবারে জর্জরিত অবস্থা। শীঘ্রই বুঝতে পারলেন সাংবাদিকরা তাঁর কাছ থেকে ভৌগোলিক নয়, রাজনৈতিক বক্তব্য আদায়ে ঘিরে ধরছে ক্রমশ। হুঁশিয়ার পথিক সাবধান হলেন। একদল তাঁকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিলেন, 'ডাকাতের দলই কমিউনিস্ট এবং এরাই চীনের শত্রু'। আর একদলের ইচ্ছে তিনি বলুন—'শিক্ষিত সমাজই হল প্রকৃত কমিউনিস্ট!' কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে পাল্টা আঘাত হানলেন—'চোর চোরই, ডাকাত ডাকাতই, তার সঙ্গে কোন মতবাদের সম্পর্ক নাই।' এরপরেই তাঁরা বলে বসলেন—'পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজই সকল অসৎ কাজের গোড়ায় রয়েছে, তাতে আপনার মত কি?' ফিচকি হেসে মোক্ষম জবাব দিলেন—'যদি তাই হয় তবে যাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তাঁরাও বাদ পড়েন না।'

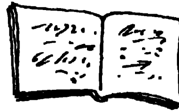
নিউইয়র্কের আমেরিকান সঙ্গীদের ছেড়ে এগিয়ে চললেন এই বলে—'নায়গ্রার মতো শ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক তীর্থে বর্ণবৈষম্য মানা হয় কি না দেখতে চাই।' বাসে উঠে বসেছেন। কিন্তু একা। কারণ, আর সকলে 'কালা আদমীর' সঙ্গে এক সাথে যাওয়ার চেয়ে পরের বাসে যাওয়া শ্রেয় মনে করেছে। অগত্যা বাস একা যাত্রী নিয়েই ঠিক সময়ে ছাড়ল। পর্যটক চিন্তিত! ক্ষতিপূরণ দিতে হবে নাকি? না। রাস্তায় লোক উঠতে থাকে। কিন্তু, আর সব সিট ভর্তি হলেও তাঁর পাশের সিটটি খালিই পড়ে রইল। কেউ বসবে না। অগত্যা, 'বর্বরদের সঙ্গে বর্বর হয়ে লাভ নেই ভেবে উঠে দাঁড়াতেই দেখি, দুটা বর্বর আমার পরিত্যক্ত স্থান দখল করল। অমনি তাদের বললাম, এখানের একটা সিট আমার। আপনাদের একজনকে উঠে দাঁড়াতে হবে। নীরবে দুজনেই দাঁড়িয়ে থাকল'। রামনাথ ঝুপ করে বসে জানলা দিয়ে আকাশভরা মেঘমালার দিকে তাকিয়ে গুণগুণিয়ে ধরলেন—''বল মা তারা দাঁড়াই কোথা...

বুদ্ধি যার.....

আফগান রাজ্যে হোঁচট খেতে হলো। পাশপোর্টে দিল্লীর কনসাল 'আফগানিস্থান' কথাটা লিখতে ভুলে গেছে। পেশোয়ারে আফগান কনসালের অফিসে হিন্দু কেরাণী নিজেকে পৃথিবীর চরম ব্যস্ত মানুষ প্রমাণ করে মেয়েলি গলায় জেদ ধরল, 'এখন ঐ শব্দটা ঢোকানো অসম্ভব।' মানব চরিত্রের অন্ধি-সন্ধিতে বিশেষজ্ঞ ভবঘুরে, সামনের চেয়ারটি টেনে নিয়ে বসে কপালে বলি রেখার ভাঁজ তুলে নিজের হস্তরেখা ভেদে

নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে পড়লেন। 'লোকটা তাহলে জ্যোতিষীতে পাক্কা পণ্ডিত হবেই হবে' ধরে নিয়ে, ছোকরা নিজ হাতটি বাড়িয়ে দিল সুড়সুড় করে এবং সেইসঙ্গে আটকা পড়লেন 'রামা-কল'-এ।

পারস্য ভ্রমণে ইরাণি কনসালের কাছে হত্যে দিতে হয়েছে ভিসার জন্য। জবরদস্ত কনসাল জলদগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'আগে যা হোক কাজে এ দেশে এসেছিলেন কি না'? পল্টনী কাজে ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে গিয়ে থাকলেও রামনাথ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললেন, 'না'। কারণ তিনি জানতেন, এখানকার পারস্য সম্রাট রেজা সাহ পহ্লবী ভারতীয় সৈন্য বিভাগের লোককে দারুণ ঘৃণা করতেন। তাঁর মতে মাত্র এগারো টাকায় যেখানে একটা দুম্বা (মেষ) কেনা যায় না, সেখানে এগারো টাকায় একটা ভারতীয় সৈন্য পাওয়া যায় অনায়াসে। বিশেষ করে, তাদের সহজলভ্য, যারা স্বদেশে ও বিদেশে সকলের সর্বনাশ করতে প্রস্তুত। তাই নিশ্চিত হওয়ার জন্য কনসাল মশাই চতুর পরীক্ষা করতে হঠাৎ মিলিটারি কায়দায় চিৎকার করে হাঁকলেন— 'অ্যাটেনশন'! রামনাথও চোখের পলকে 'উদো' সেজে পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বার করে কনসালের হাতে একটি দিয়ে অপরটি নিজে ধরালেন, অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে। এর পরেও ভিসার আশা ফাঁসায় কে?



সাহিত্য

রামনাথ বিশ্বাস শুধু নিজেই ভূপর্যটন করেন নি। কথা সাহিত্যের মাধ্যমে অসংখ্য পাঠককে দুনিয়া ঘুরিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন, তাঁর চোখ দিয়ে। এই সমস্ত বই-এর সিংহভাগ ভ্রমণ বিষয়ক হলেও গল্প ও উপন্যাস রচনাতেও তাঁর দক্ষতার আর এক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিক থেকেই ভ্রমণ কাহিনী লিখতে থাকেন বিক্ষিপ্তভাবে। এই সময় বিভিন্ন পত্রিকাগুলির দরজায় দরজায় নানা দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ লেখাগুলি নিয়ে শুধু হতাশ হয়ে ফিরতে হয় তাঁকে। অবশেষে সে লেখা নিজ পত্রিকায় স্থান করে দিয়ে প্রথম সম্মান দেন 'প্রবর্তক'-এর রাধারমণ চৌধুরী। পুরোধা 'প্রবর্তক'-এর মাধ্যমে যে উৎসাহের সূচনা হলো, তা নবতর উদ্যমে বেড়ে চলে। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাতে ভাঁটা পড়ে নি। ক্রমে দেশ, বসুমতী, সঞ্জীবনী, প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকহারে লেখা বের হতে থাকে। সে সময় বিশেষ করে মানসিক ভ্রমণ পিপাসু বাঙালি পাঠক উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতো তাঁর বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ লেখাগুলির জন্যে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য। পর্যটন শেষে ১৯৪০ সালে কলকাতায় থিতু হয়েই মন দিলেন বই

লেখায়। বয়স তখন সাতচল্লিশ। বিচ্ছিন্ন লেখাগুলি জড়ো করে বাড়তি সংযোজনের মাধ্যমে পেনের ডগায় আনলেন ঝড়ের গতি। সে ঝোড়ো হাওয়ায় পাল তুলে একে একে ভেসে এল ভ্রমণের বজরা, গল্পের নৌকা ও উপন্যাসের পানসি।

প্রকাশিত বইগুলি

১। তরুণ তুর্কী — [প্রথম প্রকাশিত বই। তুর্কী ভ্রমণ নিয়ে লেখা প্রথম প্রকাশ ১লা জানুয়ারি, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ। প্রকাশক—পর্যটক প্রকাশনা ভবন (নিজ উদ্যোগে)। ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ সংস্করণ যথাক্রমে ১৯৪২, '৪৩ ও '৪৫-এ বের হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৪৩। মূল্য ২.০০]

২। মরণ বিজয়ী চীন — [চিন ভ্রমণ কাহিনী। প্রথম প্রকাশ - ১৯৪১ খৃঃ। প্রকাশক—পর্যটক প্রকাশনা ভবন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ যথাক্রমে ১৯৪৪ ও '৪৮-এ প্রকাশিত হয় ভট্টাচার্য সন্স লিমিটেড থেকে। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৫২। মূল্য - ৬.০০)]

৩। AFRICA IN PICTURE — [ছবিতে মোড়া আফ্রিকা। প্রকাশ - ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে। মূল্য - বারো আনা অর্থাৎ এখনকার ৭৫ পয়সা]

৪। আজকের আমেরিকা — [কেপটাউন বন্দর থেকে জাহাজ পথে লন্ডন হয়ে আমেরিকা ভ্রমণ কাহিনী। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে। তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত (১৯৪৩ ও ১৯৪৫) প্রকাশক নিজস্ব 'পর্যটক প্রকাশনা ভবন'। চতুর্থ (১৯৪৮ খৃঃ) এবং আরও দুবার (১৯৫০, ১৯৫৫) পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব নেন অশোক পুস্তকালয়। সমস্তই নিঃশেষ। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯৬। মূল্য - ৩.৫০ টাকা]

৫। কোরিয়া ভ্রমণ — [নিজস্ব প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৪২ খৃঃ, 'পর্যটক প্রকাশনা ভবনের' পক্ষে। দ্বিতীয় প্রকাশক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন নাম ছিল 'দ্বিচক্রে কোরিয়া ভ্রমণ'। তৃতীয় সংস্করণ- মার্চ ১৯৫১ খৃঃ। প্রকাশক -

ইন্ডিয়ানা লিমিটেড, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৭৬, মূল্য - ১.০০ টাকা]

৬। **আধুনিক ভূ-পরিচয়**	[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের **'TEXT BOOK'** কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য ভূগোল পাঠ্য পুস্তক। একযোগে রামনাথ বিশ্বাস ও হাওড়ার ব্যাঁটরা মধুসূদন পালচৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূগোল শিক্ষক বিজয়রতন বক্সী কর্তৃক লিখিত। প্রকাশক - দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি। সময় - ১৯৪২ খৃঃ। দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৫৮। মূল্য - এক টাকা দুই আনা অর্থাৎ এখনকার ১.১২ টাকা]
৭। **আফগানিস্থান ভ্রমণ**	[নিজস্ব প্রথম প্রকাশ ১৯৪২ খৃঃ। মূল্য - ২.০০ টাকা। পৃষ্ঠা - ১৬৫। তৃতীয় সংস্করণ - ১৯৫৫ খৃঃ। প্রকাশক - অশোক পুস্তকালয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭২। মূল্য - ৩.০০ টাকা]
৮। **লাল চীন**	[চিন দেশের চালিন সোভিয়েট ভ্রমণ। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৩ খৃঃ। তৃতীয় সংস্করণ - ১৯৪৫ খৃঃ, প্রকাশক - অশোক পুস্তকালয়, পৃষ্ঠা সংখ্যা -১৫২। মূল্য - ২.৫০ টাকা]
৯। **CHINA DEFIES DEATH**	[ইংরেজিতে 'মরণ বিজয়ী চীন' এর সারাংশ। একটিই সংস্করণ। মূল্য - ৩.০০ টাকা]
১০। **বেদুইনের দেশে**	[ইরাক, সিরিয়া ও লেবানন ভ্রমণ কাহিনী। প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ খৃঃ। প্রকাশক - পর্যটক প্রকাশনা ভবন। দ্বিতীয় সংস্করণও বের হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯৪। মূল্য - ১.৫০ টাকা]
১১। **ভয়ঙ্কর আফ্রিকা**	[কেনিয়া এবং উগান্ডা ভ্রমণ কাহিনী। প্রথম প্রকাশ - ফাল্গুন, ১৩৫০। প্রকাশক - পর্যটক প্রকাশনা ভবন। তৃতীয় সংস্করণ। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৬৭। মূল্য ২.৫০ টাকা]

১২। **TOUR ROUND THE WORLD WITHOUT MONEY**

[একটিই সংস্করণ। প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। প্রকাশক - ডি.এন. প্রসাদ। শান্তিভবন। ৩৭, হ্যারিসন রোড, মূল্য - ১.০০ টাকা।]

১৩। **ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর**

[ইন্দোচীন ভ্রমণ কাহিনী। প্রকাশক - শ্রীগুরু লাইব্রেরী। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৭৫। মূল্য - ২.৫০ টাকা]

১৪। **জুজুৎসু জাপান**

[জাপান ভ্রমণ। প্রথম সংস্করণ - শ্রাবণ, ১৩৫২ সাল। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২০২। মূল্য - ৩.০০ টাকা]

১৫। **প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি**

[ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, বালী এবং ইন্দোনেশিয়ার সুরাবায়া ভ্রমণ। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫ খৃঃ। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত। প্রকাশক - পর্যটক প্রকাশনা ভবন। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১০০। মূল্য - ১.৫০ টাকা]

১৬। **পারস্য ভ্রমণ**

[ইরান ভ্রমণ কাহিনী। প্রথম সংস্করণ। প্রকাশ তারিখ উল্লেখ নেই। প্রকাশক নৃপেন্দ্র নাথ দত্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯০। মূল্য - ১.৫০ টাকা]

১৭। **বিদ্রোহী বলকান**

[বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং হাঙ্গেরী ভ্রমণ কাহিনী। প্রথম সংস্করণ শুধু বের হয়েছে। প্রকাশক - মিত্রালয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৩৪। মূল্য - ৩.৫০ টাকা]

১৮। **পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ**

[হল্যান্ড এবং বেলজিয়াম। একটি মাত্র সংস্করণ। প্রকাশকাল উল্লেখ নেই। প্রকাশক - পর্যটক প্রকাশনা ভবন। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১২৪। মূল্য - ২.০০ টাকা।]

১৯। **জার্মানি এবং মধ্য ইউরোপ**

[১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে গজেন্দ্র কুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১১৭। মূল্য - ৩.৫০ টাকা।]

২০। **মলয়েশিয়া ভ্রমণকাহিনী**

[মালয়দেশের ভ্রমণ কাহিনী। প্রথম সংস্করণ - মে, ১৯৪৯ খৃঃ। প্রকাশক - ভট্টাচার্য সন্স লিমিটেড। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২০৮। মূল্য - ৩.৭৫ টাকা।]

২১। **মুক্ত মহাচীন**

[মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে গণজাগরণের মধ্য

দিয়ে চিনের স্বাধীনতা অর্জন। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯ খৃঃ। দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছে। প্রকাশক - ভট্টাচার্য সন্স লিমিটেড। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১১২। মূল্য - ২.৫০ টাকা।]

২২। **দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা** [নাটাল, ট্রান্সভাল এবং কেইপ ভ্রমণ কাহিনী। প্রকাশকাল - ১৯৪৯ খৃঃ। প্রকাশক - ভট্টাচার্য সন্স লিমিটেড। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২০২। মূল্য - ৩.৭৫ টাকা।]

২৩। **নিগ্রো জাতির নূতন জীবন** [উত্তর এবং দক্ষিণ রডেসিয়া ভ্রমণ কাহিনী। প্রকাশকাল - আশ্বিন, ১৩৫৬ সাল (১৯৪৯ খৃঃ)। প্রকাশক - ডি.এম লাইব্রেরী। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৬৪। মূল্য - ২.৫০ টাকা।]

২৪। **ভবঘুরের বিলাতযাত্রা** [জাহাজে চড়ে কোলকাতা হতে লন্ডন যাত্রা। যাত্রী এবং কথক গৌরীশ চন্দ্র সিংহ রায়। রামনাথ বিশ্বাস কর্তৃক লিখিত। প্রথম প্রকাশক - ওবিয়েন্ট বুক কোম্পানী। দ্বিতীয় প্রকাশক - মিত্র ও ঘোষ। পৃষ্ঠা - ৮৬, মূল্য - ১.৫০ টাকা)]

২৫। **ভবঘুরের বিশ্বভ্রমণ** [লন্ডন হতে জাহাজে পৃথিবী প্রদক্ষিণ সেরে লন্ডনে হাজির। গৌরীশের বিশ্বভ্রমণ ডায়েরি থেকে রামনাথ কর্তৃক লিখিত। প্রথম সংস্করণ - আষাঢ়, ১৩৫৬ বাংলা সাল। অর্থাৎ ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ। প্রকাশক - কলিকাতা কো-অপারেটিভ বুক ডিপো। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২২৪। মূল্য - ৩.০০ টাকা। দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]

২৬। **সর্বস্বাধীন শ্যাম** [শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ডের ভ্রমণকাহিনী। প্রথম সংস্করণ নভেম্বর, ১৯৪৯ খৃঃ। প্রকাশক - ভট্টাচার্য সন্স লিমিটেড। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৩৮। মূল্য - ২.৭৫ টাকা।]

২৭। **অন্ধকারের আফ্রিকা** [টেংগানীয়াকা এবং ন্যাসাল্যান্ড ভ্রমণ কাহিনী। প্রকাশ - ১৯৫০ খৃঃ। প্রকাশক - পর্যটক প্রকাশনা ভবন। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৪০। মূল্য - ২.৫০ টাকা]

২৮। পৃথিবীর পথে

[এটি 'এক পাতে রামনাথ' গোছের সঙ্কলন গ্রন্থ। কয়েকটি নতুন লেখাও আছে। পাঠক পাঠিকাদের চাহিদা মেটাতে তাঁর লেখা বইগুলি থেকে নির্বাচিত অংশগুলি চয়ণ করে প্রকাশের উদ্যোগ নেয় 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্থা। একটিই সংস্করণ। প্রকাশকাল - (উল্লেখ নেই)। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৬৪। মূল্য - ৪.০০ টাকা। যার মধ্যে আছে : - (১) আফগানিস্থান (২) আতাতুর্কের দেশে (৩) মহাচীন (৪) কোরিয়া (৫) লালচীন (৬) ভয়ঙ্কর আফ্রিকা (৭) বেদুইনের দেশে (৮) আমেরিকার পথে লণ্ডন (৯) আজকের আমেরিকা (১০) ভিয়েৎনাম (১১) ড্রেসডন (জার্মানী)।]

২৯। ফ্রান্সে ভারতীয় ভূপর্যটক

[প্রথম প্রকাশ - পৌষ, ১৩৫৯ সাল। বের হয় দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক - ডি.এম. লাইব্রেরী। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮৪। মূল্য - ৬.০০ টাকা।]

৩০। ব্রহ্মদেশে ছয়মাস

[প্রথম সংস্করণ - ১৯৫৪ খৃঃ। প্রকাশক অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির,পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১২৬। মূল্য - ২.০০ টাকা।।]

৩১। রামনাথ গ্রন্থাবলী

[১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত সমগ্র পাঁচটি নির্বাচিত বইয়ের সঙ্কলন। এর মধ্যে আছে : - (১) জাপান ভ্রমণ, (২) আমেরিকার নিগ্রো, (৩) আজকের আমেরিকা, (৪) ভবঘুরের চীনদেশী বন্ধু (গল্প), (৫) বিদ্রোহী বলকান। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৫৫, মূল্য - ৪.০০ টাকা]

৩২। ভারত ভ্রমণ

[প্রকাশকাল শ্রী পঞ্চমী, বাংলা ১৩৬৪ সাল। হিসাবমতো মৃত্যুর দুই বৎসর পরে। প্রকাশক - ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। এটিই প্রকাশিত শেষ গ্রন্থ। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৭৬। মূল্য - ৫.০০ টাকা]

গল্প

১। ভবঘুরের গল্পের ঝুলি (প্রথম প্রকাশ - ১৯৪২ খৃঃ। প্রকাশক - অমরেন্দ্র নাথ সরকার। মূল্য - তখনকার বারো আনা। অর্থাৎ ০.৭৫ টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ মিত্রালয় থেকে ১৯৪৩ খৃঃ। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮৪। ১৬টি গল্পের সংকলন। মূল্য ১.২৫ টাকা।)

২। মাউ মাউ-এর দেশে (প্রকাশক - অশোক পুস্তকালয়। ১৩৬০ সাল। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১২৩। মূল্য - ১.৭৫ টাকা)

৩। ভবঘুরের ভিনদেশী বন্ধু ('গ্রন্থশালা' কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য - ১.২৫ টাকা। পৃষ্ঠা - ৮০, মোট সাতটি গল্পের সঙ্কলন। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক - পুঁথিঘর।)

উপন্যাস

১। আগুনের আলো (প্রকাশক - জ্যোতি প্রকাশালয়। দ্বিতীয় সংস্করণ - ভারত বুক এজেন্সি। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৭৬, মূল্য - ৩.০০ টাকা)

২। হলিয়ুডের আত্মকথা (১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশ করেন মিত্রালয়। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ইন্ডিয়ানা লিমিটেড থেকে। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯১। মূল্য - ৩.৫০ টাকা।)

৩। সাগর পারের ওপারে (প্রথম সংস্করণ। প্রকাশক - ঠাকুরদাস লাইব্রেরী। সময় - উল্লেখ নেই। মূল্য - ২.৭৫ টাকা।)

৪। আমেরিকান নিগ্রো (১৯৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেছেন ইন্ডিয়ানা লিমিটেড। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১২৭। মূল্য - ২.০০ টাকা।)

৫। নাবিক (ডি.এম. লাইব্রেরী প্রকাশ করেছেন ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৭৭, মূল্য - ৩.০০ টাকা।)

এছাড়া ৫টি বইয়ের 'যন্ত্রস্থ' বিজ্ঞাপন পাওয়া গেছে, যেগুলির প্রকাশ সম্ভবত আদৌ হয়ে ওঠেনি—

১। ইরাণের আর্য ২। ভ্রমণের শেষ ৩। বিলাত ভ্রমণ, ৪। এশিয়ার ফ্রান্স, ৫। পৃথিবীর 'বেটারলেন্ড'।

বেশ কয়েকটি বই-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অথবা একমাত্র প্রকাশ নিজ ঠিকানার 'পর্যটক প্রকাশনা ভবন', ১৫৬, আপার সার্কুলার রোড (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) থেকে বের হয়। ক্রমে অবশ্য খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থাগুলি উৎসাহ দেখায়। সেগুলির কয়েকটিতে দেখা গেছে প্রকাশনার সময় উল্লেখ নেই।

তরুণ তুর্কী

দিন দুনিয়ার মুসাফিরের এই প্রথম উপহারটি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের শেষ অর্ধে লেখা। সময় সাপেক্ষ হলেও এক এক করে চার-চারটি সংস্করণ বাজার থেকে উবে গেছে। সুতরাং যে কোনও অর্থে বইটি একেবারে ফেল্‌নার নয়। লেখক শুরুতেই জানাচ্ছেন—

আমার কথা

তুর্কী ভ্রমণ করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তাই দেশবাসীকে উপহার দিলাম। তুরস্কের লোকের ভাষায় তাদের দেশের নাম তুর্কীয়া, জাতের নাম তুরুক, ভাষার নাম তুরকাই। তুরুক শব্দের সমূহ ব্যবহার করেছি, অন্য দুটি শব্দের তেমন ব্যবহার করিনি। তুর্কীর লোক ভারতের লোককে হিন্দুই বলে। তাই হিন্দু শব্দের ব্যবহার সর্বত্র করেছি। হিন্দু শব্দের ব্যবহার আমার তেমন ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু 'ইন্ডিয়ান' শব্দের ব্যবহার 'নেটিভ' শব্দের মতোই পৃথিবীর অনেক স্থানে ব্যবহৃত হতে দেখে 'ইন্ডিয়ান' শব্দ মোটেই ব্যবহার করিনি। তুরুক কনসালগণ আমাকে তুর্কীতে প্রবেশের জন্য অনেক সাহায্য করেছেন। তুর্কীতে যাবার পর তুর্কীর সর্বসাধারণের সাহায্যেই তুর্কী ভ্রমণে সমর্থ হয়েছি।

এক কথায় আমার ভ্রমণ পৃথিবীর সর্ব্বসাধারণের সাহায্য এবং সহানুভূতিতেই সম্পন্ন হয়েছে, তাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জনসমাজে কতটুকু আদৃত হয়েছে, জানি না। তবে যতটুকুই হোক বা কেন, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগাই আমার খাটুনির যথেষ্ট পুরস্কার।

১লা জানুয়ারী, ১৯৪১ শ্রী রামনাথ বিশ্বাস

সে পুরস্কার তিনি যথাযোগ্যই পেয়েছিলেন। একের পর এক বই প্রকাশ হয়ে নিঃশেষ হতে থাকে। অ-বিভক্ত বাঙলায় আপামর জনসাধারণের নয়নের মণি হয়ে ওঠেন রামনাথ। তাঁর অতুলনীয় অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ আলোকরাশির ছটায় আলোকিত হতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে মানুষজন, বাংলার ঘরে ঘরে।

লেখক 'তুরস্ক' দেশটির আদানা, আঙ্কারা, আয়াস, নালীন, গুন্যক, হায়দার পাশা,

স্তাম্বুল নগরী, বসফরাস প্রণালী, সেন্টসফিয়া, আর্দেন প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। আগেই জানা ছিল, দেশটিতে নানারকম ধর্মীয় গোঁড়ামী, আচার-বিচার, কুসংস্কার ইত্যাদিতে ভরে গেছে। কিন্তু প্রবেশ করে দেখেন— অবাক কাণ্ডকারখানা! এখন সেখানে শুধু বিচ্ছুরিত আলো আর আলো। প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন তুর্কী জাতটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এখনকার রাষ্ট্রনায়ক কামাল পাশা (আতাতুর্ক) দেশটাকে নতুন যৌবনের আলোয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। টগবগে শক্তিতে মেতে উঠেছে দেশের প্রতিটি কোণ। জলাশয়-বদ্ধ সামান্য কিছু সংখ্যক বাদ দিলে, তেতে উঠে নিজেকে বিকশিত করতে উন্মুখ প্রতিটি মানুষ। সে সময় ইউরোপের লোকেরা নিজ স্বার্থে প্রচার করত আতাতুর্ক বুর্জোয়া ধরণের লোক। কিন্তু পর্যটক দেখেছেন, তুর্কীর প্রেসিডেন্ট আতাতুর্ক আদৌ সে পথের পথিক নন। নবীনের দল তাঁর পথে সাড়া দিয়েছে এক নতুন তুর্কী দেশ গড়ার জন্য। দেশ জুড়ে সাড়া মিললে তা কখনও আকাশ থেকে এমনি এমনি ঝরে পড়তে পারে না। সে সমর্থনের পিছনে নিশ্চয়ই অনেক গভীর কারণ থাকবে। নজর এড়ায় না, পাশ্চাত্য বা ইউরোপীয়ান হাওয়া বইছে সেখানেও পুরোদমে। যতদিন সুলতান ছিল, ততদিন এদেশে 'মোল্লাইজম্' এর ভূত গেড়ে বসেছিল। কিন্তু কামাল পাশা'র সুদক্ষ পরিচালনায় সে ভূত বাষ্পীভূত হয়েছে। কারণ আর কিছুই নয়, সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়েছে। যেদিকে চোখ মেলা যায়, কেমন একটা 'সাজো সাজো' ভাব নজরে পড়ে। আতাতুর্ক-এর বিচক্ষণ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসন পদ্ধতিতে তুর্কীতে আর বারবণিতা নেই। ফকিরের ঝাড়ফুঁকের সাথে সাথে বারবণিতাও নিশ্চিহ্নপ্রায়। ফকির এখন কাঁধে কোদাল নিয়ে মাঠের দিকে যায়। বারবণিতারা অনেকেই বিয়ে-থা করে সংসার-ধর্মে মন দিতে ব্যস্ত। দেখতে ভুল হয় না, দেশটা এরই মধ্যে অনেকটা স্বাস্থ্য সঞ্চয় করেছে। রুক্ষ ও রুগ্ন চেহারা সরে গিয়ে চিকণ-লাবণ্যময় রূপ উঁকি দিচ্ছে। লেখক অবশ্য মনে করেন, পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে সময় লাগবে। তবু এ পর্যন্ত যা দেখেছেন, তাতে এতটুকু কার্পণ্য বোধ আসেনি, অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতে—'মুস্তাফা কামাল বা আতাতুর্‌ক শুধু তুরুক জাতিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন না—সমুদয় পদানত মর্যাদাহীন জাতের ভিতর অনুপ্রেরণার বাণী বহন করে তিনি ধ্যানের মূর্তিতে পরিণত হয়েছেন।'

এই পরম শ্রদ্ধেয় নেতা সর্ব অর্থে এবং মনে প্রাণে আধুনিক ছিলেন। আতাতুর্‌ক'ই সব গোঁড়ামীর বেড়া ভেঙে দেশের বিখ্যাত 'সেন্ট সফিয়া' মসজিদকে জাতীয় মিউজিয়ামে পরিণত করে পৃথিবীতে যুগান্তর সৃষ্টি করেন।

এহেন দেশে এসে শত আনন্দের মাঝেও বিশেষ এক ঘটনা জানতে পেরে বিশ্বাস মশাই মর্মাহত হন। এক সময় প্রাচীনপন্থী দুজন ভারতীয় মুসলমান তুরস্কে ঢুকে নব্যধর্মী আতাতুর্‌ককে হত্যা করতে এসেছিল। সেই কারণে ভারতবাসীর ক্ষেত্রে এদেশে খুবই কড়াকড়ি।

এটি প্রথম লেখা বই বলে, আমরা রামনাথকে বিভিন্ন রূপে দেখবার সৌভাগ্য

অর্জন করি, স্বাভাবিকভাবেই। তা সে লেখক হিসেবেও যেমন, ব্যক্তি পরিচয়েও তেমনি। আবার বহুমুখী অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে মেলে দারুণ প্রাপ্তিযোগ।

দৃশ্য বর্ণনা। তুরস্কের পথে সমুদ্রতীরের ছোট্ট শহর 'আলেকস্‌জেন্দ্রেতা'য় পৌঁছে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছেন—'সমুদ্রতীর অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন সুন্দর সমুদ্রতীর বড় একটা দেখিনি। সামনে দিগন্ত শায়িত ভূমধ্যসাগর—নিরবনিস্তব্ধ। মৃদু মন্দ বাতাসে লীলায়িত তরঙ্গ সমুদ্রে উঠে সমুদ্রের বুকেই মিলিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র তীরে তার কোন প্রতিঘাত নেই। সমুদ্রতীর প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। তারই মাঝে সুন্দর পথের দুপাশে সারি সারি বৃক্ষ। সেই বৃক্ষরাজির সৌন্দর্য্য নয়নাভিরাম। সেই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে মানবতা এবং হৃদয়ের উদারতাব স্বাদ ছিল'।

গভীর জাতীয়তাবোধ। 'আমার রীতি হল নমস্কার করা। বিদেশে আমি 'গুড মর্ণিং' বলি না, পাছে কেউ আমাকে ফিরিঙ্গি বলে ভুল বোঝে, 'আদাব' বলি না পাছে কেউ আমাকে ইরাণী বলে ভাবে, 'সেলাম' বলি না, আরবী বলে সন্দেহ করতে পারে। আমার দেশের, আমার জাতের মৌলিকত্ব বজায় থাকে শুধু 'নমস্কারে।'

নির্লোভ। তাঁর সঙ্গে আলাপে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তুর্কীর 'নালীহান'-এ কয়েকজন কিছু মূল্যবান পুরনো মুদ্রা দান করে। কিন্তু মুসাফিরেব কাছে এসবের বিশেষ কিছু গুরুত্ব নেই। কারণ, ব্যবসা বুদ্ধি আদৌ ছিল না। হল কি; থলে শুদ্ধ মুদ্রা টেবিলে রেখে দরজা ভেজিয়ে বেড়াতে চললেন, গুণ গুণ সুরে। ফিরে এসে দেখা গেল, থলে উধাও। একটুও চিন্তিত না হয়ে স্বস্তিতে বললেন—'যাক চলে। এরূপ যখের ধন আমার কাছে না থাকাই ভাল। আমার নিয়মটাই এই। বিশেষ কোন দরকার না হলে পিছন ফিরে তাকাই না। টাকাকড়ি বিশেষ দরকার নয়, পর্যটকের পক্ষে।'

বাস্তববাদী। রামনাথ মনের দিক থেকে যে কেমন মাটিঘেঁষা মানুষ, তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন, তুরস্কে 'স্তাম্বুলে'র পুলিশ অফিসে অফিসারের অনন্য জেরা-জবাবে। তাঁর ভাল মতনই জানা ছিল, ওদেশে ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি ঘৃণা রীতিমত বর্তমান। কারণটি বড় মারাত্মক। ভারতীয় সৈনিকদের ক্ষেত্রে কানাঘুষোর সূত্রটি ছিল, তাদের গরু-ছাগলের মত নাকি ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য সহজলভ্যতা। সুতরাং—'জেন্দআর্ম' অফিসে গিয়ে দেখি, একজন ইংরেজ (অর্থাৎ আমেরিকান জানা) আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। তিনি কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, আর আমি সেগুলির জবাব দিয়ে যেতে লাগলাম।

—আপনি কি কখনও সৈনিক বিভাগে কাজ করেছেন?

—না (যদিও করেছি)।

—গত মহাযুদ্ধের সময় কি করতেন?

—তখন আমি কলেজে পড়তাম (কলেজের আঙিনায় প্রবেশ করবার সৌভাগ্য হয় নি, এমনকি ম্যাট্রিকুলেশানের কোঠাই পার হইনি।)

—এরূপ দেশ ভ্রমণে কার কাছ থেকে কোনো সাহায্য কিংবা উৎসাহ পান কি?

—না।

—তুর্কী ভ্রমণে কেন এসেছেন?

—তুর্কী ইউরোপের পথে পড়ে বলেই আসতে বাধ্য হয়েছি। এতে কি কিছু অন্যায় হয়েছে, না তুর্কীর এতে কোন ক্ষতি হয়েছে?

—না, সেরূপ কিছু নয়। তবে, এদেশে বোধ হয় আপনিই দ্বিচক্রযানে প্রথম পর্যটক।

—বেশ ভাল কথা, একটা রেকর্ড হয়ে রইল।

—তুর্কী সম্বন্ধে আপনি কি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন?

—তুর্কী ঘন-তমসা হতে সবেমাত্র বের হয়ে তরুণ অরুণের সামনে দাঁড়িয়ে নূতন দর্পণে নিজের নূতন মুখ দেখছে।

—সে নূতন মুখ সুন্দর না বিতিকিচ্ছি?

—সে নূতন মুখ সুন্দর এবং স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ।

—মুস্তাফা কামাল সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

—তিনি নিশ্চয়ই আতাতুরুক। মহান।

—মহিলাদের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল?

—তারা ভারতীয় নারীদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—আপনি কি বলেছেন?

—আমি বলতে চেয়েছিলাম যেখানে পুরুষরা স্বাধীন নয়, সেখানে নারীর অবস্থা ভাল হতে পারে না।

—আমাদের দেশের নারীদের সম্বন্ধে আপনার কি মত?

—এইত মাত্র বোরখা খুলেছে। চোখ ফুটবে, তারপর শিক্ষা হবে এবং পরে তাদের কথা তারাই ভাববেন।

আবার, গোয়েন্দার সঙ্গে এমন সন্তর্পণে কথা বলতে গিয়ে ভিতর থেকে কেমন হাঁফিয়ে ওঠেন, তাও বলে ফেলতে পারেন সহজ অবলীলায়—'এরূপ করে কথা বলা যে কত কষ্টকর, যারা প্রশ্নের জবাব দেয় তারাই ভাল করে বুঝে। এই কয়টা কথার জবাব দিতেই আমার ক্লান্তি বোধ হয়েছিল।'

এই দুনিয়ার পথে ঘাটে ঘুরে ফিরে, সংখ্যাহীন সদর্থক ও নঞর্থক ঘটনার টানা-পোড়েনে তাঁর জীবনবোধের ব্যাপ্তি ছিল মহাকাশের মতো সীমাহীন। সেই সুমহান বোধের অঞ্চল থেকে আলোচ্য গ্রন্থে কিছু বক্তব্য রেখেছেন মাঝে মধ্যে, যা ধ্রুব তারার মতোই স্থির -অচঞ্চল ও চির ভাস্বর।

উদাহরণগুলি—(১) 'যারা লেনিন, ষ্ট্যালিন, সুন ইয়াত সেনের জীবনী পাঠ করেছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন, নেতাদের জীবন শুরু হয়েছে দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশের নেতাদের জীবন শুরু হয়েছে 'গর্ডন স্ট্রীট' না হয় ভারতীয় রাজপ্রাসাদে, প্রাচুর্য ও অপরিমিত ভোগবিলাসের মধ্যে। প্রভেদ এখানেই। তারপর আমাদের দেশের নেতারা চান বৃটিশকে তাড়িয়ে দিয়ে বৃটিশের স্থানে নিজে বসতে। মজুর, কৃষক, হরিজন, ছোটলোক যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। সেজন্যেই বোধ হয় তারা 'ছোটলোক' শ্রেণীর মানুষকে উঁচুতে উঠাতে চান না।'

(২) 'নিজেকে রক্ষা করবার শক্তি যাদের আছে, তাদেরই ভক্ত হওয়া সাজে, ভক্তি তাদেরই জন্য। যারা নিজেকে, নিজের মা-বোনকে রক্ষা করতে পারে না, তারা ভক্তি বুঝাতো দূরের কথা, কাপুরুষতাকেই ভক্তি বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে।'

(৩) 'সমাজের ব্যাধি উপদেশে যায় না।'

(৪) 'ব্যাবসা এবং দেশসেবা একসঙ্গে চলে না।'

(৫) 'যেখানে আমার স্বাধীনতা নেই, সেখানে আমার সততা আপনা হতে চলে যায়।'

(৬) 'মনে যখন ভয়ের সঞ্চার হয়, তখনই লোকে অজানা ভগবানের শরণাপন্ন হয়।'

(৭) 'মিথ্যেবাদী নিজের আত্মীয় স্বজনকেই প্রথম ঠকাতে আরম্ভ করে। তারপর অপরকেও ছাড়ে না।'

(৮) 'জাতের উন্নতির চিন্তা করে যার কপালের শিরা ভেসে উঠেছে, যার ঘন ঘন শ্বাস বইছে, সমাজ যাকে ঘৃণা করছে, না খেয়ে যে সমাজের উন্নতির চেষ্টা করছে, তাকেই বলি সমাজসেবী।'

'তরুণ তুর্কী' তাঁর প্রথম লেখা বই বলেই সম্ভবত কিছুটা চাপা উচ্ছ্বাস এসে পড়েছে। যদিও তা হানিকর মনে হয়নি কখনও। কিন্তু লেখকের সহজ-সরল-নিরহঙ্কার ব্যক্তিত্বটি ভারি সুন্দর ধরা পড়েছে পাঠকের চোখে। এখানে নির্লিপ্ত উদাসীন হয়ে উঠতে পারেন নি লেখক। অবশ্য তা চান নি কখনও। বরাবরই চেয়েছিলেন—তিনি নিজে যেমন, ঠিক তেমনটিই প্রতিফলিত হোক লেখার মধ্যে। তাঁর মত কট্টর স্পষ্টবাদী লোকের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। দেশটা সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা নিয়ে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ অন্য চিত্র দেখেন বিস্ময়ে-আবিষ্ট চোখে। ফলে, লেখার মধ্যেও এই ঘোরভাব কিছুটা ফুটে উঠেছে। দেশের নেতা ও সংগ্রামী জনগণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তবে তা সর্বত্র নয়, এই যা রক্ষে। বইটার প্রধান গুণ, দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া বরং সীমিত ঘটনাগুলিকে মূল ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে টান টান করে বাঁধতে চেষ্টা করেছেন, সংযত ভঙ্গীতে। নিজ দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার আলোয় লেখা 'তরুণ তুর্কী'-র ক্যানভাস'টি অযথা দীর্ঘ করেননি। যথাযোগ্য তুলির টানে তা বিশ্বস্ত ও সাবলীল। আর এই যোগ্যতার আকর্ষণই বইটির জনপ্রিয়তার মূল কারণ।

আজকের আমেরিকা

লেখকরা সাধারণত তাঁদের বই সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখেন 'ভূমিকা'র বকলমে। রামনাথ এমনিতেই ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। যা বলেন বা লেখেন তা জোরের সঙ্গেই করেন। সুতরাং তাঁর সব চাইতে জনপ্রিয় বইটিতে ভূমিকা-টুমিকার ধারে কাছে না গিয়ে চুম্বক-সূত্র হিসেবে শুরুর আগেই 'হেডিং' লিখলেন—

হক্‌কথা

'আজকের আমেরিকা দিনের আলোয় মুক্তি পেল। অবশ্য দেশবাসীকে বলব আমেরিকা আমাকে স্বামী বিবেকানন্দের মত অভিনন্দিত করে নি। বরং করেছে তার

বিপরীত। কারণ, এটলান্টিক চার্টারে ভারতের স্থান নেই। এ আর বেশী কথা কি? ভারতের ধূলিমলিন আসন নাই শ্বেত শুভ্র জাতির ত্রিসীমানার কোথাও। আমেরিকাও সে বর্ণকৌলীন্যে গায়ে ফুঁ দিয়েই চলে। তাই আমায় সে দেশে প্রবেশ লাভ করতে বেগ পেতে হয়েছিল দস্তুরমত।

আজকের আমেরিকার রূপটি বর্ণনা করবার আগেই আমায় বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছে যাত্রা পথের অশেষ বাধা-নিষেধের কথা—কয়েকটি অধ্যায়েই। তাই হচ্ছে আধুনিক আমেরিকার চিত্রায়ণের চাবিকাঠি। কেন না. সে চাবি দিয়ে হৃদয়ের দ্বার না খুললে আমেরিকাবাসীর অন্তরের পরিচয় অজানাই থেকে যায়। সাম্য ও মৈত্রীর ছায়াটুকু পর্যন্ত যে দেশে নজরে পড়লো না, সে দেশই নাকি বিশ্বপ্রেমের পুঁজিপতি—একথা যখন আমারই ভাই বন্ধুরা আমেরিকা থেকে ফিরে এসে জোর গলায় প্রচার করেন, তখন আমার মুখে ফুটে ওঠে দুঃখের হাসি। কারণ আর কিছুই নয়, আমেরিকা ফেরৎ ভারতবাসী হক্ কথা বলতে লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু আমার দুঃখ ও হাসি যে নিরর্থক নয়, যিনি এই বইখানি পড়বেন, তিনিই বুঝবেন।'

বইটির মূল সুর সম্বন্ধে পাঠকদের জানিয়ে রাখছেন, 'International' কথাটি গাল ভরা। আবার এর মোহও রয়েছে বেজায়। তবে তা Nation-এর গণ্ডিতে ঘেরা—ভারত সেখানে হরিজন, ভারত সেখানে অস্পৃশ্য। এমন কি ভ্রমণকারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিধানের লোভনীয় আমন্ত্রণ জানায় যে কোম্পানীগুলি, তাদেরও সব কিছু সমারোহ বর্ণে অভিজাতদের জন্য রিজার্ভ করা। কারণ, তারাই Nation। কাজেই Nation যাদের আছে, Nation-এর অধিকার তাদেরই। অ-শ্বেতের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তারপর বাস্তব আমেরিকা। দুচোখে যা দেখেছি তাই বলেছি। দেশবাসীর জানতে বাকি নেই যে আমি সব হারা। তাই রিক্ত বঞ্চিতদের সুখ-দুঃখ নিয়ে আমার জগৎ। আজকের আমেরিকা'ও মূলতঃ সে সুরেরই পরিচয়।'

ছোটবেলা থেকেই রামনাথের জানার অনুসন্ধিৎসা ছিল সীমাহীন। একটা ছোট্ট নোটবুক, ও পেন্সিল সঙ্গে নিয়ে ডাকাবুকো পা বাড়াতেন খবর সংগ্রহের জন্য। দিনের যখনই সম্ভব হোত, এমন কি রাত্রেও বেরিয়ে পড়তেন, যে কোনও পরিবেশে, যে কোনও অবস্থায়। হন্যে হয়ে তথ্যের পিছনে পিছনে তাড়া করে ফিরতেন, দরকার হলে ছদ্মবেশ গ্রহণ করে। এমনও হয়েছে—খবরের আশায় এঁটো খাবার চেয়ে ভাগ করে খেতে হয়েছে। বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন ভিখারীর সঙ্গে। এই সূত্রেই জেনে নিয়েছেন—"একদিকে ধনীদের উদ্দাম ভোগ বিলাস আর অন্যদিকে যে সকল লোক তাদের সারা জীবনের সমস্ত শক্তি সমাজের হিতের জন্য ক্ষয় করেছে তাদের হাহাকার।" আমেরিকান সভ্যতার ইমারত গড়তে একসময় যারা মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করেছে, এখন সেই অধম বেকার মজুরদের জন্য 'ব্রেডলাইন' আবাসগৃহে প্রবেশ (সাংবাদিকের ভঙ্গিতে সুবিধা করতে না পেরে নিগ্রোদের আদব কায়দা ও চলন বলনের সার্থক প্রয়োগে তথ্যানুসন্ধানে সফল হন) করে দেখেন, তারা বেঁচে আছে কয়েদিদের অধম অবস্থায়। যাদের পূর্ব অবদানের ভিত্তিতে পেনসনের ব্যবস্থা করা যেত অনায়াসে। মজুরের কোনও দাম নেই বলেই কাজ অনুযায়ী তালিকা রাখার তাই প্রয়োজন হয় না

এদেশে। "অথচ, আমেরিকায় ধনীরা যখন গমের দাম ঠিক মত পায় না, তখন তারা গম পুড়িয়ে ফেলে। চিনি নষ্ট করে দেয়। বাগানের ফল বাগানে পচে। এরকম মজার দেশ আর কোথায় আছে? অথচ এরাই সোভিয়েট রুশের বিরুদ্ধাচরণ করে বেশী।"

তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছেন, আমেরিকার খৃষ্টান খৃষ্টানদের রক্ত চুষে খাচ্ছে, কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। অথচ ধনী এবং দরিদ্র ইহুদীদের প্রতি খৃষ্টানদের যেন জাতক্রোধ ফুঁড়ে বের হয়। এমনই এক ধর্মের ধ্বজাধারী ফাদার হুপ্‌কিনের নাম শুনলে লেখকের আতংক হোত। কারণ, এই মানুষটা এবং তাঁর গোষ্ঠী আমেরিকাতে আর এক 'আঙ্কল টমস কেবিন' সৃষ্টি করতে আগ্রাসী নীতিতে বিশ্বাসী। এরা চায় আমেরিকা হতে ইহুদী বিতাড়িত হোক, নিগ্রোরা নিপাত যাক। আর যে সমস্ত প্রগতিশীল ভাবাপন্ন মানুষ এদের রক্ষা করতে চায়, তাদের শূলে চড়ানো হোক।

আরও লক্ষ্য করেছেন, আমেরিকায় পাদ্রীরা যেমন 'মদ খেয়োনা' উপদেশ দেয়, অথচ চব্বিশ ঘন্টা মদের দোকান খুলে রাখার ব্যবস্থা আছে। তেমনিই, যুবক-যুবতীদের নানা উপদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের ধ্বংসের পথ এত ব্যাপকভাবে খুলে রাখা হয়েছে, যে তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।'

'মানহাটন' দ্বীপের উত্তর পশ্চিমাংশ অঞ্চলের নাম 'হারলাম'। এখানকার বাসিন্দা সব নিগ্রো। অথচ, সন্ধের পর থেকে শ্বেতকায়দের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। অর্থাৎ এটি তখন হয়ে ওঠে রাতের ভূস্বর্গ। কেন্দ্রবিন্দু নাইট ক্লাব। উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখেন জৈব-তাড়নার ক্ষেত্রে সাদা-কালো, জাত-বেজাত বলে কিছু নেই এখানে। সব মিলেমিশে একাকার। তাঁর ভাষায় 'হারলাম' হল একটি পূর্বদেশীয় হারেম।

বিজলী বাতির উত্তাপে 'হারলামে'র প্রশস্ত পথগুলিতে বেড়াতে ঘাম বের হয়ে যাচ্ছে। এলেন সেন্ট্রাল পার্ক ঘুরে ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউয়ে, ঝলমলে ঐশ্বর্যের মাঝে। অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, সান্ধ্য-আনন্দ-ভ্রমণে ধাবমান গাড়ির চক্‌মকানি ও আরোহীদের উচ্চ কলহাস্য, হোটেলে মদের ফোয়ারা, সুন্দরী তরুণীর উচ্চকিত হাসি, নাচ-গান, সিনেমা-গৃহে বাজনার তালে তালে নৃত্য-ঝঙ্কার, হাতে হাত ধরে উচ্ছল যুবক-যুবতীর পথ চলা—সব মিলিয়ে ভোগ-বিলাসে পরিপূর্ণ যেন এক হীরক রাজার দেশ।

আবার, "এরই পাশে মাত্র ক'হাত দূরে দেখা যায়, নিরন্ন বেকার ও ক্ষুধিতের ব্যর্থ জীবনের করুণ দৃশ্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ আমেরিকার ব্যাঙ্কে সোনা আছে, টাকা আছে। বাগানে ফল, মাঠে পর্যাপ্ত ধান-গম, নদীতে জল এবং দোকানে কাপড়-জুতো ইত্যাদি সবই আছে। কিন্তু ঐ ভিখারীদের কিছুই নাই। পরণে ছেঁড়া ট্রাউজার, গায়ে ছেঁড়া কোট। কারও গায়ে সার্ট আছে, কারও বা তাও নেই। নেকটাই কিন্তু তবুও ঝুলছে"।—এসব লক্ষ্য করেছেন রাত দুটো পর্যন্ত, নিজে ভিখারী সেজে। যদিও তৈরী হয়ে আসা এবারের ভ্রমণে তাঁর কাছে পর্যাপ্ত টাকা ছিল।

মহাসাধক রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং অন্তেবাসী খ্যাত চিকাগো। সেখানে বিবেকানন্দের স্মৃতি বাহিত বেদান্ত সোসাইটি খুঁজে পেতে তাঁর কাল-ঘাম ছুটে যায়। অনেক কষ্টে পৌঁছে দেখেন প্রতিষ্ঠানটি টিম্ টিম্ করে ধুঁকছে। যেহেতু বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভালবাসা ছিল নিখাদ, সেইহেতু চিকাগো হাজির হন অনেক আশা

নিয়ে। কিন্তু দেখার পর তাঁর ধারণা চুরমার হয়ে যায়। কারণ, "নগরের সকলেই যেন আলাদীনের প্রদীপ হাতে করে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে, রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্যে। একটা প্রকাণ্ড নগর, বুভুক্ষা রাক্ষসী যেন হাঁ করে আছে।"

তিনি সজাগ ছিলেন, পাছে সাদাদের দেশে তাঁকে অনেকেই নিগ্রো ভেবে ভুল করে। সে সময় নিউইয়র্ক-এ দোকানীরা পর্যন্ত নিগ্রোদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করত না। 'উল্টা বুঝলি রাম'-এর পাল্লায় না পডতে, কি মনে করে আমাদের আলোচ্য মানুষটি মাথায় পাগড়ী জড়িয়ে হাঁটছেন 'অষ্টম অ্যাভিনিউ' ধরে। কিছুদূর যাবার পরই ইহুদী এবং আরবেরা "প্রিষ্ট, প্রিষ্ট" (পুরোহিত) বলে চীৎকার জুড়ে দেয়। তাদের এড়িয়ে হাঁটতে গিয়ে থমকে পড়তে হয়। সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে তিন আমেরিকান যুবতী। তিনটি ডলার বাড়িয়ে ধরে ভাগ্য জানতে চায়। হিন্দু 'অকাল্টটিষ্ট', 'স্পিরিচুয়েলিষ্ট', 'পামিষ্ট' এসবের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস জানিয়ে বলে, "আমেরিকাতে হিন্দু ও জিপসীরা এসব কবেই দুপয়সা রোজগার করে, আপনি তা থেকে বাদ যেতে পারেন না, এসব যদি আপনি না জানেন বলেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি হিন্দু নন।"

এমন কথা যদি কোনও পুরুষ মানুষ বলে ফেলত, তবে সেদিনটি হোত তার নির্ঘাৎ দুর্দিন। দাঁত দুপাটি থাকত কিনা, সন্দেহ। কিন্তু নারী জাতিকে এমনিতেই দারুণ সম্মান দিতেন মনের তাগিদে। তা সে আঘাত করলেও। তবু, লেগেছে আত্মপুরুষের চেতনায়। ধাক্কা দেওয়া হয়েছে জাতীয়তাবোধের গভীরে। সুতরাং পাগড়ীর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আসল রামনাথ—"আপনারা হিন্দুদের সম্বন্ধে যে ধারণা করে রেখেছেন, তা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের মাঝে অনেক লোক আছেন যারা আপনাদের চেয়ে কম সভ্য নন। শিক্ষায়-দীক্ষায়, এমন অনেক হিন্দু আছেন, যাদের সঙ্গে আপনাদের দেশের অতি অল্প লোকেরই তুলনা করা যেতে পারে। এখন আপনারা আপনাদের পথ দেখুন।" তিনজন চলে যেতেই সমস্ত রাগ ঘুরে গিয়ে ধাক্কা খেল পাগড়ীর ওপর। ফল—বেচারীর তৎক্ষণাৎ আছাড় খেয়ে রাস্তার ধূলায় গড়াগড়ি।

এখানে আসার পর 'মিঃ দান্তে' নামে একজন পর্যটকের সঙ্গে অ'লাপ হয়। তিনি পৃথিবীর যত পরাধীন জাত আছে, তাদের সকলের জন্যেই দরদী। তাঁরই চেষ্টায় ভারতীয় পর্যটককে কেন্দ্র করে একটি সভা আহূত হয়। কিন্তু তাঁকে দর্শনমাত্র দর্শক-শ্রোতাদের বিষণ্ণ মুখ দেখে বুঝলেন, শরীরের রঙ যে দেশে শিক্ষা-দীক্ষার মাপকাঠি, সেখানে মনুষ্যত্বের স্থান হতে পারে না। দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিলেন —"Blood preservation is nothing but borborism" আমেরিকাবাসী যদি সে দোষে দোষী না হত তবে আজ 'হারলাম' তৈরী হোত না। শ্বেতকায়দের নিগ্রো ভয় থাকত না।"

একথা বলার পরক্ষণেই মনে পড়ে নিজের দেশের কথা। সেখানেই বা কি চেহারা? মনে মনে আত্মশুদ্ধির ভঙ্গিতে বললেন,—'গীতা থেকে আরম্ভ করে সেন বংশ পর্যন্ত সকলেই বর্ণ-শঙ্করদের ভয়ে অস্থির ছিলেন। তারপর আরও এগিয়ে গিয়ে যদি হরিজনদের কথা বলি, ...বিদেশে গিয়ে এসব কথা বলা চলে না। ...সময় থাকতে সংশোধন না করলে ভারতের দিকে কেউ সুদৃষ্টিতে চাইবে না। অতএব হুঁশিয়ার।'

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তখন 'ডিমোক্র্যাট' পার্টির রুজভেল্ট। তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসনের মধ্যেও রামনাথ প্রগতিশীল যুবক-যুবতী বা কমিউনিস্টদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। যাদের সাধারণ লোক ঠাট্টা করে বলতো 'পারসেনটেজ'। এরা নিগ্রোদের জন্যে যেমন শ্বেতকায়দের মতো অধিকার চায়, তেমনি নিরন্নদের মুখে অন্নের ব্যবস্থা দাবী করে। যদিও আমেরিকায় কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি। কমিউনিস্ট বলে প্রমাণ হলে কাজ করার অধিকারের কার্ডটি কেড়ে নেওয়া হয়। সান ফ্রান্সিসকো থেকে প্রকাশিত পাঁচ সেন্ট মূল্যের 'পিপলস্ ওয়ার্ল্ড' সংবাদপত্রে এদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও আমেরিকার বুকের ওপর ধনীদের নির্মম অত্যাচার কাহিনী বের হোত। ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্টের ডেমোক্রেসীর দেশে লেখকের বিস্ময় বিহ্বল অভিজ্ঞতা লাভ হয়, পার্কে বসে 'মস্কো নিউজ' পড়লে গুপ্ত পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায়।

তথ্যানুসন্ধানী সেদেশে ধনীক শ্রেণীর শ্রমিক দরদের বৈপরীত্য আঁতিপাতি করে যোগাড় করেছেন। 'সি.আই.ও.' নামে সংগঠনটি মজুর ও গ্রামের লোককে সাহায্য করে। আবার আর একটি সংগঠন 'ফেডারেশন অব লেবার' প্রতিবন্ধক জন্মায়। সাদা মজুরদের ঘুষ দিয়ে মজুরে মজুরে যাতে বিবাদ হয়, তারই চেষ্টা করে। মজুর হয়ে মজুরদের অহিত ঘটায়।

এই দ্বিতীয় বারেও আমেরিকা প্রবেশ মাত্র বাধার পর বাধা পান। তিনি তো ধরেই নিয়েছিলেন প্রথমবারের মতো ২৯ দিন না হোক কয়েকদিন অন্তত 'ডিটেনশান ক্যাম্পে' থাকতে হবে, চামড়া কালো বলে। কিন্তু না। 'দেশ' পত্রিকার পরিচালক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের লিখিত অনুরোধে এই পত্রিকার আমেরিকা প্রবাসী লেখিকা কমলাদেবী মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ইমিগ্রেশন বিভাগের বেড়াজাল ভেদ করে বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে তো এলেন। কিন্তু শুরু হলো সাদা চামড়া কর্তৃক 'জায়গা নেই' ঘোষণা। তারপর কেবলই গলা ধাক্কা খাওয়ার অভিজ্ঞতা। অপমান-হেনস্থার একশেষ থেকে শুরু করে, পিটুনি খাওয়া সয়ে মরণ-বাঁচন সমস্যায় পর্যন্ত পড়েছেন বারবার। এবারের আমেরিকা ভ্রমণই তার পরিক্রমার শেষ এবং নিদারুণ যন্ত্রণাময়। তবু মহৎপ্রাণ মানুষটি ন্যায়কে ন্যায়, অন্যায়কে 'অন্যায়' বলতে কখনও পিছুপা হন নি। ঈর্ষা বা হিংসা তাঁর বীর মনকে ক্ষত-বিক্ষত করতে পারে নি। সাময়িক দুঃখ-কষ্টের মেঘ কখনও তাঁর উদার মনের আকাশকে স্থায়ী আড়াল করতে সক্ষম হয় নি। সেজন্যই আমেরিকায় দাঁড়িয়ে দুঃসাহসী রামনাথ নির্দ্বিধায় সেখানকার রিপোর্টারকে বলতে পারেন, ''এদেশেও ডেমোক্রেসী নাই। এদেশেও লোক অভুক্ত অবস্থায় থাকে। ডেমোক্রেসী যে সমস্ত দেশে বর্তমান আছে, সেখানে কেউ উপবাস করে না। সকলেরই কাজ করার অধিকার আছে এবং সকলেই কাজ করছে। এখানে বেকার মজুরের সংখ্যাও উপেক্ষা করবার মত নয়। পুঁজিবাদীরা মুখে বলে তারা ডিমোক্রেটিক, আসলে কিন্তু তারাও এক ধরণের ফেসিস্ত''। আবার পরক্ষণে তিনিই উদার অকপট ভঙ্গিতে বলতে পারেন—''তবে একটি কথা শুনে সুখী হবেন মিঃ রিপোর্টার, আপনারা এদেশে যত উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছেন, অন্য কোন দেশ সেরূপ উন্নতি করতে সক্ষম হয়নি। আমি আপনাদের দেশের খারাপ দিকটা

দেখার জন্য আসিনি, আমি এসেছি আপনাদের দেশের ভালর দিকটা দেখতে।''

জনবহুল টাইমস্ স্কোয়ারের ভূগর্ভস্থ রেলপথ, উপরিভাগে অভূতপূর্ব জনতা ও যানবাহনের জন্য উন্নত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং মানুষ তা নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে মেনে চলে দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমেরিকার পল্লীগ্রামে ঘুরে অভিভূত হয়েছেন। সেখানে ধর্মের বদখেয়ালী নেই বলে, বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে গ্রামগুলি হয়েছে চিরনূতন।

পৃথিবী বিখ্যাত ওয়ালস্ স্ট্রিটে পৌঁছে খোঁজ খবর করে জানলেন, এখানে বসেই আমেরিকার ধনীরা পৃথিবীর বাণিজ্য, সাম্রাজ্যবাদ এবং 'মনরো' নীতি পরিচালিত করে। এমন কি নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে জনমতের প্রতিনিধিদের বশীভূত করে ফেলে। সেই সঙ্গে এটাও দেখতে ভুল করেন নি, প্রধান দুটি দলেরই কাজ ছিল, একদল অন্য দলকে টেক্কা দিয়ে জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জন করা। ফলে. সবদিক থেকেই বাহ্যিক উন্নতি হচ্ছিল আমেরিকার।

আবার, ওয়ালস স্ট্রিটের শেয়ার মার্কেটের হল ঘরে গিয়ে আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, কোথাও উদ্ভট চিৎকার চেঁচামেচি হৈ-হল্লা নেই। অথচ, ''বোম্বের শেয়ার মার্কেটে গিয়ে কতকগুলি পাগল দেখে ভয় হচ্ছিল। এদের হাতেই যদি আমাদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিতে হয়, তবে বড়ই বিপদে পড়তে হবে। সুখের বিষয়, ওয়ালস্ স্ট্রিটের শেয়ার মার্কেট সেরূপ নয়। এখানে শৃঙ্খলা বিরাজমান। ক্রেতা ও বিক্রেতা ধীরে ধীরে কথা বলে। একেই বলে ইউরোপীয় সভ্যতা। এখানে একে অন্যের সুযোগ ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই কাজ করে। বোম্বেতে সেরূপ কিছুই নাই।''

আমেরিকার ভারতীয় প্রবাসীদের সংখ্যা তখন তিন হাজার। এই সমস্ত প্রবাসীরা, 'মিস মেয়ো' যিনি ভারতবর্ষের নর্দমা ঝাঁট দিয়ে ভারতের সম্বন্ধে বই লিখেছেন এবং আমেরিকায় কোন৬ ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা করতেন না, তাঁর পাল্টা আমেরিকার বিরুদ্ধে কিছু লিখতে উৎসাহ এবং উস্‌কানি দিয়ে বহু জায়গায় নিয়ে যেত। তাঁরা 'যে যা বলতেন সব কিছুতেই আমি সম্রাট নাসিরুদ্দিনের মতো ''তাই হবে'' বলে সায় দিতাম। কিন্তু মনের কথা কারও কাছে বলতাম না।' তাঁর মনের কথা ছিল—এই সুযোগে আমেরিকাকে আরও ভালভাবে দেখা, চেনা, জানা, বোঝা ও ভাল-মন্দ সমস্ত কিছু খতিয়ে মূলত ভালোর (যা সত্যিই বেশি) দিকগুলি দেশে গিয়ে প্রচার করবেন। তাতে দেশের ভালই হবে। বাস্তবিক তিনি দেখেছেন—আমেরিকার বাসগৃহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, পথঘাট ও জীবনযাত্রার উন্নত ব্যবস্থায় মোহিত হয়ে ভারতীয়রা তখনই সে দেশকে স্বর্গ মনে করত।

বিশেষজ্ঞের মতামত দিয়েছেন বস্তুত ৩টি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রেখে— (১) সারা পৃথিবী ঘুরে পুলিশের ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে আমেরিকা পুলিশের শিষ্ট ও সুন্দর ব্যবহাবে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। (২) আমেরিকার ভুবন ভোলানো সৌন্দর্য, বিশেষ করে রাতের আমেরিকার সৌন্দর্য্যের কোনও তুলনা নাই। (৩) আমেরিকায় ধর্মীয় বাড়ি, গির্জা থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে উৎপাদন পর্যন্ত অনেক কিছু করা যায়। অনেক সময় যা খুশি। কিন্তু তা দেশের স্বাস্থ্য বিধিকে অমান্য করে কিছুতেই

চলবে না। তাহলেই কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা।

পৃথিবী পর্যটন সেরে 'আজকের আমেরিকা'র শেষে স্বীকার করেছেন—''জার্মান ও জাপান তো সামান্য ব্যাপার। অমন জবরদস্ত গ্রেট ব্রিটেন বা ইংলন্ডের চেয়ে আমেরিকা বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। কারণ ইংলন্ডের ধনী পাড়ার চেয়ে আমেরিকার নিগ্রো পাড়া অন্ততঃ কুড়িগুণ ভালোভাবে থাকে। কেবল আমেরিকা হতে যেদিন আর্থিক ও বর্ণবৈষম্য লোপ করবে, সেদিনই যথার্থ খাঁটি ডেমোক্রেটিক দেশ বলে গর্ব করতে পারবে।'

'আজকের আমেরিকা'য় প্রবাদসম উক্তিগুলি : —

(১) 'যেখানে সহিষ্ণুতা বিদ্যমান, সেখানেই স্বাধীনতার অঙ্কুর গজায়। সেখানে সুখ এবং শান্তি আপনা আপনি হতে এসে দেখা দেয়।'

(২) 'হ্যাটকোট' পরলে এবং মদ খেলেই যদি ইউরোপীয়ান মেজাজ হত তবে গাধাও সিংহ হয়ে যেত। অনেক স্কচ্‌ম্যান পর্যন্ত Inferiority of complexion হতে বাদ পড়ে না, কিন্তু তারাও আমাদের দেশে বড়লাট হয়। Inferiority of complexion যদি দূর করতে হয় তবে সকল সময় যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়। এমন কি মরণও বরণ করে নিতে হয়। মাথা নত না করাই হল ইউরোপীয় মেজাজ।'

(৩) 'যেদিন এই পৃথিবীতে আমার জন্ম হয়েছিল, সেইদিনই আমি পলিটিক্‌সের আওতায় এসেছি। পলিটিক্‌স ছাড়া কোন মানুষ বাঁচতে পারে না'।

সাংবাদিকের স্বাধীনতার দৌড় যে সাধারণত সংবাদপত্র মালিকের 'হাঁচি-কাশির' ওপর নির্ভরশীল, এটা তখনই তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে—

(৪) 'জারনেলিস্ট শব্দের অর্থ আমাদের দেশে 'সংবাদপত্রসেবী' বলেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর কোথাও জারনেলিস্ট শব্দের ব্যাখ্যা আমাদের মত করে না। ''সংবাদপত্রসেবী'' শব্দ ব্যবহার করার সময় এ পৃথিবীতে কখন আসবে তা জানি না। যখন লোক ঠিক ঠিক ভাবে সংবাদপত্রের সেবা করবে তখন ''কর্তা ইচ্ছা কর্ম'' হবে না। সাহিত্যিক মজুরগণ তখন স্বাধীনভাবে আপন আপন মনের কথা বলতে সক্ষম হবে।'

(৫) 'অর্থের ধর্মই হচ্ছে কেন্দ্রীভূত হওয়া'।

আলোচ্য বইটি তাঁর অন্যান্য ভ্রমণকাহিনীর চেয়ে মনে হয়েছে সফল। এর মধ্যে অসংলগ্নতা যেমন কম, তেমনি অনেক বেশি সুসংহত। কেপটাউন থেকে যাত্রা শুরু করে মনোহর মেডিরা দ্বীপ ছুঁয়ে লন্ডনে পৌঁছে তারপর হন আমেরিকা মুখী। পশ্চাৎপটের ব্যাপকতা থাকলেও, বেশ কিছু বাধা-নিষেধের উল্লেখ করলেও, ক্রমশ তরতর করে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন। ভাষা ও রচনাশৈলী এখানে যথেষ্ট প্রাণ পেয়ে ভ্রমণ কাহিনীকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। সে দিক দিয়ে 'আজকের আমেরিকা' তাঁর সফলতম রচনা।

মরণ বিজয়ী চীন

এখানেও শুরুতে 'ভূমিকা'র পরিবর্তে আত্মকথার ধরণে লিখেছেন—

আমার কথা

'মরণ বিজয়ী' চীন প্রকাশিত হল পৃথিবীব্যাপী জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সংঘাতের ভিতর। সাম্রাজ্য লালসার রুদ্র তাণ্ডব জয়রথ চালিয়েছে আজ চীনের বুকে।.... পরিশেষে আমার চীনের অভিজ্ঞতা, চীনের স্বরূপ চিনতে আমায় যতটুকু সাহায্য করেছে, তা থেকে বলতে পারি, সারা দুনিয়ায় যদি কোন জাতি ভারতের প্রকৃত দরদী থেকে থাকে, তবে সে চীন। তাই আজ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমার অন্তর্বেদ—মহাচীনের সুখ-দুঃখের কাহিনী—আমার দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করে মরমী চিন জাতির অপরিশোধ্য ঋণ পুনরায় স্বীকার করে নিচ্ছি।

ঘাত-সংঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, গোপন স্রোত আর অজানার টান আজ চীনের দিকে দিকে যে রং বদলের সমারোহ পুঞ্জীভূত করেছে—প্রতিষ্ঠা করেছে মহাচীনের মহাপ্রাণ—বহু শতাব্দীর ব্যর্থ আকাঙ্খার পর তা পুষ্পিত স্বর্গ রচনা করুক। চীনের সুখ-সরোবরে, পিকিনের পদ্মসরের মত, অম্লান কমল চির-প্রস্ফুটিত হয়ে চীন রিপাবলিকের জয় ঘোষণা করুক।'

বাণিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট — গ্রন্থকার

চৈত্র, ১৩৪৭

'মরণ বিজয়ী চীন' বইটি বেশ কয়েকটি কারণে বিশেষত্ব অর্জন করেছে। বইটি আর্থিক দিক থেকে মূল্যবান। ছয় টাকা। ১৯৪১ সালের ছয় টাকা অর্থাৎ আজকে একশ টাকারও অধিক। অন্য অর্থেও মূল্যবান। কেননা সমগ্র রামনাথকে বুঝতে এটি খুবই সাহায্য করে। উপরন্তু তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টা সর্বাধিক রঙ ফলিয়েছে এখানেই। কি বর্ণনায়, কি অভিজ্ঞতায়, কি ব্যাপকতায়। ফলে, অন্যান্য বইগুলির মধ্যে এটিই বৃহদাকার। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য আছে আর এক দিক থেকেও। এটি তাঁর দ্বিতীয় জনপ্রিয় এবং আর সমস্ত দেশের মধ্যে লেখকের মণিকোঠায় চিনদেশই প্রিয়তম। কারণ, যে অভিজ্ঞতার ঝোলা তিনি ভরতে চেয়েছিলেন, তার একটা বড় অংশ সফল হন চিনে। এখানে বিপদে পড়া এবং তা থেকে মুক্ত হওয়া ঘটেছে অসংখ্যবার। যেমনি বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত হয়েছেন, তেমনি স্থিতধী হয়ে পেয়েছেন চিন্তার খোরাক, বহু ধারায়। বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শ তাঁকে দিয়েছে তাদের অন্তর্লোক উন্মোচনের চাবিকাঠি। শত আপদে বিপদেও চিন দেশের নারী-পুরুষের কাছে যেভাবে স্নেহ-ভালবাসা-সেবা পেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন, তা ছিল তাঁর স্বপ্নাতীত। তাই একবারের জন্যেও ভোলেননি, অকুণ্ঠচিত্তে ঋণ স্বীকার করতে।

নিজেকে বিচিত্র ভঙ্গিতে মেলে ধরে, 'মরণ বিজয়ী চীন' এর উদ্বোধন ঘটিয়েছেন, দারুণ মুন্সিয়ানায়। "আমার জন্মলগ্নে কোন ভ্রাম্যমাণ উদ্ভট গ্রহের বক্রদৃষ্টি ছিল হয়তো। নতুবা শিশুকাল থেকে একটা ভবঘুরে বৃত্তি এমন করে আমায় পেয়ে বসবে কেন? নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে জীবনটা যখন ছত্রিশের কোঠায় এসে ঠেকল তখন ভাবলাম, এবার বুঝি জীবনের সব দেনা চুকিয়ে ফিবে যাবার সময় হ'ল। কিন্তু ভিতর থেকে প্রবল একটা ঝাঁকানি দিয়ে কে যেন বলল এগিয়ে যেতে। সে আদেশ

অবহেলা করার শক্তি আমার ছিল না। তাই অজানাকে জয় করার মোহ আবার আমায় প্রলুব্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বিশ্বকবির কবিতাটিও মনে পড়ল :

"আমার এ যাত্রা হল শুরু

বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক।
ফিরব না'কো আর"।

শেষ পংক্তিটি বারবার আবৃত্তি করে বললাম, যে কয়টা দিন বেঁচে থাকি, আমার এ চলার যেন আর শেষ না হয়। পথ চলার আনন্দের গানে গানেই যেন এ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৩১ সনের জুলাই মাসের সাত তারিখ। কপর্দ্দকহীন নিঃসহায়— একখানি মাত্র সাইকেল নিয়ে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করলাম। এবারকার যাত্রা সুদূর কোন সে যুগের মানব সভ্যতার প্রতীক মহাচীনের দিকে।

শ্যামদেশের শ্যামল মাটি ছাড়িয়ে, মলয়ের ধূলা উড়িয়ে, ইন্দোচীনের বুক পেরিয়ে নবজাগ্রত মহাচীনের দ্বারে এসে যখন প্রণতি জানালাম, তখন 'সেলেশ্চিয়েল এম্পায়ার' বা স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রজাল আমার মনে অনেকখানি রঙ ধরিয়ে দিয়েছে।"

'চক্রার্ট' মশাই চিনে পা বাড়িয়েই অনুভব করেছিলেন মহাচিনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ থাবা বসিয়েছে। 'তার বিশাল ভূখণ্ডকে রুটির ছিলকার মত ভাগাভাগি করে মনের সাধ মিটিয়ে ভোগ করছে। এছাড়া চীনকে অবাধে শোষণ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা 'অবারিত দ্বার' নীতিরও অনুসরণ করছে। যা চীনের সর্বনাশের জন্য কম দায়ী নয়। বর্ত্তমানে চীনাদের মধ্যে প্রাদেশিকতার গণ্ডী ভেঙে ছোটখাটো হীনভাব মন থেকে তাড়িয়ে এক অখণ্ড মহাচীনের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এসেছে অভূতপূর্ব গণজাগরণ। ফলে বিদেশীদের স্বার্থের এই মারাত্মক নাগপাশ হতে মুক্তি পাওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।"

আলোচ্য অংশটি প্রকৃতপক্ষে ১৯৩১ সালে চিন ভ্রমণের ডায়েরি থেকে চয়ণ করা। পরবর্তীকালে তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। শৃঙ্খলের বেড়ি কেটে বেরিয়ে পড়ে সে দেশ মাও সে তুঙ-এর নেতৃত্বে স্বাধীনতার স্বাদ পায় ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে।

'মরণ বিজয়ী চীন' বইটি থেকে আমরা জানতে পারি, চিন দেশে স্বেচ্ছাচারী রাজারা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেছে। দীর্ঘ শোষণ নিপীড়নের পর সাধারণ মানুষ উষার আলো দেখল, বিশ্ববিশ্রুত দেশপ্রেমিক সান ইয়াৎ সেনের আবির্ভাবে। তিনি দেখালেন মুক্তির পথ। কিন্তু মহাকাল তাঁকে ছিনিয়ে নিল। এলেন মহারাজা চিয়াং কাইশেক। একরকম দেশদ্রোহী। অপরদিকে, নবজাগরণের জোয়ার এসেছে চিনদেশে। যুবক-যুবতীগণ 'মুক্তিফৌজে' অংশ নিয়ে দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করতে তলে তলে 'করব নয় মরব' আত্মত্যাগব্রতে ছুটে চলেছে মরণকে তুচ্ছ করে। অথচ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের মদতে একই সাম্রাজ্যলিপ্সু জাপান সংগঠিতভাবে চিয়াং কাইশেকের মারফত চিনের সমস্ত প্রগতিশীল তথা শিক্ষিত নরনারীদের সমূলে বিনাশ করতে উদ্যত। অপরপক্ষ সেটাকেই প্রতিরোধ করতে

দৃঢ়সংকল্প। প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে কেমন করে কমিউনিস্ট সৃষ্টি হয়েছে চিন দেশে, তার মর্মস্পর্শী বিবরণ পাই—'ক্যান্টনে অচল ট্রাম লাইন গায়ের জোরে সচল হলে রিক্সা ওলাদের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। হাজার হাজার লোক মিলে লাইনের অনেকটা তুলে দিলে গুলি চলল। তবু শহরে ট্রাম আর চলতে দিল না। যারা মরল, তারা তাদের সহকর্মীদের পথ সুগম করে শহীদ হলো। ধনীরা তাদের নাম দিল কমিউনিষ্ট। সাধারণ মানুষ ভগবানকে নামিয়ে আনতে পারছে না পৃথিবীর পথে। দরিদ্রের দল না খেয়ে পথে পথে ঘুরে কুকুর-বিড়ালের মত মরছে, আর চীনের ধনীর দল কাফে, ক্যাবারে, থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও-এসব বিলাস নিয়েই মশগুল। তা দেখে কি ঐ মুক্ত বীর যুবকের দল নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে? জীবনের পানপাত্রখানি তাই মৃত্যুর আশিসে পূর্ণ করে তারা নিঃশেষে পান করে। নীলকণ্ঠের মত হয়ে পড়ে অমর। আজ চীনা যুবক-যুবতী কামনা-লালসা পরিত্যাগ করে কর্মের ব্রত নিয়েছে দেখে জাপানের মুখ শুকিয়েছে। ঐ ব্রতচারী এবং ব্রতচারিনীদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, ফিরে তাদের যেতেই হবে একদিন। এতো এদের মৃত্যু নয়, ব্রত উদযাপন। মাতৃপূজার যজ্ঞে চরম ও পরম আহূতি'। এক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হয়, সাহিত্যিক রামনাথের পাশাপাশি ধেয়ে চলেছেন মানুষ রামনাথ। তুলনায় বরং মনুষ্যত্বের উন্মোচনেই লেখক বেশি উন্মুখ।

রামনাথ তাঁর অনুসন্ধানী স্বভাব সূত্রে জেনে নিয়েছেন, চিনা যুবক জামার মধ্যে বোমা লুকিয়ে জাপানী ট্যাঙ্কের নীচে গড়িয়ে পড়ে ট্যাঙ্ক চুরমার করে দিতে এবং একই সঙ্গে নিজে মরতে একটুও কাঁপে না।

অন্যপক্ষে শাসন-পীড়নের মাত্রাও ছাড়িয়ে গেছে তেমনি নিষ্ঠুরতম উপায়ে। মা ও ছেলে-মেয়ের সামনে গৃহকর্তার ধড় এবং মুণ্ড এককোপে আলাদা হয়ে গেল। ফুটন্ত যোয়ান ছেলেদের পিছু মোড়া করে ধরে এনে ঘাড়ে পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টানলে সাঙ্গ হয় ভবলীলা। গ্রামকে গ্রাম গণহত্যা ও লুঠতরাজ শেষে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে শ্মশানে পরিণত হয়ে যায়। এ সমস্তই ঘটে গেছে লেখকের চোখের সামনে। গোলাপের মতো যুবকদের মৃত্যু দেখে রামনাথের মানবাত্মা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে হায় হায় করে উঠেছে—'যারা মুক্ত তাদের প্রাণ কাঁদে মানবের উপর মানবের অত্যাচার দেখে। একদিকে জাপান ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে, অপরদিকে চীনা ধনীর দল চিয়াং কাইশেককে কেন্দ্র করে করছে শাসন এবং শোষণ। দরিদ্রের দল আর্ত চিৎকারে হাহাকার জানালেও ফল হয় না। তিনি সারা দেশ ঘুরে দেখেছেন দেশটা অতি সন্তর্পণে এবং স্থির সঙ্কল্পে মহান আত্মত্যাগ ও সুবিশাল কর্মযজ্ঞের প্রচণ্ড শক্তিতে এগোচ্ছে। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন এ জাতিকে কিছুতেই গলা টিপে শেষ করা যাবে না। মৃত্যু যাদের কাছে পায়ের ভৃত্য, তারা আত্মশক্তির দুর্মর প্রতাপে 'মরণ বিজয়ী চীন' প্রতিষ্ঠা করবেই'।

অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে চিন দেশেই তাঁর আপদ-বিপদের রাস্তা পার হতে হয়েছে সব চাইতে বেশি। তবু সে দেশটাই তাঁর কাছে সবচাইতে প্রিয়।

এ দেশের মানুষজনের পূর্ববর্তী ধারণা ছিল ভারতবাসী মাত্রেই নিকৃষ্ট। বলত,

'কিলিং কুই' অর্থাৎ 'কালো ভূত'। চিনে মার খেয়ে প্রায় মরতেই বসেছিলেন। অথচ কালের প্রভাবে তাদেরই, বিশেষ করে নব চেতনায় জেগে ওঠা যুবক-যুবতীদের সেবা, কর্তব্য এবং আন্তরিক নিষ্ঠা-ভালবাসায় বেঁচে ওঠেন। উনি দিনের পর দিন দেখেছেন, এদের কর্তব্যজ্ঞান অননুকরণীয়। হাজার বিরুদ্ধ ঘটনা সত্ত্বেও চিনাদের আতিথেয়তা, সহযোগিতা ও ভারতীয়র প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব তাঁর মনের ওপর চিরস্থায়ী গভীর রেখাপাত করে। চিনাদের মনের কথাও তিনি ভালই পড়ে নিয়েছেন। তাদের ভাষায়, "এই হিন্দু বিদেশী এখন সমগ্র চীন জাতির ছোট ভাইয়ের মত।"

'মরণ বিজয়ী চীন'-এ প্রবাদতুল্য উক্তিগুলি যথাক্রমে :—

(১) 'লোভীদের মানস মরু সর্বদেশেই সমান। অত্যাচারীর অত্যাচার সর্বদেশেই সমভাবে প্রকটিত।' (২) 'যে ভীত সে অন্যকে ফ্যাসাদে ফেলতে কুণ্ঠিত হয় না।' (৩) 'মানুষ যতই প্রগতির দিকে এগিয়ে যাক, পিছনদিকে তার চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করেই এক একবার।' (৪) 'সামান্য লোভের বশবর্তী হয়ে যারা নিজের দেশকে পরের হাতে তুলে দিতে পারে, তাদেরই পরস্বাপহরণ করবার প্রবৃত্তি থাকে, তারাই মিথ্যা বলতে কোনরূপ দ্বিধা করে না।' (৫) 'যাদেব ধন আছে, তাদের হৃদয় নাই।' (৬) 'শিক্ষা মানুষকে যেমন শুধু মানুষ করে, আবার এই শিক্ষাই মানুষকে সেয়ানা পাপীও করে ফেলে।' (৭) 'বেঁচে থাকতে হলে অর্থের মর্যাদা মানতেই হবে, অর্থকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে, নতুবা যে এ পৃথিবীতে অস্তিত্ব বজায় রাখা যায় না।' (৮) 'যখন রাষ্ট্রবিপ্লব হয় তখনই অত্যাচার নগ্নরূপ ধারণ করে। যারা এসব অত্যাচার পরোয়া না করে এগিয়ে চলে, তারাই বাঁচে, আর যারা সহ্য করতে পারে না, তাদেরই অস্তিত্ব লোপ হয়।' (৯) 'জীবনে অনেক সুক্ষণ এবং কুক্ষণ আসে। যে সময়ে চিন্তা করতে হয় বসে বসে, সে সময়টাকেই কুক্ষণ বলে মনে হয়।'

'মরণ বিজয়ী চীন' গ্রন্থটি সে যুগে পাঠক মহলে খুবই সমাদৃত হয়। সমগ্র বইটি বারবার পড়ে লক্ষ্য করা গেছে—এর মধ্যে একটা বিশাল ব্যাপক পরিসর রচনা করার সদিচ্ছা নিয়ে লেখক ধীরে ধীরে এগিয়েছেন। বেশ কিছুটা সাফল্যও এসেছে সে প্রচেষ্টায়। মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ ঝলকের মতো দক্ষ হাতের ঝলকানিতে মুগ্ধ হতে হয়। কিন্তু তারপরেই অন্ধকারে হোঁচট খেতে হয়। কেননা ভাবের উচ্ছ্বাস, বিভিন্ন ঘটনাকে পারম্পর্য বজায় রেখে একসূত্রে গাঁথতে পারার অভাব এবং সর্বোপরি অনমনীয় মনোভাব ভ্রমণকাহিনীর সৌকর্যকে ব্যহত করে। তবু, তথ্যের প্রাচুর্যে ও ঘটনার বিশ্বস্ততায় 'মরণ বিজয়ী চীন' ভ্রমণ সাহিত্যে স্থায়ী দলিল হিসাবে গণ্য হতে পারে।

সর্ব্ব স্বাধীন শ্যাম

এদেশের জনসাধারণ গর্ব করে বলে, আমরা 'খুন থাই'। মানে—স্বাধীন মানুষ। শ্যাম রাজ্যের তাই অপর নাম 'থাইল্যান্ড' বা স্বাধীন দেশ। ব্যাঙ্কক পৌঁছানোর আগেই কাস্টমস ঘাঁটিতে হাজিরা দিতে হয়েছে লেখককে। অফিসার তিনখানা কাগজ তৈরি করে একটি যাযাবরের হাতে দিয়ে বললেন—'ব্যাঙ্ককে পৌঁছে এ কাগজখানা সেখানকার কাস্টমস অফিসে জমা দেবেন। তিনি আপনার সকল অসুবিধা দূর

করবেন। শ্যাম দেশ সবরকমে স্বাধীন, যা দুনিয়ার আর কোথাও দেখতে পাবেন না। এখানে ভয়ের কিছু নেই'।

পর্যটকের জিজ্ঞাসু ও রসিক মন আপন স্বভাবের ব্যঙ্গাত্মক ধরণে বলতে বলতে গড়িয়ে দিলেন ঢাকা দুটি—'যা হুকুম। এর আর জবাব দেব কি, আগে দেখি স্বাধীনতার বুনট কতটা খাপী। রাস্তায় চলেছি, মাথায় খেলছে অফিসারের 'সবরকমে স্বাধীন' কথাটা। স্বাধীনতার আবার ডিগ্রি আছে নাকি, জ্বরের টেম্পারেচারের (তাপের) মত? দেখা যাক।'

বাস্তবে দেশটা যতই ঘুরতে থাকেন ততই ভাঙতে থাকে ভুল। লাগতে থাকে বিস্ময়ের ঘোর। তাঁর সমগ্র ভ্রমণ পথে এমন সর্ব অর্থে স্বাধীন দেশ সত্যিই আর একটাও মেলেনি। এমন অভূতপূর্ব পরিপূর্ণ তৃপ্তি তাঁকে দেয়নি আর কোনও দেশ। নামে রাজা থাকলেও জনমতই এদেশে শেষ কথা। প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামবাসীদের নিয়ে সভা হয়। তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হবে 'কামনান' ও 'পূঙ্গাইবান'। গ্রামবাসীদের মনঃপূত না হলে যে কোন সময় তারা বাতিল হয়ে নতুন নির্বাচন হতে পারে। সকলকে নিয়ে এই পঞ্চায়েত কর্তৃত্ব করে সব ব্যাপারে। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের আদেশ বা বিচারের ওপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাজারও নেই। কারও স্বাধীনতা হরণ এদেশে ক্ষমাহীন অপরাধ। জনগণই বিচার করে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়। রাজাও মকুব করতে পারে না।

বিবাহকে কেন্দ্র করে কোন উৎসব অনুষ্ঠান ও মন্ত্রপাঠ নেই। নেই পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তা। পাত্র-পাত্রীর সম্মতি বা বাগ্‌দানই বিবাহ। আগেকার কালে একে অন্যের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে রাজি হয়ে চলে যেত বনে। এখন যায় অন্য কোন জায়গায় ইউরোপীয় 'মধুচন্দ্রিমা' যাপনেব মত। জমির জন্য শ্যামবাসী রাজাকে কোন খাজনা বা কর দেয় না। তবে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়, প্রত্যেক প্রজা তিন বৎসরের খোরাকের পরিমাণ ফসল সর্বদা মজুত রাখবে। স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার এ এক আদর্শ ব্যবস্থা। যেন অজন্মা বা ফসল নষ্ট হলে রাজাকে না আহার জোগাতে হয়, প্রজাদের ঘরে ঘরে। এজন্য একটা আশ্চর্য প্রথা বর্তমান। রাজা আহারে বসবার আগে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করবেন—'কেমন, রাজ্যে কেউ তো অনাহারে নাই?'

উত্তর হবে—'না, সবাই খেয়েছে।'

এদেশে কিছু খৃষ্টান থাকলেও, শ্যামবাসী প্রায় সকলেই বৌদ্ধ। সন্ন্যাসীর সংখ্যা এত যে শ্যামকে বৌদ্ধ ভিক্ষুর দেশ বললেও অসঙ্গত হয় না। তার একটা কারণ, প্রত্যেক শ্যামবাসী নরনারী জীবনে একবার অন্ততঃ গৈরিক ধারণ করে মঠে গিয়ে কিছুদিন বাস করবে। আবার ইচ্ছে হলেই গৈরিক ত্যাগ করে সাদা পোষাক পরে সংসারে ফিরে আসবে। নারী সন্ন্যাসিনী হবার সময় রঙ্গিন শাড়ি ছেড়ে থান পরে মঠে যায়, আবার রঙিন শাড়ি পরে ফিরে সংসারে ঢোকে।

লেখক দেখেছেন, থাইরা গৈরিক বস্ত্র ব্যাপারে ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। অনেক সময় অপরাধীরা গৈরিক ধারণ করে সাজা এড়াতে চায়। সে ক্ষেত্রে পুলিশ তার গৈরিক খোলস ছাড়িয়ে সাদা পোষাক চাপায। তবেই হবে গ্রেপ্তার। গৈরিকের

অবমাননা করে না।

রাইফেল, পিস্তল, তলোয়ার প্রতি ঘরে ঘরে। সেজন্যে কোন লাইসেন্স বা অনুমতি নিতে হয় না সরকারের কাছ হতে। তবে কথা হলো, অহিংসার দেশে ওসব অস্ত্র কি কাজে লাগে? বাড়িতে একটা সাপ ঢুকলেও তারা নিজেরা মারে না, কসাইকে ডাকে। কেবল বেগতিক বুঝলে, থাই নারী পিস্তলের গুলিতে সাপ মারে। অস্ত্রগুলো সাধারণত ব্যবহার হয়, মানুষে-মানুষে প্রচণ্ড কিছু কারণের আকস্মিক মারামারিতে। সে সময় বা মৎস্য শিকারে অস্ত্রের ব্যবহার দ্বারা কিন্তু তাদের অহিংসা ধর্ম ম্লান হয় না।

অথচ, দুধ তারা খায় না। এক্ষেত্রে বক্তব্য—দুধে অধিকার কেবল গো-বৎসের। তাকে বঞ্চিত করা জীব-হিংসার সামিল। সেজন্য সে দেশে শিশুকে খাওয়ানো হয় তরল ফ্যান-ভাত।

তবে লেখক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পাঠককে, 'অহিংসা সে দেশে আনুষ্ঠানিক, অন্তরের জিনিস নয়। তাই রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সকল প্রকার মাছ-মাংসই খায়, মায় সাপের মাংসও। কিন্তু নিজ হাতে জীব-হিংসা করবে না। সেজন্য এখানে চীনা কসাই আছে। আগে ছিল প্রতি গ্রামে একটি করে মুসলমান পরিবার, বিদেশ হতে আনীত। সে করতো নাপিত আর কসাইয়ের কাজ।

বৌদ্ধ ধর্মের বন্ধন শুধু এখানে শিথিলই নয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের স্পর্শেও সে ধর্মের কোন গ্লানি হয় না। তাই রামায়ণের আদর্শ তাদের অস্থি-মজ্জাগত। অযোধ্যার রাজসভায় ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের মত শ্যামরাজ-সভায় একটি ব্রাহ্মণ আসন আছে বংশ পরম্পরায়। তিনি বৎসরে একদিন স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সেদিন রাজা সাধারণ প্রজায় পর্যবসিত। তদুপরি রাজ্যের কোন ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডাদেশ দিবার অধিকারী একমাত্র ঐ ব্রাহ্মণ। রাজা তো অহিংসার পূজারী'।

বাস্তবে ব্যাঙ্কক থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল উত্তরে 'অযোধ্যা' নামে একটি রাজ্য বর্তমান। পুরানো সেই প্রাসাদ মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ-জঙ্গলে এখন সাপ, বাঘ ও জন্তুজানোয়ারের আস্তানা। তবে শহরটা, যার নাম আধুনিক 'অযোধ্যা', সেটা দেখতে পাওয়া যায়। সেকালের দুঃসাহসিক মানুষের রীতিই ছিল—নতুন দেশে গিয়ে স্বদেশের নামে সে দেশের নামকরণ করে নিজ দেশের মান বাড়ানো। শ্যামে 'অযোধ্যা' রাজ্য তাই ভারতীয়ের বিজয়-স্তম্ভ। এ থেকে মনে হয়, সেকালের এই সভ্যতার নেতা-নিয়ন্তা ছিল ভারত।

রামায়ণের প্রভাব এখানেই শেষ নয়। শ্যামদের প্রতি গ্রামে থাকে পুতুল নাচ দেখাবার দল। তারা রাম-সীতার কাহিনী ভিন্ন অন্য কিছু দেখায় না। ওদের নাটক, অভিনয়, রাজপ্রাসাদে যে চারণদের গান, তারও বিষয়বস্তু—রামায়ণ। তাতেও বৌদ্ধধর্ম ক্ষুণ্ণ হয় না। যেমন হয় না আকণ্ঠ মদ্যপানে।

লেখক ভারতের সঙ্গে নিবিড় সংস্পর্শ লক্ষ্য করেছেন শ্যামের ভাষায়, পরিচ্ছদে ও ধর্মে। ভাষা ছিল দীর্ঘকাল প্রাকৃত (সংস্কৃত) বা পালি। ব্রাহ্মী লিপি ছিল প্রবর্তিত। পরে অবশ্য মিশ্রণ হয়ে শ্যামভাষা দেখা দিয়েছে। তবু খাঁটি সংস্কৃত শব্দও তাতে রয়েছে। কাজেই কেউ যদি সংস্কৃত-মূলক বিশুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করে, তা শ্যামবাসী

সহজে বোঝে।

এছাড়া, আর্য নারীর যে স্বাধীনতা ও আদর্শকে ভারত পূজা করে, তার পরম বিকাশ এদেশে লক্ষ্য করে অবাক হয়েছেন রামনাথ—থাই নারীর অগ্রসরতায়, দৃঢ়তায় এবং স্বাধীনতায়। শ্যাম দেশে নারীই পরিবারের অভিভাবক। পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্ত ঘুরে এসে তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন, একমাত্র এদেশের মানুষ ব্যাপকতর অর্থে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছে। তার মধ্যে আবার বিশেষ করে নারী জাতি। তাই বক্তব্যের যাথার্থ্যতায় অবিচল থেকে ঘোষণা করছেন—'সারা দুনিয়া থেকে শ্যাম দেশকে বাদ দিলে বুভুক্ষু অতৃপ্ত পৃথিবী।' একারণেই বইটির নামকরণ 'সর্ব্ব-স্বাধীন শ্যাম।'

এমন মুক্ত সদাব্রতের দেশ, স্বাধীনতার পীঠভূমিতে বেড়িয়ে ফিরে রামনাথ-আত্মা ভরে উঠেছে আনন্দের রসধারায়। সে ধারা থেকে বঞ্চিত হন নি পাঠকও। কি ভাষা, কি কাহিনী গ্রন্থনা, কি কলা-নৈপুণ্য—সব দিক থেকেই এটি তাঁর সফলতম। এরই মধ্যেকার ঝরঝরে প্রাণবন্ত ভাষা-মাধুর্যে আমাদেরও অন্তরাত্মাকে তৃপ্ত করে শেষ করা যাক 'শ্যাম' কাহিনী।

—'চাক্কা গাড্ডীকী আসোয়ার'! সামরিক কুচকাওয়াজের আদেশের মত গর্জন। আকস্মিকতার আঘাতে কাৎ হয়ে পড়ে গেলাম। কোনরকমে টাল সামলাতে সাইকেল হলো হাতছাড়া। মালিকহীন রথটি আমার নিরঙ্কুশ হয়ে পথ ছেড়ে অভদ্রের মত বেপথে চল্‌লো। অতি কষ্টে তার বিদ্রোহ দমন করে আবার পথে এসে চারদিকে তাকাই। কোথাও জন-মানব নাই। ব্যাপারটা যে নেহাৎই ভৌতিক। মহাশূন্যের নিস্তব্ধতা করেছে কুহক-জাল বিস্তার। একটু থেমেই আবার সাইকেলে উঠতে যাবো—আবার সে জলদ্‌গম্ভীর সুরের রেশ—'দেবী মা-ঈ কালীজী'।

ভরাটে দরাজ গলা—সারা ভুবন গম্‌গম্ ...একবার মাত্র উচ্চারিত সে আহ্বান পর্বতের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে শতধা বিদীর্ণ করলো শ্রবণকে। এ যে নিছক ভারতের মায়া। শব্দ অনুসরণ করে চোখ আমার ঘুরে বেড়ায়—কোথায় আহ্বানের নায়ক? ঝোপ-ঝাড় ছাড়া কিছুই মালুম হয় না। আকাশবাণী নাকি? গা ছম্-ছম্ করে ওঠে। হঠাৎ চোখে পড়ে ধোঁয়া মস্ত বড় একটা ঝোপের আড়াল থেকে উঠ্‌ছে। হদিস ওখানে মিলবে। গেলাম এগিয়ে।..........

মলয় দেশের শেষ প্রান্তে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের সর্বশেষ দলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এসেছি উত্তর মুখে অনেকটা দূর। মলয়ের নিদর্শন কেলাপ্পা-সারি (নাবিকেল গাছের সারি) পেছনে ফেলতেই য়্যাশ্‌ফাল্‌ট দেওযা পথ খতম—কাঁকরের রাস্তা দাঁত বার করে ভ্রূকুটি দিয়ে স্বাগতম্ জানালো—হিংস্র জন্তুর মুখোশ পরে। বুঝলাম এটা 'নো ম্যান্‌সল্যান্ড' অর্থাৎ প্রভু-হারা দেশ। সাত মাইল চওড়া অনামা এ অনুচ্ছেদটি পার হলে পাবো সর্ব্ব-স্বাধীন শ্যামের সাক্ষাৎকার। কারণ 'নো ম্যানস্‌ল্যাণ্ড' মলয়েরও নয়, শ্যামেরও নয়। দেশ বলে দাবী এর কেউ করে না স্বীকার। কেননা এটা হলো জীবজন্তু আর পলাতক আসামীর রাজত্ব—যারা আইন মানে না, যারা সমাজ বন্ধনের ক্রীতদাস নয়। উভয় সরকারই কিন্তু রাইফেল-বন্দুক নিয়ে দলে-বলে জুটে একবার করে ঢুঁ মারে এ তল্লাটে, আর যাকে পায় তাকেই ধরে

নিয়ে যায়। মলয় সরকার দেয় তাদের রাইফেলের মুখে ছুটি। কিন্তু শ্যামরাজ এদের দেহকে করে না হত্যা, ব্যক্তিত্বেরই ঘটায় অপঘাত। কারণ এদের রাজনৈতিক উন্মাদ মনে করে ছেড়ে দেয় পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায়, যার নাম 'লাং সোয়ান', প্রায় আটশ' মাইল উত্তরে। সেখানে তাদের শ্যাম-রমনী বিবাহ করে জীবন যাপন ছাড়া উপায় থাকে না। দেখেছি, সেখানে রয়েছে চীনা, জাপানী, ইন্ডিয়ান, ইতালিয়ান, জার্ম্মান। তারা যেন জীবন্মৃত—মুঘল যুগে আগ্রার অন্দর মহলে খোজা রক্ষীর মত তিক্ততায় ভরপুর প্রাণ।

সীমান্ত অতিক্রম করলাম পর্বত-কাননে ঝিল্লিরবের মাঝে। আমার প্রাণের ভিতরও সারাক্ষণ ঝি ঝিঁ ডাক। বৃক্ষপত্রের আকুল দীর্ঘশ্বাসেও ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ। ঝিল্লীরব বিশ্ব-নীরবতা ভেদ করে আকাশ বাতাসকে স্পন্দিত করে তুলেছে। ঝিল্লি যেন আমার মগজে ঢুকে খুলে যাচ্ছে। একটা কি কাকও নাই, এ ভুবনে, নেহাৎ একটা চড়াই পাখী—

'চাক্কা গাড্ডীকা আসোয়ার।'....

'দেবী মা-ঈ কালীজী!'....

ঝোপের আড়ালে ধোঁয়া....

চমকিত অন্তরে শব্দ লক্ষ্য করে বাইসাইকেল হাতে হচ্ছি অগ্রসর। ধুনীর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর একটু এগোতেই শিহরণ খেলে শিরায় শিরায়—সিঙ্গাপুরের রামসিঙ্গা নাকি! ('মলয়েশিয়া ভ্রমণ' এ বিপ্লবী নেতা)—না, ক্ষয়রোগীর শীর্ণ মুখ এ নয়, তবে পরিচ্ছদ হুবহু সেই রক্তরাঙ্গা আলখাল্লা। চোখে পড়তেই আবার স্পন্দন মুখর সুর—কালীজী!

—কাঁহে ফুকারা মহারাজজী?

—বেইঠো জী বৈইঠো। যাতা হ্যায় কিধার্?

বসলাম না, নতিও জানালাম না। মন আমার বলছে আলখাল্লাটা ধোঁকার টাটি, গায়ে মাখা ছাই-পাঁশ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের রক্তচক্ষুর দান। ভেবে চিন্তে জবাব দিলাম—

যাবো ব্যাঙ্কক। তবে ঠাকুর পথে তোমার মতো সৃষ্টিছাড়ার দর্শন ভাল কথা নয়। আমি চাই অপরাজেয়দের আওতা এড়িয়ে চলতে।

—ওঃ তোম্ হ্যায় বাঙালী। বাৎকী সুহেলী, বাৎ আউর বাৎ, দুসরা কুছ শিখা নহি।

—আমাকে ও জিনিসটি দু'বছর বয়স অবধি শিখিয়েই মা চোখ বুজেছেন। ফুরসৎ আর পেলাম কই কিছু শেখবার?

—কাঁহে, এত না ইস্কুল—কালিজ..

—বাইরে থেকে দেখেছি, ভিতরে ঢুকবার দোর ছিল বন্ধ। গুড্ বাই দোস্ত...

—গড্ বি উইথ্ ইউ, কালীজী।

পেছন ফিরে ছুটে বেরিয়ে এলাম পথে। ঘন শ্বাস দেখা দিল। আর কিছুতেই যাচ্ছি নে হিন্দুস্থান রিপাবলিকানদের মাঝে।'

যুযুৎসু জাপান

১৯৩১ সাল। চীন দেশে নতুন করে রাষ্ট্রবিপ্লব শুরু হয়েছে। মাও সে তুঙ 'চালিন সোভিয়েট' স্থাপন করেছেন। ইয়াংসি নদীর প্লাবনে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা। চিয়াং কাইশেক ছোটাছুটি করছেন। জাপানীরা মানচুরিয়া দখল করেছে। কোরিয়াতে চীন-কোরিয়ার দাঙ্গায় গুরুতর অবস্থা। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা জাপানের কূটনৈতিক চাল দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছে। পূর্ব এশিয়ার এমনই রাষ্ট্রনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে রামনাথের জাপান দর্শনে প্রবেশ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে।

অন্যান্য বহু দেশের মতই তাঁর জাপান ভ্রমণও সুখের হয় নি। 'যুযুৎসু জাপান'-এর শুরুতে পাঠককে ধরিয়ে দিয়েছেন সেইরকম ইঙ্গিত—"প্রগতিশীল জাপানীরা আমাদের দেশ সম্বন্ধে কোন সংবাদ পেত না। তারা জানত ভারতের লোক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাজা-মহারাজা, ব্যবসায়ী ও দরিদ্র। জাপানের প্রগতিশীলরা সর্বপ্রথম আমাকে ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক ভেবে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে চলেছিল। পরে যখন জানতে পেরেছিল আমি দরিদ্র শ্রেণীর লোক, তখন তারা আমার সঙ্গে মিশেছিল এবং খোলা মনে কথা বলেছিল।

আজ স্পষ্ট করে বলছি, আমি পৃথিবীর যত স্থানেই গিয়েছি, সর্বত্রই পদদলিত নিপীড়িত এবং প্রগতিশীলদের দ্বারাই গৃহীত হয়েছি। ধনীরা যেমন আমাকে ঘৃণা করেছে, আমিও তেমনি তাদের এড়িয়ে চলেছি। জাপানেও সেরূপ হয়েছে। একটি জাপানী ধনীও আমাকে সাহায্য করেনি, বরং ভিক্ষা করি বলে ঘৃণা করেছে।"

অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে জাপানে প্রবেশ করামাত্র তাঁকে হতে হয়েছিল পুলিশের নজরবন্দী। শুরুতেই এমনটি হওয়ায় হতাশায় ভেঙে পড়বার উপক্রম হলেও হাল ছাড়েন নি। আস্তে আস্তে নিজেকে তৈরী করে নিয়েছিলেন, শক্ত বেড়াজালে। পৃথিবীতে যত সাম্রাজ্যবাদী আছে, জাপানীদের তিনি তাদের মধ্যে ফেলে অন্তরের সহিত ঘৃণা করতেন। 'মরণ বিজয়ী চীন', 'লালচীন', 'প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি' প্রভৃতি বইতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীর ভয়ংকর নগ্ন চেহারা দেখিয়েছেন।

বিপরীত দিকে, তাদের গুণ বা ভালোর দিক গুলিও বলতে বা স্বীকার করে নিতে কোথাও কিছু কুণ্ঠাবোধ করেন নি। 'যুযুৎসু জাপান' বইতে এমন বৈপরীত্যের সফল অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন বারবার। নিদারুণ কষ্টকর অভিজ্ঞতার পাশাপাশি একের পর এক মেলে ধরেছেন তাদের গুণগত দিক। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং দৃষ্টির স্বচ্ছতা কতদূর থাকলে এমনটি সম্ভব, তার উদাহরণ রামনাথ বিশ্বাস স্বয়ং। দেশটাতে ঢুকে পড়ে যখন দুঃখ-কষ্টের গেরোয় পড়ে নাকানি-চোবানিতে একশেষ হচ্ছেন, তার মধ্যেই আবিষ্কার করে নিয়েছেন—জাপানীরা কর্মে অসাধারণ নিষ্ঠাপরায়ণ জাত। যার জন্য তাদের সাধারণ জীবনে উন্নতি হয়েছে অসম্ভব রকমের। এ সম্বন্ধে অনেকগুলির মধ্যে থেকে তাঁর দেওয়া একটি অনবদ্য উদাহরণ পেশ করা যাক—

জাপানে এক পদস্থ ভারতীয় অফিসারের গোপন-কুৎসিত অসুখ হওয়ায় প্রথমে লজ্জা ও ভয়ে কারুকে বলেন নি। কিন্তু বাড়াবাড়ি হওয়ায় প্রমাদ গুণলেন। কি আর করা যায়; প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি, একশো টাকা ফি দিয়ে ভারতীয় ডাক্তার

ডাকলেন। তিনি ফি'তো নিলেনই, উপরন্তু, বিসর্জন দিয়ে বসলেন ডাক্তারী শাস্ত্রের নিয়ম-নীতি। রোগী ও তাঁর রোগের গোপনীয়তা রক্ষা করলেন না, আদৌ।

হিতে-বিপরীত দেখে ভদ্রলোক শরণাপন্ন হলেন রামনাথের। যিনি আবার আর্ত শরণাপন্নের জন্য শুধু এক পা নয়, সদাই বাড়িয়ে থাকেন দু'পা, দু'হাত এবং হৃদয়। দু'চারদিন নয়। সারাটা জীবনভোর। শোনামাত্র কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন কাজে। মহাশয়ের সুযোগ্য ব্যবস্থাপনায় জাপানী ডাক্তার এলেন সস্ত্রীক। ডাক্তারবাবু শুধু যে চিকিৎসার ভার গ্রহণ করে রোগীকে আরোগ্যের দিকে নিয়ে গিয়ে ক্ষান্ত হলেন, তা মোটেও না। তাঁর স্ত্রীও প্রতিদিন রোগীর বাড়িতে কাপড় কাচা, ঝাঁট দেওয়া থেকে রান্না পর্যন্ত প্রতিটি গৃহকার্যে মগ্ন রইলেন। একই বাড়ির মধ্যে নিরাপত্তার কারণে রোগীর জন্য সব কিছু আলাদাভাবে করার নিপুণ আয়োজন। যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা। নিষ্ঠার দৌড়টা একবার ভাবুন তো!

তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন জাতটার মধ্যে সামগ্রিকভাবে জাতীয়তাবোধ এতই প্রখর যে পৃথিবীতে তা বিরল। এ মাটির এমনি গুণ—শুধু গরিব বা শুধু বড়লোক নয়, সকলেই দেশটাকে জানপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে। এমন কি জাপানী ক্যাপিটালিস্টরা অন্যান্য দেশের মতো শুধুই লোটে না, তারাও দেশের সাধারণ লোকের সুখ-সুবিধা দেখতে বাধ্য হয়।

'কোবে' থেকে 'টোকিও' পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, জাপানীরা জাপানী শ্রমিককে 'একসপ্লয়েট' করছে। আবার এও দেখেছেন, কোনও ব্যক্তিকে গালাগালি দেওয়া হোক—সে শুনবে। তার মার চরিত্র সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হোক, তাও শুনবে, মাথা হেঁট করে। কিন্তু জাপানী জাত সম্বন্ধে কিছু খারাপ বলা হোক, অমনি ফুঁসে উঠে দরকার হলে খুন পর্যন্ত করে ফেলবে, অনায়াসে।

তাই, লেখক সিদ্ধান্তে এসেছেন—'এ জাতকে ঠেকাবে কে? তেড়ে ফুঁড়ে পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলির মাথায় চড়ে বসবেই বসবে।'

গ্রন্থমধ্যেকার উল্লেখযোগ্য প্রবাদতুল্য বাক্য—'উগ্র জাতীয়তাবাদীরা সকল সময়েই অদূরদর্শী হয়।'

'যুযুৎসু জাপান' ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে উপভোগ্য। 'টক-ঝাল-নোনতা-মিষ্টি' বিভিন্ন স্বাদের অসংখ্য টুকরো ঘটনার প্রবাহ একেবারে খেই হারিয়ে বাঁধন হারা হয়ে ওঠেনি। বোঝা যায়, সেগুলিকে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। সব জায়গায় যে সফল হয়েছেন, এমন নয়। কিন্তু যা করতে পেরেছেন, তাও যথেষ্ট। বেশ কিছু মূল্যবান ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ছবি এঁকেছেন বড়ো সাবলীল ভঙ্গিতে। সেগুলি কখনই পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে ওঠেনি। ববং মনে হয়েছে, যেন উদাসীন বলাকা দৃষ্টিতে একেব পর এক ঘটনার প্রয়োজনীয় রঙে পটভূমি রাঙিয়ে চলেছেন লেখক। সে রঙ আপন ঔজ্জ্বল্যে পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নেয়।

দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা

লেখক যখন দুরন্ত কৌতূহল নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করলেন, তখন

সেখানকার ভারতীয়দের কর্মকাণ্ডে হতভম্ব হয়ে পড়তে হয়। কপালে বলিরেখা দেখা দেয়, শ্বেতকায়দের মুহুর্মুহু হু'হুঙ্কার রবে। লক্ষ্য করেছেন, হিন্দু মহাসভা, মুসলীম লীগ, প্রভৃতি গোষ্ঠী-মধ্যেকার বিরোধী মতবাদ, জাত্যাভিমানের প্রাচীর ও অন্ধ স্বার্থপরতার ফেরে পড়ে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত সুষ্ঠু অহিংস আন্দোলন মরুতে মুখ লুকিয়েছে। একমাত্র আশার আলো মহাত্মাপুত্র, মানবতার পূজারী মণিলাল গান্ধীর নিয়ন্ত্রণ পুষ্ট 'ইন্ডিয়ান সেটলার্স এসোসিয়েশন।'

অথচ মুষ্টিমেয় বুয়র (শ্বেতকায়) মোট লোকসংখ্যার মাত্র এক অষ্টমাংশ হয়েও নিপীড়নের জয়রথে অশ্বেতকে করছে যথেচ্ছ পেষণ। মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র কর্মধারা যে বিরাট সম্ভাবনা এনেছিল, আজ দলাদলি ও স্বার্থের যূপকাষ্ঠে তা বলি হতে চলেছে দেখে যাযাবর বড়ই আহত হন। বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না, অপরদিকে বুয়ররা চায় সবরকম অশ্বেতদের দলন, পীড়ন ও শক্তিহীন করা।

রামনাথের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের অনেকটাই পর্যবসিত হয় প্রতিবাদের সফরে। মানুষটা মনে প্রাণে বাঙালি হলেও সারাটা জীবন স্বপ্ন দেখতেন অখণ্ড ভারতের। এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার রূপরেখা ধরে রাখতে হলে, আর একটা বই লেখা সম্ভব। একই কারণে 'প্রথমে তিনি বাঙালী' হলেও শেষ পর্যন্ত দেশে-বিদেশে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন 'ভারতবাসী' বলে। ছোটবেলা থেকেই কেবলমাত্র হিন্দু, মুসলমান বা বাঙালি ইত্যাদি জাতির জন্য কোনও বিশেষ রকম সংগঠনের তীব্র বিরোধীতা করে এসেছেন। সমাজ পরিবেশে এই ধরণের সংস্থাগুলি কতখানি অসুস্থ মানসিকতা গড়ে তুলতে সক্ষম, সে সম্বন্ধে তিনি ছিলেন পূর্ণমাত্রায় সজাগ। তাই এতটুকু সমর্থন তো দূরের কথা, যখনই সুযোগ এসেছে তীব্র আক্রমণ করেছেন তাদের একদেশ-দর্শীতার বিরুদ্ধে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বরং সময় এবং সুযোগ মত ঝোড়ো মেজাজ এখানে আছড়ে পড়েছে, ভালোরকমেই।

ডারবানে ঘুরছেন। হালচাল দেখে মন মেজাজ খিঁচড়ে রয়েছে। এমন সময় এক ছোকরা এসে কানের কাছে অবিরত 'হিন্দু মহাসভা-হিন্দু মহাসভা' বলায় সোজাসুজি হাঁকড়ালেন—'শোনো ভাই, হিন্দুত্ব যদি জগদ্দল পাথর হয়ে পথরোধ করতে চায়, তবে সে হিন্দুত্বকে সংশোধন করে নিতে হবে প্রগতির ধাপে ধাপে। আর একটা অপ্রিয় সত্য কথা: তোমাদের ভিতরকার অধিকাংশের বাপ-দাদা ভারতে ছিল অস্পৃশ্য। উচ্চবর্ণের হিন্দু তোমাদের দূরে ঠেলে রাখতো। যেমন ধারা আজ বুয়ররা করছে সকল ইন্ডিয়ানকে। তোমরা আজ এখানে এসে হিন্দু মহাসভা মারফৎ অপরকে করবে অচ্ছুৎ, এ অতি অসঙ্গত প্রস্তাব। এ হল মরণের বুদ্ধি, সজীবতার লক্ষণ নয়।'

তরুণটি 'অচ্ছুৎ' কথাটির তাৎপর্য বুঝে, সঙ্কীর্ণ পথের সর্বনাশা ফল হৃদয়ঙ্গম করে প্রতিশ্রুতি দেয়, সে 'হিন্দু' একথা মুখে আনবে না। সে হবে 'ইন্ডিয়ান', যাতে অন্য জাতির সঙ্গে সমানে সমানে পা ফেলতে পারে।

যাযাবর ছুটলেন মহাত্মাপুত্রের কাছে। বোঝালেন, এই সমস্ত 'ধর্মধ্বজীদের জিগির না থামালে কংগ্রেসের মৃত্যু অনিবার্য।'

মহাত্মা গান্ধী মানুষ হিসেবে রামনাথের হৃদয়ে বরাবরই চিরভাস্বর ও অমর। পুত্র মণিলাল গান্ধীর অনুরোধে গেছেন ডারবানের ফিনিক্স্-এ মহাত্মাজীর বাসগৃহ দর্শনে। একটি টিলার উপরে সুন্দর সে বাড়িটিতে ঢুকলেন ধীরে ধীরে। আর সকল দর্শকদের ভক্তিভাবে গদ-গদ দেখে স্বাধীনচেতা মানুষটি কিন্তু হাঁফিয়ে উঠেছেন। মাত্র দু'মিনিটেই যা কিছু দেখার ঝটপট চোখ বুলিয়ে সেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় রামনাথকে সাদারা (বুয়র) কতবার যে অপমান, গায়ে থুথু ও গলা ধাক্কা দেওয়া থেকে শুরু করে মার পর্যন্ত দিয়েছেন, তার কোনও লেখা-জোখা নেই। বিদ্রোহী বীর কিন্তু হার স্বীকার করে পালিয়ে আসেন নি। দিকে দিকে বেরিয়ে পড়েন এর কারণ অনুসন্ধানে। আবিষ্কার করেন, এই বিদ্বেষের একেবারে মূলে আছে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হীন স্বার্থবুদ্ধি। আরও পূর্বে, ব্রিটিশের সঙ্গে বুয়রদের যুদ্ধের সময় বুয়র জাতির জেনারেল ক্রুগার-এর সাথে তৎকালীন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা জুলুম ও মিথ্যাচারীতার আশ্রয় নিয়ে সমগ্র বুয়র জাতিটাকেই বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। আর আজ তার ফলস্বরূপ—মাথা পেতে শাস্তি নিতে হচ্ছে, পরবর্তী বংশধরদের। দুনিয়ার মুসাফির সকল ভারতীয়কে জড়ো করে বোঝাতে শুরু করে দেন, 'তোমরা স্বার্থপরতার ঠুলি খুলে নিগ্রো, অর্দ্ধ নিগ্রো, বান্তু সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আগে একজোট হও (কারণ এটাও দেখেছেন, 'বহু ভারতীয়ই নিগ্রোদের কুকুর-বেড়ালের অধম মনে করে। বাগে পেলে রক্তও চুষে খেতো রাক্ষসের মতো। তাই ইন্ডিয়ান তাদেরও দু চক্ষেব বিষ।) না হলে শ্বেতকায়রা কোনদিন তোমাদের খড়কুটোর মত ভাসিয়ে দেবে।'

নিজ জাতির ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছেন মনে করে, তিনি আফ্রিকায় ক্ষেপা মোষ বনে যান নি। অসম্ভব রকম ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, নিজেকে সাধ্যের শেষ অবধি শান্ত রেখে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। থমকে দাঁড়ালেন আজব দৃশ্যে। নজরে পড়লো একটি তামিল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে, আর কতগুলি ভারতীয় জড়ো হয়ে তাকে গাল দিচ্ছে গলা ফাটিয়ে। তাই দেখে, দূরে দাঁড়িয়ে ক'জন সাদামানুষ (বুয়র) চুটিয়ে হাসছে। বিদ্রোহী মন স্বভাবত প্রশ্ন করল—'কেন হাসছে ওরা?' উত্তর মিলতে দেরি হল না। ভারতীয় ক'জনা দল বেঁধে মেরেছে একক ঐ অসহায় লোকটিকে। গর্জে উঠলেন, এ জাতীয় হীন কাজের বিরুদ্ধে। বললেন—'শ্বেতদের কথা না হয় না-ই ধরলাম, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার তথাকথিত অসভ্য বান্তু, জুলুরা পর্যন্ত যে কাপুরুষতাকে বর্জন করে, আপনারা ইন্ডিয়ান হয়ে সে শত ঘৃণ্য কাজটি করে ভারতের শিরে কলঙ্ক আরোপ করছেন, আর আবাহন করছেন নৈতিক পতন -যে পথ আকর্ষণ করছে আপনাদের অবধারিত অসম্মানকর আফ্রিকা ত্যাগের বাধ্য-বাধকতার কালিমায়।'

এ ধরণের অজস্র ঘটনার ঘনঘটা 'দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা' বইটির মধ্যে জুড়ে আছে পাতার পর পাতা ধরে। সেদিক থেকে বলা যেতে পারে, এমন ঘটনা বহুল ভ্রমণ কাহিনী তাঁর অন্যগুলিতে মেলে না।

অন্যদিকে, এই সফরে তাঁর শিশুকালের ফিচ্‌লে বুদ্ধির কাণ্ড ঘটিয়েছেন বেশ কয়েকবাব। তোড়জোড় চলছে আফ্রিকা ত্যাগের। যাত্রার খবর পেয়ে কিছু কংগ্রেসী ধনী পুত্র ছুটে এসে প্রস্তাব করলো তাঁকে একটা ক্যামেরা উপহার দেবে। পোড় খাওয়া যাযাবর বুঝলেন, 'ওরা এসেছে ক্যামেরা উপহার দিয়ে তা সংবাদপত্র মারফত প্রচার করে বাহাদুরী নিতে। ঝানু কংগ্রেসীদের অপকৌশল, কিছু না করে নাম কিনবেন। অথচ ডারবানে আসা অবধি ওরা আমায় সাহায্য তো করেই নাই, বরং আমার আই-এস-এ (মণিলাল গান্ধী প্রবর্তিত 'ইন্ডিয়ান সেটলার্স অ্যাসোসিয়েশন') এর দলে যোগাযোগ স্থাপনের বিরুদ্ধে বহু চেষ্টা করেছে তরুণদের হিন্দুসভা, খৃষ্টানী প্রার্থনা সভা প্রভৃতি দিয়ে।'

সবিনয়ে জানালেন, 'ভাই—সাইকেল ভ্রমণকারী আমি, ক্যামেরা রাখার স্থান নাই, ইচ্ছাও নাই'। বললে কি হবে, ওরা নাছোড়বান্দা। তার উপর মুস্কিল, সকলেই বয়সে তরুণ। তারুণ্যের ধারক-বাহক দিন-দুনিয়ার মুসাফির কি করে ঠেলে ফেলেন তাদের আবদার। 'কারুকে দান করে যাওয়া যাবে', মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে পা বাড়ালেন একাই, ক্যামেরা পছন্দ করতে। পরবর্তী ঘটনাবলী লেখকের সাহিত্য-ধারাভাষ্যেই তুলে ধরা যাক—'ফিল্‌ম ক্যামেরা বিক্রি হয় শ্বেতকায়দের দোকানে। শো-কেসে দেখে ভিতর-এ ঢুকলাম। সুন্দর একটি ফিল্‌ম্ ক্যামেরা—লেবেলে মূল্য লেখা পঁচিশ পাউন্ড। বাঃ সস্তাই বলতে হবে। যেমন ক্যামেরাটি হাতে তুলেছি, শ্বেত দোকানী কুইক মার্চ্চ করে এলো। ক্যামেরা আমার হাতে, নইলে বোধহয় বদ্ধমুষ্টি ঝাড়তো নাকে-মুখে। বাঘের মত ওৎ পেতে রইলো। আমিও ধীরে আস্তে ক্যামেরাটি পরখ করে, ষ্ট্যান্ডে রেখেই পিছু সরে গেলাম দু'কদম। শ্বেতকায়ের মতলব হাসিল হল না। কিন্তু এগিয়েও এল না বটে, তবে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করলো যতক্ষণ কানে গেল। আমি সবেগে সাইকেল চালিয়ে দিলাম। ফিরে এসে ধনী ব্যবসায়ী-পুত্রদের জানালাম ক্যামেরা পছন্দ হয়েছে, কিনতে চায় তো আমার সঙ্গে যেতে পারে।

—কোথায় যেতে হবে?

—শ্বেতকায়দের বাজারে। মাত্র পঁচিশ পাউন্ডে ফিল্‌ম ক্যামেরা। সাহেবপাড়া শুনেই ওরা মাথা চুলকাতে লাগলো। অনেক ভাবাভাবি করে ওরা যাওয়াই সাব্যস্ত করলো মোটরে। আমি বেঁকে দাঁড়ালাম—হেঁটে চল। আবার তারা চিন্তামগ্ন।

—থাক ভাই ক্যামেরা কেনা। আমার কি দরকার ও' দিয়ে, বার বার বলছি।

শেষটায় কি আর করে, চললো তিনটি ধনীর দুলাল আমার সঙ্গে। যেমন সাদাদের বাজার দেখা দিল, যুবক তিনটি ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নেমে চললো চোরের মত। আমি ফুটপাত ছাড়লাম না। ক্রমে ওরা মাথার সবুজ তুর্কী টুপি পকেটে লুকালো। আমি ফুটপাতে বেশ করে পা ফাঁক করে চলেছি। অনেক শ্বেতকায় তা দেখে হাসছে। হাসুক। আমি কোন পরোয়া না করে তরুণদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে করতে সে দোকানে ঢুকেই কাউন্টারে পঁচিশ পাউন্ড নোট রেখে ক্যামেরাটি হাতে তুলে নিলাম। দোকানী হল্লা করে উঠলো—ভারতীয়ের জন্য এ দোকান নয়।

—কোথাও সে কথা লেখা নেই। আমি চললাম।

পাশের সকল শ্বেত দোকানদার আকৃষ্ট হলো হৈ-হল্লায়। একটি প্রবীন দোকানদার শুধু জিজ্ঞেস করলে—দাম দিয়েছ কি?

—ঐ যে কাউন্টারে নোটগুলো। গুণে দেখুক, কম হয় পুষিয়ে দিচ্ছি।

প্রবীণ সে ব্যক্তির নির্দ্দেশে ক্যামেরা দোকানী নোট গুণে নিয়ে ক্যাশ মেমো লিখে দিল। আমি ক্যামেরা হাতে ফুটপাতে এসে দেখি ধনীর দুলালেরা পাথরের পুতুলের মত তখনও ফুটপাথের নীচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আমার সঙ্গে দোকানে আসা দূরে থাক, ফুটপাতে উঠতেও ভরসা পায় নাই। বুঝলাম, এমন ভীরু বলেই এরা লাথি খায় এ পাড়ায় এসে। আমি মিলিটারী কায়দায় পা টান্ করে হ্যাট মাথায় দিয়ে আসছি ফুটপাত দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে, যেন দিগ্বীজয়ী দিকপাল। আর অন্তঃসারহীন ব্যবসায়ী-নন্দনেরা যেন আমারই হুকুম-বরদারের মতো নতশিরে ফুটপাতের নীচু দিয়ে আসছে। ইউরোপীয় বাজার ছাড়িয়ে এসে ট্যাক্সি ডাকলো, সবুজ টুপী মাথায় দিল, আর কী তাদের ফূর্ত্তি!'

রামনাথের ভ্রমণ সাহিত্যে অসংখ্য মানুষ তাদের চলমান ঘটনা নিয়ে ভিড় জমালেও পরিবেশ রচনায় তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তাঁর কলমে সেগুলি এমনই জীবন্ত ও রসময় হয়ে উঠতো, যেন মনে হতো চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মত একে একে ভেসে আসছে, যাচ্ছে। ফলে, পাঠকও সে রসে মজ্‌তো বইকি।

আফ্রিকায় অসংখ্য মানুষ, অনেক সংগঠন তাঁকে নিয়ে গেছে তাদের সভায়। প্রত্যেকের ছিল কিছু না কিছু উদ্দেশ্য। কিন্তু যথার্থ বন্ধু পেয়েছিলেন এক বিহারী সর্বহারা। নাম ছিল রামশঙ্কর। চাণক্য শ্লোকের অনুপঙ্খ আপদে-বিপদে সুখে-শ্মশানে সব সময়ের সাথী। ডারবান বন্দরে জাহাজ ছাড়ছে। শুভানুধ্যায়ীতে ভরে গেছে। ক্রমে সকলে যে যার দলীয় শ্লোগানে রামনাথকে বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়ে চলে গেছে। শুধু আছে সেই অসময়ের বন্ধু—'রামশঙ্কর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে তীরে গিয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে—একক। আর কেউ নাই সেখানে। ডারবানেব জনতা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এক রামশঙ্করে পরিণত। জানি না, আজ তার কি পরিণাম'।

গ্রন্থমধ্যে চিরন্তনতায় সিক্ত একটি অতুলনীয় উক্তি—'মাইনোরিটি যেখানে নির্ব্বাধে আপন মত প্রকাশ করতে পারে মেজরিটির ভূয়া আভিজাত্য খর্ব্ব করে , সেই হলো প্রকৃত সভ্যতা—অবিকৃত ডেমোক্রেসি'।

প্রাণচঞ্চল দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণে রামনাথ বিশ্বাস যেমন শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন সংখ্যাতীত বার, তেমনিই দুরন্ত ভঙ্গিতে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন বারবাব। এই দু'য়ের প্রতিফলন ঘন ঘন ছায়াপাত করায় 'দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা' ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে বেশ কিছুটা সার্থকতা হারিয়েছে। কেবল একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় :—লেখক ব্যক্তিগত ক্ষত-বিক্ষত হওয়াকে কোথাও বড় করে দেখান নি। যা তাঁর স্বভাবের বড় গুণ। মাত্র দু-চারটি শব্দের আঁচড়ে সেরে, ইঙ্গিতমাত্র রেখে দিয়ে, বেরিয়ে গেছেন অবলীলায়। সাহিত্য বা সাহিত্যিকের পক্ষে এটি 'প্লাস পয়েন্ট' শুধুমাত্র নয়। বরং বলতে হয়—অবশ্যম্ভাবী শর্ত।

উপন্যাস

হলিউডের আত্মকথা

'হলিউডের আত্মকথা' প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় মাসিক বসুমতীতে। পববর্তীকালে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গ্রন্থাকারে উদ্যোগ নেন 'মিত্রালয়'-এর প্রকাশক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

স্মরণ রাখতে হবে, এতে আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের কাহিনী নেই। আছে সেই মানুষের কথা, যে অসহায়, যার পেটের অন্ন কারখানার চাকার সহস্র পাকে বাঁধা রয়েছে। যাদের অন্ন আসে দেহ বিক্রয়ের বিনিময়ে—হোক সে তরুণ কিংবা তরুণী, এতে তাদের কথাই আছে। একদিকে যেমন নিগ্রোরা অস্পৃশ্য, তেমনি আবার অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক প্রসূত বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হয়ে চলেছে অবিরত। অর্জিত আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার দাপটে দ্রুত এগিয়ে চলা একটি দেশের তলে তলে কি বিপুল স্বৈরাচার চলেছে অবিশ্রাম,তার কিছু ছায়া পড়েছে এই বইতে। লক্ষ্যণীয়—রামনাথের মত স্বাধীনচেতা নির্ভীক মানুষ এর মধ্যে অনেক কিছুই প্রচ্ছন্ন রেখে রীতিমত সাবধানে তাঁর অভিজ্ঞতা ইঙ্গিতে মাত্র ব্যক্ত করেছেন। তার কারণ, স্বভাবসিদ্ধ খোলাখুলি বললে ভারতের প্রভু ব্রিটিশেরও প্রভু আমেরিকা কতৃপক্ষ তাঁকে খুন করতে পারে। এ রকম ধারণা তাঁকে গ্রাস করে ঘুরছিল বইটির পরিকল্পনার শুরু থেকেই। না, তাঁর নিজের জন্য ভয় ঘিরে ধরেনি মোটেই। আসলে, তখন যে অনেকগুলি জ্ঞাতি-গুষ্টি এবং বাইরের মানুষের অন্নদাতা বনে গিয়েছিলেন। তাঁর উপরে নির্ভরশীল এতগুলি মানুষের আশা জলাঞ্জলি দেওয়া যে আরো কঠিন। তাইতো এই সাবধানতা।

কাহিনীর নায়ক ও নায়িকা যথাক্রমে আর্থার এবং মিসি। জন ও আর্থার নামে দুই আমেরিকান গরীব বন্ধু জীবন অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে। নিঃস্ব অবস্থায়। উদ্দেশ্য, কিছু রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। রোজগারের ধান্দায় দুজনেই নামতে নামতে অধঃপতনের চরম সীমায় (ডাগ আউট) পৌঁছে তারপর ঘুরে দাঁড়ায় ঘটনাক্রমে। জন চলে যায় জাহাজের খালাসী হয়ে এক পথে। অন্যদিকে, আর্থার জীবনটাকে নতুন খাতে ঘুরিয়ে নেয়। হলিউডের এক বৃদ্ধের সহায়তায় 'আন্ডার গ্র্যাজুয়েট' দলের মধ্যে একটু একটু করে ঢুকে পড়ে। যাদের মুখ্য কাজ সমাজের চরম অন্যায়কারীকে গুপ্ত হত্যায় ভবলীলা সাঙ্গ করে আমেরিকার সাধারণ মানুষেব মঙ্গল করা। মিসি সেই দলেরই এক বিশেষ আত্মত্যাগী সভ্যা। আসলে বৃদ্ধ ছিলেন দলের নেতৃস্থানীয় একজন। বৃদ্ধের একান্ত ইচ্ছে মিসি ও আর্থার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে আর্থার দম্পতি হোক। বাস্তবে হয়ও, আপনিই। কিন্তু মিসির আর এক পরিচয় বাঘিনী। আর্থার দলীয় নীতির প্রয়োজনে একটি খুন করলেও মিসির হাতে শেষ হয়েছে অসংখ্য। তবু সঙ্গগুণে এবং বাস্তববোধের উত্তরণে বিয়ের পর মিসির ধারণা পাল্টায়। তখন আর 'অ্যাকটিভ' নয়, 'প্যাসিভ রেসিষ্ট্যান্স'-এ বিশ্বাস বাড়তে থাকে। অনুধাবন করতে শেখে—শুধু খুন করে অত্যাচারীদের শেষ করা যাবে না। অর্থাৎ আর হত্যা

নীতি নয়। কারণ দেখা গেছে, অত্যাচারী শ্রেণীর একজনকে হত্যা করলে বদ্‌লা হিসেবে স্থানীয় প্রজাগণ গরু-ছাগলের মত মারা পড়ে।

কাহিনীর শেষে মিসি ও আর্থার চলেছে 'ইমপিরিয়েল ভ্যালী'তে। আমেরিকার শাসনাধীন ব্রিটিশ জমিদারী। মিসি অনেকবার সেখানকার শাসক জন ব্যুলের নায়েবদের শাস্তি দিয়েছে। অথচ, পরিণামে কাজের কাজ কিছুই হয় নি। তাই আজ ওরা দুজনে নবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ওখানকার মজুর 'গ্রেপ বয়'-দের সভায় চলেছে। সেখানে হাজির হয়ে ঘোষণা করে, দুর্দান্ত এই দানবদের জন্মস্থানে আঘাত হানতে হলে প্রথমেই মজুরদের মধ্যে একতা আনতে হবে। মজুর শ্রেণীর মধ্যে সামগ্রিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ঐক্য যেদিন সম্ভব হবে, সেদিনই পুঁজিদানবরা আর সৃষ্টি করতে পারবে না রক্তবীজের বংশধর। সবশেষে দেখা যায়, দুজনে সংসার জীবনকে আলীঙ্গন করলেও সংসার-জোয়ালে বাঁধা পড়েনি। দলীয় নীতি-পদ্ধতি বদল করে ঝাঁপিয়ে পড়ে সত্যিকার গঠনমূলক কাজে, মন-প্রাণ সঁপে। বোঝা যায় লেখার সময় তিনি যে উদ্দেশ্যটিকে সামনে রেখে ধীরে ধীরে উপন্যাসটি শেষ করেছেন, সেটি ছিল কমিউনিজমের জয়গান। আবার এটা বুঝতেও অসুবিধা হয় না, মানবতার পূজারী মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাই উপন্যাসমধ্যে দেখি নায়ক-নায়িকার আত্মচেতনায় নবমূল্যায়ণ ঘটিয়েছেন অত্যন্ত সুচারু উপায়ে। গুপ্তহত্যা, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি পথের ভুল-ভ্রান্তি নির্দেশ করে ঠেলে দিয়েছেন মানবিক পথে।

ভালো উপন্যাসের লক্ষ্য শুধুমাত্র চিত্তবিনোদন নয়, তার থেকেও কিছু বেশি। অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য এই যে এখানে পাঠক জীবনকে জীবনের মতোই দেখতে চান। তবে, জীবনকে যেমন বাঁধাধরা কিছু সংজ্ঞায় ধরা যায় না, উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তেমনি সঠিক সংজ্ঞানির্দেশ বড়োই কঠিন কাজ। ঢুকতে হয় গোলকধাঁধায়। তাহলেও, সাধারণভাবে বলা যায়, 'মোটামুটি দীর্ঘ যে কল্পিত গদ্যকাহিনীতে জীবনের জটিলতার প্রকাশ ঘটবে, যার ঘটনা এবং চরিত্রগুলি হবে বাস্তবের প্রতিনিধি এবং জটিলতা স্বত্ত্বেও যার মধ্যে সঞ্চিত হবে একটি শিল্পগত ঐক্য—তাকেই উপন্যাস বলা যাবে।' সেদিক থেকে 'হলিউডের আত্মকথা' একটি সার্থক উপন্যাস। বাস্তবতা যদি উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়, তাহলে বলতে হবে এখানে তা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি। বরং আভাষে-ইঙ্গিতে-ব্যঞ্জনায় তা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি বাঙ্ময়।

ঘটনা সংস্থান কৌশল এবং চরিত্র উপন্যাসের প্রধান উপাদান। সে পরীক্ষাতেও লেখক উত্তীর্ণ। কেন না নায়ক ও তার বন্ধুকে প্রথমে জীবনযুদ্ধে ছুঁড়ে ফেলে তাবপর চিঠির মাধ্যমে আত্মকথা বর্ণনে শুরু করে কলা নৈপুণ্যের সুচারু ভঙ্গিতে যেভাবে লক্ষ্যে পৌঁছান, তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। অন্যান্য চরিত্রগুলিকে তাদের ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাস সমেত আমাদের চারপাশে দেখতে পাই। রোমান্টিকতা, জীবনমুখীতা এবং মানব-মঙ্গলের পথ খোঁজার জটে হাবু-ডুবু খাইয়েও তা থেকে নায়ক-নায়িকাকে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া লেখকের বড়ো কম কৃতিত্ব নয়।

নাবিক

শুরুতেই লেখক বক্তব্য রেখেছেন—'নাবিক' একাধারে উপন্যাস এবং নাবিক হবার উৎসাহ সূচক ইঙ্গিত।

পৃথিবী ভ্রমণ করার সময় প্রশান্ত মহাসাগব তিনবার এপার-ওপার, ভূমধ্যসাগর একবার, ভারত মহাসাগর উত্তর-দক্ষিণে এবং পূর্ব-পশ্চিমে একবার করে, চিনা ভাষায় 'সাউথ সী' অনেকবার ছাড়াও আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর অসংখ্যবার পাড়ি দিয়েছেন। সমুদ্র, জাহাজ, জাহাজের যাত্রী এবং নাবিক সংক্রান্ত যে ব্যাপক অন্তর্তদন্ত করেছিলেন তারই নির্যাস থেকে এই উপন্যাসের উৎপত্তি।

জোতদারের ছেলে নবেন। চট্টগ্রামে বাড়ি। আজীবন সংস্কারে বদ্ধ। উচ্চনীচ জাতিগত ভেদাভেদে রপ্ত। সেই বদ্ধ জলাশয় থেকে নাবিক জীবনের মনুষ্যত্বে উত্তরণই এই কাহিনীর মূল লক্ষ্য-বেদী। কাহিনীর শুরু আরবদেশের বন্দর পোর্ট সৈয়দ থেকে। এরপর জাহাজ ঢোকে ভূমধ্যসাগরে। নঙ্গর করে বৃন্দিসী বন্দরে (ইটালী)। ওখান থেকে জেনেভা হয়ে লিভারপুল। মূল কাহিনীর যাত্রা এখান থেকেই।

নরেনের বাবা কলকাতাব রামবৃজের হাত ধরে কান্না গলায় পুত্রকে বিলেত থেকে ব্যরিস্টাব হতে কাঙ্খিত হয়ে সঙ্গে পাঠান। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে পথে না গিয়ে নরেন আস্তে আস্তে নাবিক জীবনকে ভালবেসে ফেলে। সে কাজে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার জোরে ক্রমে পঞ্চম অফিসার পদে উন্নীত হয়।

লিভারপুলে নবেন আকস্মিক এক যুবতীর প্রেমে পড়ে। এ সম্বন্ধে লেখক লিখেছেন, 'নরেনের গুণগত উত্তরণের সহায়ক রামবৃজের জীবন যে বকম আরম্ভ হয়েছিল, নরেনের জীবন সে রকমে গড়ে ওঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের কোকিলের কুহু কুহু রব মনে না আসুক, তার মনে ভেসে আসছিল দত্তার কথা।' যুবতী যেবকম অবলীলায় তার সঙ্গে মেশে, আপাত দৃষ্টিতে তা মনে হয় বেশ যেন দাপটের সঙ্গে। কিন্তু নরেনের প্রেমার্ত মনে গভীর রেখা কেটে হঠাৎই সুকন্যা মিলিয়ে যায়, উদাসীনভাবে।

নায়িকার নাম জুলিয়া। যে ছিল কোটিপতি 'পিয়ারসন কোম্পানীর' খোদ মালিকের রূপসী ও খেয়ালী কন্যা। সেই জুলিয়ার হঠাৎ প্রকৃতিব ডাকে অ্যাডভেঞ্চার করার ইচ্ছে জাগে। তারই একান্ত আবদারে বাবা একটি অতলান্তিকগামী চার্টার (ভাড়া করা) জাহাজের সঙ্গে যাওয়ার ব্যবস্থা কবলেন। যার ক্যাপ্টেন টমাস আসলে চলেছেন, লন্ডনের এলেন এট্কিন্সের দেওয়া সূত্রে, তাঁর নিজ কোম্পানির মালিকের নির্দেশে গুপ্তধনের রহস্য আবিষ্কারে। অতলান্তিকেব মাঝে জেগে ওঠা এক দ্বীপের মাঝে আছে সেই সোনার চাবিকাঠি।

টমাস ও পিতা পিয়ারসনের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল, দুলালী কন্যা হবে জাহাজের একমাত্র সম্মানিতা যাত্রী। সঙ্গে থাকবে গভর্নেস। জাঁকজমকপূর্ণ যাত্রায় সমস্ত খরচের দায়ভার নিলেন ধনী পিয়ারসন। কন্যার মনস্তুষ্টির জন্য।

উপরোক্ত জাহাজে নরেনও ছিল। জাহাজী কাজে রপ্ত হলেও স্বভাবতই প্রকৃতি

প্রেমিক। মূলত সে জন্যই ভেসে পড়া জীবন গ্রহণ করেছিল। দুজনের স্বভাব সম্বন্ধে লেখক মন্তব্য করেছেন—'জুলিয়া চলেছিল প্রকৃতিকে পরাজয় করতে। নরেন চলেছিল প্রকৃতির ক্রোড়-এ নিজেকে আশ্রয় দিতে।'

চূড়ান্ত সাবধানে ক্যাপ্টেন টমাস যখন পকেটে গুপ্তধনের ম্যাপ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন, জুলিয়া ও নরেন তখন নীরব প্রেমের ভাষা খুঁজছে। ভাষাহীন আর্তি তাদের চারচোখে রামধনু হয়ে ভেসে বেড়ায়। জাহাজ তাঁর ক্যাপ্টেনের নির্দেশে ঠিকমতোই এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে, এক রাত্রে দু-দু'বার ঝোড়ো তান্ডবের মধ্যে পড়লো। বেদম হয়ে জাহাজ আর না লড়তে পারার শব্দ তুলছে 'মচ্‌মচ্‌' করে। একবারতো ঢুকেই পড়লো ঘুর্ণিপাকের প্রায় কবলে। কিন্তু না। ক্যাপ্টেন দূরন্ত হিম্মতের সঙ্গে সব বাধা অতিক্রম করে বহু ঈপ্সিত দ্বীপের গায়ে ভেড়ালেন জাহাজটিকে। দ্বীপে উঠেই তাদের ক'টি বন্দুক শূন্যে গর্জন করে উঠল 'গুড়ুম-গুড়ুম' করে। পা বাড়াবার আগে বিচক্ষণ ক্যাপ্টেন চোখের সামনে মেলে ধরলেন ক্ষমতাশালী দূরবীন। বেশ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরানোর পর কাঁচের মধ্যে ধরা পড়ল বিশাল বিশাল চুল দাড়ি সমেত এক মানুষ। বন মানুষের সমতুল্য। দলবল নিয়ে এগুতে লাগলেন ম্যাপ নির্দেশমত চৌকো পাথরের দিকে, অত্যন্ত সন্তর্পণে। অবাক কাণ্ড। চারকোণা পাথরটার কাছে পৌঁছানোমাত্র ওপর থেকে বিশাল পাথর 'হুড়-মুড়-ধুড়-ধাড়' করে নেমে আসার শব্দ। চকিতে ছিট্‌কে সরে গিয়ে নিজেদের বাঁচালেন টমাস।

কিছুক্ষণ স্থির বুদ্ধির সাহায্যে চিন্তা করলেন। ম্যাপে তো পরিষ্কার নির্দেশ আছে চৌকো পাথরটাই রত্নসন্ধানের চাবিকাঠি। অথচ পৌঁছাতেই এমন কাণ্ড কি করে সম্ভব। তাহলে কি পাথরটাই যখের ভূমিকা নিয়ে ডেকে আনতে পারে আরও বিপদ? বহু অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান নেতা পাথরটাকে সরাতে চেষ্টা না করে ওটাকে পাহারায় রেখে চললেন দ্বীপের একমাত্র অধিবাসীর কাছে. সঠিক তথ্যের জন্য। চমকের পর পিলে ফাটানো চমক্! ঘন্টাখানেক অনুসন্ধানের পর মিলল সন্ধান। না, বনমানুষ তো নয়ই, এমনকি সাধারণ মানুষও নয়। দুবছর আগে পৃথিবী পরিক্রমায় বের হওয়া বিখ্যাত অ্যাডমিরাল ডগ্‌লাস। হারিয়ে যাওয়া ভূপর্যটক আজ চোখের সামনে। শোনা গেল, উনিও একই সূত্রে মি: এলেন-এর কাছ হতে এই রত্নদ্বীপটির সন্ধান পান। ভূপর্যটন সিকেয় তুলে শুধুমাত্র লোভের বশবর্তী হয়ে দু'বছর আগে এখানে আসেন। জাহাজটিকে সাগরে রেখে একাই নামেন, টুকিটাকি জিনিষপত্র নিয়ে।

তারপরেই ঘটল অবিশ্বাস্য কাণ্ড। তিনি যখন হিসেব মতো এগিয়ে এসে বীরবিক্রমে পাথরটাকে ধরে একটু একটু করে সরাবার চেষ্টা করছেন, ওদিকে তখন দূর-সাগরে তাঁর সাধের জাহাজটিরও ধীরে ধীরে অতল সমাধি হয়ে গেল। পাথর নিজের জায়গাতেই রইল অনড়। এবং উনিও একা। সেই থেকে নির্জন দ্বীপের একমাত্র বাসিন্দা অ্যাডমিরাল ডগ্‌লাস।

ডগ্‌লাস এক বিচিত্র পরামর্শ দিলেন। সেইমত, টমাস পাথরের চারদিকের গায়ে চারটি ডিনামাইট রেখে তারগুলি অনেক উপরে থাকা অ্যাডমিরালের হাতে দিলেন।

এরপর ডগলাসের নির্দেশে টমাস লোকজনসহ জাহাজটিকে দ্বীপ হতে ছিটকে নিয়ে যেতে থাকলেন বহু দূর সাগরে, ঘন্টায় ১৫ মাইল গতিতে। এরকম ২৬ ঘন্টা পরে অর্থাৎ জাহাজ যখন ৩৯০ মাইল দূরে পৌঁছবে, ডগলাস তখন 'একস্‌প্লোশান' ঘটাবেন। এরপরেও দ্বীপ থাকলে ক্যাপ্টেন ফিরে এসে অ্যাডমিরালকে বাঁচাতে এবং ধন সম্পত্তির সুরাহা করতে নিশ্চয়ই পারবেন।

ছাব্বিশ ঘন্টার পর বেতার তরঙ্গে খবর পেয়ে ছুটে আসে চারটি উড়ো জাহাজ। টমাসও তাদের সাহায্য করেন সঠিক স্থান নির্দেশে। ত্বরিত গতিতে উড়োজাহাজ সেখানে পৌঁছলেও সেই মুহূর্তে ল্যান্ড করার মত আর অবস্থা নেই। গোটা দ্বীপটাই ড়বছে তখন একটু একটু করে। বিমান হতে ঝুলিয়ে দেওয়া বস্তায় কোনওরকমে প্রাণ রক্ষা হয় ডগলাসের। ক্যাপ্টেন টমাস তাঁর জল-জাহাজ চালিয়ে ফিরে এসে হতবাক্ হয়ে যান। কোনও চিহ্নই নেই আর সে দ্বীপের। চারিদিকে শুধু জল আর জল।

ক্যাপ্টেন আশাহত হলেও, লক্ষ্যহারা হননি আমাদের লেখক। ধনীক শ্রেষ্ঠীর আদুরে কন্যার আবদারে জাহাজ ভিড়ানো হয় ফলে ভরা এক মনোরম দ্বীপে। সেখানে ব্যবস্থা থাকে নায়কের সংস্কারবোধ থেকে আরও আরও মুক্তির। আয়োজন হতে থাকে নারী মুক্তির আবহাওয়া তৈরীতেও। বিভিন্ন দিকের সহযোগিতায় সমাজের মানস-বন্ধন থেকে মুক্ত হয় নাবিক। নাবিক-নায়ক নরেন উদার-অসীম সমুদ্রের খোলা হাওয়ায় বুক ভরে নেয় নিঃশ্বাস।

রামনাথ বিশ্বাসের 'নাবিক' শুধু উপন্যাসের মধ্যে নয়, তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যেই শ্রেষ্ঠতম। উপন্যাসটি পড়তে বসে পাঠকের সমস্ত সত্ত্বা বাঁধা পড়ে এক তারে। এমন কৌতূহলী, ঠাসবুনট ও রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারমূলক উপন্যাস সচরাচর দেখা যায় না। এর মধ্যে মনুষ্যত্বে উত্তরণ থেকে শুরু করে নাবিক ও জাহাজের নাড়ি নক্ষত্র, ব্যক্তি মানুষের প্রেম, ষড়যন্ত্র, কামনা, বাসনা, উৎকণ্ঠা, গুপ্তধন ও অ্যাডভেঞ্চার পর্যন্ত সবই আছে। হাতের মুঠোয় বিশাল সমুদ্রের রত্নধন হাজির করার মতো আমাদের লেখক পাঠক হৃদয়ে পৌঁছে দেন অতুলনীয় সাহিত্য সম্পদ।

সমুদ্রের মতোই নাবিক নরেনের সংস্কার মুক্তি ছিল উপন্যাসের লক্ষ্য। কেবল এই ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে শেষ পর্বটি মনে হয়েছে ক্রম না মেনে কেমন যেন আকস্মিক আগমন। চোখে লাগে। গোড়া থেকে বাঁধা এক তারে হঠাৎ বেমানান টঙ্কার ওঠে, এই যা।

ছোটগল্প

চোখের সামনে হাঁড়িভর্তি রসগোল্লার মতোই ছোটদের জন্যেও আছে সুখবর। পৃথিবীর যেখানেই রামনাথ গেছেন, ছোটদের টেনে নিয়েছেন বুকে। আরব, তুরস্ক, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লাভিয়া প্রমুখ দেশ-বিদেশের শিশুদের গল্প যেমন ছোটদের বলতে ভালবাসতেন, তেমনি নিজেও প্রভূত আনন্দ পেতেন। শিশু ও কিশোরদের কথা ভেবেই ভাষাকে সরল ও সহজ বোধগম্য করতে যত্ন নেন। যখন যে দেশের মাটিতে

পা রেখেছেন, ভালবেসেছেন সেখানকার কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের। মন দিয়ে শুনেছেন তাদের অন্তরের কথা। নানান দেশের গল্প শোনানোর ছলে শিখিয়ে গেছেন ভ্রমণে উৎসাহী হতে, সোজা পথের পথিক হতে, কর্মে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আনতে এবং মানুষ হওয়ার সাধনায় মেতে উঠতে। কলকাতায় শেষ পনের বছর থাকাকালীন কত স্কুল, কলেজ, ক্লাব ও বিভিন্ন রকমের সংগঠনে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার কোনও সীমা পরিসীমা নেই। এ সবই শুধুমাত্র নবীনদের মনে জোয়ার আনতে। আজকের বয়োজ্যেষ্ঠ ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল কর, মৌমাছি থেকে শুরু করে তাবড় তাবড় সাহিত্যিক, প্রাক্তন খেলোয়াড়, মাউন্টেনিয়ার, ডাক্তার ও অন্যান্যরা তাঁদের স্কুল কলেজ জীবনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছেন তাঁর উজ্জীবনী বক্তৃতা। তাঁর সেই নবীনতায় ভরা প্রাণদায়ী বক্তৃতার ঢেউয়ে দোদুল্যমান হন নি, উন্মাদনা অনুভব করেননি একটুও, সেই সময়ে এমন মানুষ ছিল বিরল।

ভবঘুরের গল্পের ঝুলি

এই দুনিয়ার পথে-বিপথে ঘুরে নিজ অভিজ্ঞতা থেকে ১৬টি গল্পের সঙ্কলন গ্রন্থ 'ভবঘুরের গল্পের ঝুলি' লিখেছেন, শুধুমাত্র ছোটদের কথা ভেবে। গল্পগুলি যথাক্রমে—(১) শক্ত হলেই ভক্ত মেলে—নইলে সবাই পায়ে ঠেলে, (২) ভয় করো জয়—নইলে কিছুই নয়, (৩) স্বাধীনের নেই মরণ ভয়, (৪) মনের জোরেই বিশ্বজয়, (৫) মরুর দেশে মধু মেলে, (৬) আলোয় ভরা কালো ছেলে, (৭) কথা বটে অল্প তাহলেও গল্প, (৮) ধর্মের নীতি না মানুষেব প্রীতি, (৯) মাথার ওপর ঝুলছে তোদের খাঁড়া, (১০) বিপদে যে ধীর সেই তো রে বীব, (১১) এর নাম প্রায়শ্চিত্ত, (১২) স্বাধীন তুর্কী, (১৩) কলির দধিচী, (১৪) নির্লোভের দান—আজও অম্লান, (১৫) সৎ শিক্ষা লবে—তবেই বড় হবে, (১৬) মানুষের জন্য ত্যাগে হও ধন্য।

শুরুতেই "আমার কথা" শিরোনামে লিখেছেন—'আমার দেশের ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই মা বাপের কাছ থেকে সাধারণতঃ শেখে হুকুম তামিল করাব শিক্ষা, ভাবে কি করে কেবাণী হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের কাঠামোয় তৈরী মন সব দেশের মা বাপের নয়। তাই সে সব দেশের ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই ভাবতে শেখে স্বাধীন মন নিয়ে। এবং ভবিষ্যতে কি করে ভয়ডর দুর্বলতাকে দূরে রেখে স্বাধীন মন নিয়ে কাজেব মানুষ হওয়া যায়, তারও চেষ্টা করে। আমি দেশ বিদেশ ঘুরে, চাক্ষুষ দেখে এসেছি সে সব দেশের ছেলেমেয়েকে, মিশেছি তাদের সঙ্গে। চোখে দেখা সেই সব ছেলেমেয়ের ছবি আজও মনের কোণে স্পষ্ট আঁকা রয়েছে, অন্তরে রয়েছে তাদের প্রতিটি কথার প্রতিধ্বনি, আর তাই আমার ভবঘুরে জীবনের শেষ্ঠ সঞ্চয়। এ শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়ের ভাগ আর কাউকে না দিয়ে দিতে চাই আমার এ দেশেব ছোট্ট বন্ধুদের। তারা যে বড় আপনজন। ইচ্ছে করে, তাদের জনে জনের কাছে গিয়ে শোনাই গল্প—কিন্তু তা তো হবার নয়, তাই আমার 'গল্পের ঝুলিকে' বইয়ের রূপ দিয়ে হাজির করলাম তাদের কাছে।

এ 'ঝুলির' বেশ কয়েকটি তখনকার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দমেলা' বিভাগে বের হয় 'মৌমাছি'র নিজ তত্ত্বাবধানে। সেজন্য স্বীকৃতি দিতে ভোলেন নি—'লেখার ব্যাপারে খুবই উৎসাহ যুগিয়েছেন সহজিয়া বন্ধু 'মৌমাছি' বা বিমল ঘোষ। এদেশে এসে তাঁর মাঝেই পেয়েছি বিদেশী প্রাণের পরশ। তিনি আমার মত পায়ে হাঁটা ভবঘুরে না হলেও পুঁথিঘাঁটা ভবঘুরে বটে—তাই আমাদের দুজনের অন্তরের মিল রয়েছে এই বইটির প্রতি লাইনে লাইনে।'

ভারতীয় হামিদ-এর গল্প 'শক্ত হলেই ভক্ত মেলে'। বেচারীকে আফ্রিকার জাঞ্জিবারে পেট চালাতে হয় কুলির কাজ করে। একাজ সে অসম্মানের মনে করে না বটে। তবু ভাগ্যের পরিহাস, কোনও কোনও দিন কাজ না জুটলে লড়াই চালাতে হয় পেটের সাথে। এরকমই এক অভুক্ত দিনের শেষ বেলায় জুটল কাজ। খদ্দের সাদা চামড়ার সাহেব। হামিদের চোখ চকচক করে ওঠে। মহানন্দে তুলে নেয় মালের ভার। কিন্তু কাজের বিনিময়ে হাত পাতলে মজুরী মেলে—কানম-া। দোষ 'কালা আদমী' হওয়ায়। যেন দেহের রঙ কালো হলে, সব কিছু ন্যায্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত হতেই হবে। এতটা আর স্বাধীনচেতা ভারতীয় কুলির সহ্য হোল না। কান ধরা মাত্র লাগিয়ে দিল ধমাধম ঘা দু'চার। হলে কি হবে, পরিণামের কথা ভেবে, পালিয়ে এসে বসে সমুদ্রেব চড়ায়। কি আর করে, মন মরা হয়ে একসময় গুমরে কেঁদে ওঠে। এমন সময় পায়ের শব্দে চকিতে ফিরে দেখে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, নতুন করে অশান্তির চিন্তায়। কিন্তু কৈ নাহ্! এতো শুয়োরেব মতো রাগী আর গোঁয়ার নয়, এ যে দেখি অনুতপ্ত সাহেব! উপযুক্ত মাত্র নয়, যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়ে তবে ফেরে সাহেব। সেই হামিদ বার বার তিনবার চেষ্টার পর চতুর্থবারে আমেরিকায় নামতে সফল হয়।

গল্পের শেষে 'খাঁটি হামিদ'-এর উদাহরণ দিয়ে লেখক ছোটদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন—'আশা কর্রি, এখন থেকে মান অভিমান কমিয়ে শক্তি আর সাহস বাড়াবার চেষ্টা করবে।'

'মনের জোরেই বিশ্বজয়' থেকে জানতে পারি, রামনাথ শ্যামদেশে (থাইল্যান্ড) এক গ্রাম্য পাঠশালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও ছেলেরা তাঁকে দেখতে পায় নি। বোর্ডের সামনে দাঁড়ানো মাষ্টারমশাইয়ের কাজ দেখছে গভীর মনোনিবেশে। আগন্তুকের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে মাষ্টারমশাই বোঝালেন—"একাগ্রতাই শিখতে হয় প্রথম, তার পর লেখাপড়া।"

আরো বুঝতে পারলেন, এখানে জোর করে বাচ্চাদের ঠেলে গুঁজে পড়তে পাঠানোর বদলে সর্বপ্রথমে পাঠানো হয় খেলনাপত্তর দিয়ে। সেখানে দেখা যায় খেলছে, কামড়াচ্ছে, 'ভ্যাঁ' সুরে কাঁদছে আবার ঘুমিয়েও পড়ছে। আপন মনে খেলে দেলে একাগ্রতা শিক্ষাই সেখানে প্রাথমিক সোপান। এরপর ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োগ শুরু হবে। দেখেন—উনিশ বছরের গ্র্যাজুয়েট ছেলে বনের মধ্যে ঘর করছে, নিজে স্বাধীনভাবে থাকবে বলে। প্রয়োজন দেখা দিলে ভবিষ্যতেরও একটা আগাম ব্যবস্থা করে রাখা আর কি। কেন না পরের বছর থেকে

শুরু হয়ে যাবে তার বাধ্যতামূলক পল্টনী চাকরী জীবনের পরাধীনতা।

"কথা বটে অল্প তা হলেও গল্প" তে স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্ট ভাষা ও ভঙ্গিতে বলতে পারেন—'অবিশ্যি গল্পে একটু যোগ একটু বিয়োগ করতে হয়। কিন্তু আমার দ্বারা সেটি সম্ভব নয়। যা দেখেছি তাই বলছি। শিশু সাহিত্যে আজকাল এদেশে আজগুবি, মিথ্যে কাল্পনিক কাহিনীর খুবই চল হয়েছে, এর ফলে দেশের ছেলেগুলিও সব আজগুবি চীজ হয়ে উঠেছে—বাড়িয়ে বলাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের স্বভাবের দোষ।'

পর্যটক 'মলিম-নেওয়ার' নামে এক জায়গায় চলেছেন। মালয় সঙ্গীটিকে ভালো খাওয়ার জল কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করায় উত্তর মিলল—"কালু পিগি ছুকু বাতু আয়ার বলে ডামপাত লা"। অর্থাৎ, আর দু'ফার্লং গেলে পাবে। এরপরে অনুচরটি তাঁর সাহস পরীক্ষার জন্য শুরু করলো একের পর এক ভয় দেখানো। আমরা জানি, মানুষটি সে বান্দা মোটেই ছিলেন না। কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্য। ছেলেটি আশ্বস্ত হয়ে পরের দিনের সঙ্গী নিযুক্ত করে দেয় 'পুতে' নামে এক যুবককে। যার সঙ্গে ছিল 'পারাং' নামে লম্বা দায়ের মত মারাত্মক ধারালো অস্ত্র, অতিথির নিরাপত্তার প্রয়োজনে। পথ সংক্ষেপের জন্য বিশাল উঁচু উঁচু 'লালাং' ঘাসের মেঠো পথে প্রায় ডুবে গিয়ে চলেছেন। এমন সময় চোখের পলকে কোথা থেকে ৩ জন ডাকাত বের হয়ে পিস্তলের বাঁট দিয়ে আক্রমণ করল মলয় যুবকটিকে। আদতে সে ছিল অকুতোভয়। অমিতবিক্রমে যুযুৎসুর কায়দায় লড়ে গেল তিন জনের সাথে, একাই।

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও একটু পরে খেয়াল হয়, ছেলেটি অতিথির জীবন রক্ষার জন্য কখন তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে ভয়ঙ্কর অস্ত্রটি। নিজের জীবন বিপন্ন বুঝেও একবারের জন্য সেটি চেয়ে নেয় নি। ঘোর কাটতে লজ্জার মাথা খেয়ে ভাবলেন, ধারালো দিক কষে ঝাড়লে অন্তত দুজনের সমন নির্ঘাৎ। নাঃ, এতোটার দরকার নেই। শেষে ঘুরিয়ে ওটার বাঁট দিয়ে একজনকে সজোরে মারতেই তার পিস্তল পড়লো ছিটকে। দেখা গেল, গুলিহীন ফাঁকা। ভরসা পেয়ে 'পারাং'টি বাগিয়ে ধরে আগুয়ান হলেন। শেষের ক'মিনিট হাতাহাতিতে যোগ দিলেও সার বুঝেছিলেন. এ সাহসের কোনও বাহাদুরি নেই। কারণ, ও তো একাই শুধু খালি হাতে লড়ে ওদের পিছু হটে গা ঢাকা দিতে বাধ্য করলো।

মজার কথা, সন্ধ্যে বেলার ঘটনাটি পরের দিন সকালে শহরে রটে গেল, রোমাঞ্চকরভাবে। ওঁদের নাকি পঁচিশজন চীনা আক্রমণ করে এবং সাইকেল বাবুর পিস্তলে অনেকে ঘায়েল হয়ে পালিয়ে বেঁচেছে সব—কারুর টিকি উড়ে টাক্ পর্যন্ত হয়ে গেছে ইত্যাদি। অর্থাৎ, মিথ্যেব জয়ঢাক। শুনে তো বাবুর গা রি-রি করে জ্বলে যায়। তাড়াতাড়ি সবাইকে ডেকে ঠিক ঘটনাটি বর্ণনা করে তবে স্বস্তি। গল্প বলিয়েদের মুখ চুপসে গিয়ে সে কী করুণ অবস্থা! গল্পটি শুনিয়ে তাজা প্রাণ, তাজা মনের অধিকারীদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে বলেন—'সব জিনিস বাড়িয়ে বলাটা যেন বর্ত্তমান সভ্য সমাজের একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে—মিথ্যের ভিত্তিতে সব কিছুই গড়বাব চেষ্টা চলছে। কিন্তু হায়! মিথ্যে যে ভাই শেষ পর্যন্ত টেকে না, ওর কোনও

স্থায়িত্ব নেই। তাইতো তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, বাড়িয়ে কথা বলার স্বভাবটা ছাড়ো। আর বাড়িয়ে যারা কথা বলে বা বীরত্বের বড়াই করে তোমাদের ভোলাতে চায়, তাদের কথা একটুও বিশ্বাস কোরো না। ওতে মন দুর্বল হবে, বুঝলে?'

গায়ে কাঁটা দেওয়া গল্প, ''এর নাম প্রায়শ্চিত্ত''। এক আফগানিস্থানী ছেলের নাম 'গুল'। হিন্দুস্থান থেকে রোজগার অন্তে দেশে ফিরে গিয়ে শোনে তার স্বভাব-চোর বাবা রুমাল চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। পুলিশ ছেলের কোনও ওজর-আপত্তি শুনল না। গুল এখন বিশাল অর্থ সম্পদের মালিক (কালদার) হয়েছে। সুতরাং আত্মসম্মান আছে। তাই অপমান থেকে বাঁচার জন্য কাজীর সামনে বলল, 'চুরি সেই করেছে। বাবা নিয়ে গিয়েছিল ছেলের ভেবে। অতএব বাবা নিরপরাধ। পুত্রের আবেদনে মুক্ত হল পিতা। পরে কাজী চুরি করা হাতটি কেটে ফেলার শাস্তি ঘোষণা মাত্র গুল বাড়িযে ধরলো তার বাঁ হাতটি। ওদিকে বাবা খবর পেয়ে পড়িমরি করে কাজীর দববারে ছুটে এসে দেখে ছেলের বাঁ হাত কাটা। ফিন্‌কি ছোটা রক্ত ধারাব মধ্যে ছেলে অসহ্য যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে। বাবাকে দেখা মাত্র গুল কাটা হাতটি ডান হাতে নিয়ে বাবার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো—'এই নাও তোমার কাজের ফল'। গুলের বাবার মুখে কথা নেই, ছেলের কাটা হাতখানিকে বুকে নিয়ে কোথায় যে পাগলের মতো চলে গেল, কেউ তার খোঁজ রাখলে না। বানানো নয়, সত্যি গল্প। গল্পের শেষে এই শক্তিশালী পাঠান জাতীর উদাহরণ ছুঁড়ে দিয়ে, রামনাথ কামনা করেছেন, ভারত মুক্তির উপায়।

''কলির দধিচী'' গল্পের গৌবীশ চন্দ্র সিংহরায় একজন পালিয়ে বেড়ানো দেশ হিতৈষী কর্মবীর। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত পঙ্গু শরীবটা পায়ে পায়ে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ছে, জানে। তবু, পৃথিবীর জঞ্জাল সবিয়ে মানুষের বাঁচার মত মাটি তৈরীর জন্য সে কী সীমাহীন প্রচেষ্টাতেই না ব্যস্ত। সারাটা জীবন শুধু পরহিতে বিসর্জিত। ডাক্তারী গবেষণার উন্নতিকল্পে, মৃত্যুর পর তাঁর নিজ দেহখানি দানের অগ্রিম লিখিত প্রতিশ্রুতি, দধিচীর অস্থি দানের তুল্য মহৎ মনে হয়েছে লেখকের।

''সৎ শিক্ষা লবে—তবেই বড় হবে'' তে আমরা দেখতে পাই একটা উন্নতিশীল জাতির ইঙ্গিত সূত্র। তুর্কী থেকে সারা ইউরোপ যেখানেই গেছেন তঁকে দেখার জন্য সকলে ছুটে আসত। বিশেষ করে ছোটরা। তবে তাঁর প্রতি আকর্ষণ অন্য ভ্রমণকারীদের ক্ষেত্রে যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনটি মোটেই না। বরং সবই তাঁর অদ্ভুত, সৃষ্টি ছাড়া, দৃষ্টিকাড়া বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য। বিশেষ করে শোলার টুপিটা। মাথার সাথে এঁটে-সেঁটে ছুটত এঁটুলি পোকা হিসেবে নয়, পরম সহযাত্রী হয়ে। রোদ-ঝড়-বৃষ্টি ছাড়া আয়না সদৃশ অস্বস্তিকর টাকটি এড়াবার চেষ্টাও বটে। সকলে যখন এসে জানত ভারতীয় পর্যটক, কথা বলত যে যার ভাষায়—উনি জবাব দিতেন ইসারা ইঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে।

১৯৩৫/৩৬ সালের কথা। ১৪/১৫ বছরের কটি ছেলেমেয়ের সাথে চলেছেন জার্মানির 'হেনোভার'-এ। পর্যটকের লক্ষ্য করতে ভুল হয না, ফুটন্ত ওরা জাতের ধার ধারে না। শুধু বড়দের থেকে চাইত একটু দরদ আর ভালবাসা। মিললে ভাল, না

পেলে থোড়াই কেয়ার। আপনাতে আপনি ফোটে।

টুং-টাং বেল বাজিয়ে ছুটে চলেছে সাইকেলগুলি। হাইওয়ের দুপাশে ছবির মতো সাজানো ফলের বাগান। রঙ-বেরঙের ফল -পাকুড়ে থিক্‌থিক্ করছে। পড়ে থাকা ফল এর আগে খেয়েওছেন মাঝে-মধ্যে। সেদিন দলবেঁধে ছুটে চলার সময় হঠাৎ কোথা থেকে ধেয়ে এল দুর্যোগময় ক্ষ্যাপা ঝড়। সঙ্গী ছিল তীক্ষ্ণ ফলার মত তুষার পাত। ৩-৪টি ছেলে এবং দুটি মেয়ে তাড়াতাড়ি সাইকেল থেকে নামে। ওনাকে টেনে এক জায়গায় মাঝে বসিয়ে সকলে মাথা নীচু করে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘিরে বসল। ঝড়ের দাপট শেষে আবার চলা শুরু হলে নজরে পড়ে পথের ওপর এক জায়গায় জড়ো করা আপেল। বয়স্ক আগন্তুক ছিলেন ক্ষুধার্ত। তাড়াতাড়ি একটি তুলে কামড় বসানোয় টক মনে হওয়া মাত্র ছুঁড়ে ফেললে পিছনের একটি কিশোর রীতিমত বকাবকি শুরু করে, 'ছোঁড়ায় অন্যায় হয়েছে' বলে। ছেলেটি নিজে একটি আপেল তুলে কিছুটা খেল। তারপর ছুরি বার করে সেই ভুক্ত অংশটুকু সুন্দর করে ছেঁটে ফেলে আবার যেমনকার তেমনি সাজিয়ে রাখে। বিদেশী হাড়ে হাড়ে অনুভব করলেন, জাতির দৈন্য বাড়ে—এমন ধরণের বদ স্বভাব কিংবা অপব্যয়ের কু-অভ্যাস এদেশে কত ছোট্টবেলায় ছাড়তে পেরেছে, উচ্ছিষ্ট আপেল-অংশের মতোই। আরো দেখবার, সাইকেল থেকে থুথু ফেলার দরকার হলে এরা নেমে রাস্তার বাইরে ফেলে আবার চালাতে শুরু করে। রাস্তা বা পিছনের জনকে নোংরা না করে সামান্য এই সাবধানতা অবলম্বনের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে অন্যের অনিষ্ট না করার অতি বড় শুভ চিন্তা। একটা জাতের উন্নতি করতে হলে কত কি করতে ও শিখতে হয়। অথচ আমাদের দেশে দেখেছেন, বাসে, ট্রামে, ও সাইকেল থেকে যেখানে সেখানে থুতু ফেলা হয়। সিগারেট-বিড়ি টেনে অপরের মুখের ওপর ধোঁয়া ছুঁড়ে দেওয়া হয় নিশ্চিন্ত আরামে। খেয়াল হয় না, সেটা অপরের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর বা অস্বস্তিকর।

অনেক আশা-ভালবাসায় বুক বেঁধে, আবেদন রাখেন নিজ দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের উদ্দেশ্যে—'দেখ, তোমরা এই সব ছোটো-খাটো দোষ ত্রুটি শুধরে নিয়ে—বড় হও, জাতকে বড় করো।'

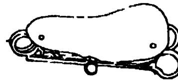
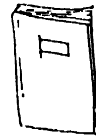
ইউরোপ ভ্রমণে বেলজিয়ামের এনতোয়ার্পে 'স্যালভেসন আর্মি'র বাড়িতে ঢুঁ মারতে দেখা যায়, রাজ্যের যত গরিব সেখানে থাকে। উনিও গরিব। কাজে কাজেই আস্তানা গাড়লেন ঐখানে। একদিন আর্মি কর্তার সঙ্গে গল্প করতে করতে বের হতে গিয়ে নজরে পড়ে ভদ্রলোকের পোষা সুন্দর বেড়ালটিও চলল লেজ দুলিয়ে। এরপর একটা বাঁক ঘুরতেই কয়েকটি ছেলে এসে কি বলায় ভদ্রলোক তাঁর বন্দুক বার করে বেড়ালটিকে অনুসরণ করলেন। কিছুটা দূর গিয়ে দেখা গেল বেড়ালটি পচা ইঁদুর খাচ্ছে, মেজাজে। তাই না দেখে, প্রভু আচমকা বন্দুক তুলে 'দুড়ুম' শব্দে গুলি করে জীবটির ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। ছেলেগুলিও অমনি কোথা থেকে ময়লা গাড়ি এনে অন্যত্র ফেলে দিয়ে এল।

ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ভুবন-পথিক জানতে পারলেন, ওরাই এসে সতর্ক করে—

বিড়ালটি রোজ সংক্রামিত পচা ইঁদুর খাচ্ছে। আর্মি বাড়িতে যদি বিষাক্ত ইঁদুর খেকো বিড়ালটি যাতায়াত করে তাহলে সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। সুতরাং ওটিকে মারাই উচিৎ। ছেলেদের সুবুদ্ধির বহর দেখে ভবঘুরে অবাক। ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতভম্ব রামনাথকে বোঝালেন, জাতির কল্যাণ করতে হলে অনেক সময় প্রিয় বস্তুকে হারাতে হয় বই কি! এহেন অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে লেখক গল্পের শেষে ব্যথিত চিত্তে নিজ দেশের সেই কাঙ্খিত ছেলেদের কাছে বুক বাঁধতে চান—'মানুষের প্রতি ভালোবাসা অমনি করে কবে আমাদের দেশে দেখা যাবে। কাতারে কাতারে মানুষ মরছে দেখেও আমরা নির্জীব জড় হয়ে বসে থাকি। এদের মৃত্যুর কারণ বা উপলক্ষ্যগুলিকে পৃথিবী থেকে ঘুচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এতটুকু করি না আমরা কেউ। কথাটা একটু ভেবে দেখো।'

রামনাথের ছোটগল্পগুলি যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি চিত্তাকর্ষক। দেশ বিদেশের বহু অজানা তথ্যের ডালিতে ভরপুর। এগুলির মধ্যে প্রকৃতির খোঁজ-খবর সামান্যই। মূলত মানুষের কথা। প্রকৃতপক্ষে রামনাথ ছিলেন মানব-প্রেমিক। পৃথিবীজোড়া মানুষের অলি-গলিতে ঢুকবার বাসনাতেই তিনি ঘরছাড়া। লেখা গল্পের মধ্যেও মেলে সেই ভুবনহাটের বৈচিত্র্যময় মানুষের রং-বেরং ছবি। তবে, সে লেখাগুলি পরিণত সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গিজাত কলম থেকে বের হয়ে আসে নি। চাঁচাছোলা অথচ দিলখোলা ভঙ্গিতে যেন কোনও সমাজসংস্কারক, নীতিপরায়ণ, শিক্ষকমশাই একের পর এক অধীত অভিজ্ঞতার গল্পগুলি সাজিয়ে গেছেন, শিশু মনের বিকাশ বাসনায়।

তাদের মানসিক বিকাশে সহায়তার ক্ষেত্রে পর্যটকদের দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধেও ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ। সেই একই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন, এইভাবে—'বইটি দিলাম ভারতের ভাবী পর্যটকদের হাতে'।

রামনাথের প্রথম জীবন যদি শিশু ও কৈশোর হয় তাহলে মেনে নিতে অসুবিধে নেই, দ্বিতীয় হচ্ছে—ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া। সেক্ষেত্রে তৃতীয় হবে অবশ্যই 'সাহিত্য' জীবন।

কলকাতার এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের মালিক অধঃস্তনদের চাপা আদেশের গম্ভীর স্বরে বলছেন—'ছোটলোক ছেলেটাকে পাবলিসিটি বেশী দেবেন না।' একথা নিজের কানে শুনে, বহু পরিচিত বন্ধুদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন রামনাথ, স্থায়ী ঘা-এর যন্ত্রণা বয়ে। তখনকার উন্নাসিক সাহিত্যিক মহলেও একটা কথা চালু ছিল যে—"রামনাথ ভূপর্যটক ঠিকই, কিন্তু তাঁহার পক্ষে লেখনী ধারণ করা বাতুলতা মাত্র।"

রামনাথ নিজেও বারবার বহু জায়গায় বলে বেড়িয়েছেন—তিনি সাহিত্যিক নন,

লেখাপড়া শেখেননি, বিদ্যের দৌড় অতি সামান্য। জুতসই কলম চালনার চেয়ে পায়ের গতিটার চর্চাই বেশি করেছেন। খ্যাতনামা ভ্রমণ-সাহিত্যিক প্রবোধ কুমার সান্যাল একবার রসিকতা করে বলেছিলেন—'তুমি তো পা দিয়ে লেখ হে'। তাহলে, 'ছোটলোক'-টার লেখা এবং পড়ার জগতে করা যাক সাধ্যমতো উঁকিঝুঁকি।

প্রথমেই ঢুকি তাঁর বিখ্যাত 'আজকের আমেরিকা' (যা তাঁর সবচাইতে জনপ্রিয়) বইটির চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায়। সোজা ভাষায় বলছেন—"আমি সত্যের সন্ধানে দেশ ঘুরেছি। ভাষা বা সাহিত্যের টেকনিক নিয়ে রঙমশাল তৈরী করবার অবকাশ পাইনি—ইচ্ছাও তেমন ছিল না। তাই আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি যথেষ্টই থাকবার কথা। তবে এটুকু সান্ত্বনা আমার যে, সত্যকথা কোনদিন বলতে আমি ভীত হই নি। আমার দেশবাসী অন্ততঃ একজনেরও যদি 'আজকের আমেরিকা' পড়ে দৃষ্টি প্রসারিত হয়, তাহলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হবে।

আজ মনে পড়ে, তাদের কথা, দুনিয়ার সকল জাতি সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁরা—যাঁদের সাহায্যে আমার আমেরিকা ভ্রমণ সম্ভব হয়েছে। হয়ত তাঁদের ভেতর কেউ কেউ মহাকালের কঠোর বিধানে পরপারের যাত্রী হয়েছেন। তাঁদেরই প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আমার বুকের দরদ নিংড়ানো 'আজকের আমেরিকা' বিশ্বমানবের করকমলে অর্পণ করলাম"।

লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, নিজেকে যেমন অকাট্য আত্মসমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন, আবার টপকে গিয়ে লেখক সম্ভাবনাকেও প্রতিষ্ঠা করেছেন, নিজের অজ্ঞাতসারে। কেননা, কলমের টানে এমন করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারাটাই তো সে সম্ভাবনার দুয়ার খোলা।

তবে একথা ঠিক, লেখার শুরুতে যা ছিল, তা আদৌ সাহিত্য গুণসম্পন্ন ছিল না। কখনও লেখার অভ্যেস নেই। অথচ সসাগরা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে অভিজ্ঞতার অমৃতকুম্ভ উপচে পড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই জলোচ্ছ্বাসের মতো সবকিছুই যেন কালির আঁচড়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে চায়। রচনাশৈলীগত পারিপাট্যের অভাবে সব যেন কেমন অস্পষ্ট ধোঁয়াটে হয়ে যাচ্ছে। বেপরোয়া আঞ্চলিক শব্দের ঝনঝনা, আড়ষ্ট ভাষা, গুরুচণ্ডালী দোষ, ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস ইত্যাদির লাগাম ছাড়া প্রয়োগে সে যেন একেবারে ল্যাজেগোবরে অবস্থা—

'জ্ঞান' কে 'গ্যান' লিখছেন। 'অভিজ্ঞতা'কে 'অভিগ্যাতা', 'দৃপ্ত'কে 'দীপ্ত' লিখে ছেড়ে দিলেন। এইরকমই অসংখ্য :—

হুমকি তুমকি > হামকি তুমকি; দেবে যায় > ডেবে যায়; পিপল্‌স > পিপুলস; জারনালিষ্ট > জ্যারনেলিষ্ট; সুড়ঙ্গ > সুড়ুং, ব্রীজ > বৃজ; আহাম্মুখ > আহাম্মোক্; কনিষ্ঠ বা কঁড়ে আঙ্গুল > কাণি আঙ্গুল; মামলেট > মার্মলেড; টোকা > টুকা; হোঁচট > হুঁছোট; প্রতিজ্ঞা > প্রতিগ্‌গা; সফর > শফর; রোদ > রোঁদ; ট্যাকসি > টেক্‌সি; গাফিলতি > গাফিলিতি; জাহাজ ভেড়াতে > জাহাজ ভিরাতে; অপরাহ্ন > পরাহ্ন; আবোল তাবোল > আবুল তাবুল; ভাঙ্গা > ভাংগা; লিখতে > লেখতে; তর্ককরা >

তক্‌রার করা; দেয়ালে > দ্যালে; কর্তৃক> কর্তিক; কফি> কাফি; ব্যাগ > বেগ; ছুতার মিস্ত্রী > সুতার মিস্ত্রী; কখনও বা উগরে দিলেন—'আমি suited booted হয়ে গেলাম'।

ভাষা প্রয়োগের মায়াবী কলা কৌশল রপ্ত না থাকায় হোঁচট খেতে খেতে পাঠককে যেতে হোত। মসৃণতা হারিয়ে বর্ণনা তখন হয়ে পড়ে আড়ষ্ট ও গতিহীন—"পরদিন সকালবেলা চারজনে যাত্রা করলাম। পর্বত-গাত্রের সঙ্গে শুরু হল লড়াই। এমন পথহীন পথে জীবনে এই প্রথম শফর। মাঝে মাঝে জিরুতে হয়। বিলমোক্তা চার ঘন্টায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পেলাম পেরিতক। একটা ডাক বাংলো। চীনা রক্ষক 'চিং-চিং-চুং' করে জানালো জাঁদরেল অফিসার ছাড়া কেউ এখানে ঠাঁই পায় না। অর্থাৎ ভদ্রভাবে জানালো শ্বেত ভিন্ন প্রবেশ নিষেধ, যদিও শ্বেত কথাটা উচ্চারণ করে নাই। লজিং হাউস সাদরে কোলে তুলে নিল। সকল তাপজ্বালা দূর হল। উদ্দাম সবুজ আর কঠিন পাষাণ। আর এ দুয়ের যেখানে নির্ব্বাধ নিঃসীম গাঢ় আলিঙ্গন সেখানেই শুধু বাস করে শকাই জাতি, প্রকৃতির স্নেহ-পুষ্ট দুলাল। ওরা সমতল ভূমিতে বাস, হীনতার চিহ্ন মনে করে। কাজেই যে পথ আমরা ধরলাম তা কুসুমাস্তীর্ণ নয়, আর যে খাদ্য আমরা পেলাম তা বনভোজনের মহিমা বর্জিত। লজিং হাউসে খাবার মিলে না, খাবারের দোকান এমন বেমক্কা স্থানে থাকে না। তার ওপর লজিং হাউসটি যেখানে নির্ম্মিত, সে স্থানটা মনে হলো এককালে ছিল শকাই-পল্লী, কোন কারণে তারা ডেরা-ডাণ্ডা গুটিয়েছে সেখান থেকে। সেই অর্দ্ধপরিষ্কৃত পাহাড়টি এখন বন-মুরগী আর পলাণ্ডুর আবাস"।

শব্দ ঝংকার আয়ত্বে এলেও জুড়ে দিতেন গুরু চণ্ডালীর আড্ডা। – "তাই পিং-এর ইউরোপীয় আমেজ পরাধীনতার কশাঘাতকে আচ্ছা করেই জানিয়ে দেয়। মনে খুলে কথা বলতেই প্রাণ চায় না। তবু দুটো দিন বিশ্রাম করে আবার নৈশ যাত্রা শুরু করলাম। শহর ছেড়ে এসে আবার নিশীথ রজনীর ঝিল্লীরবে, ঘনকৃষ্ণ তমসায় প্রাণ ঢেলে দিলাম। সহসা একটা খেঁকশিয়াল পথ কেটে গেল বিদ্যুৎবেগে। সাইকেলের রবারের অঙ্গের ঘূর্ণন, পথের বুকে একটানা সুর তুলেছে শপ্ শপ্। মাঝে মাঝে দূর গ্রাম হতে ভেসে আসে মোরগের কুক্‌র-কোঁ ডাক"।

—"অন্ধকারকে আর করি না ভয়, তার নিঃসীম কালো অবয়ব হতে যেন কেবলই ঝরে পড়ছে—তরল গলিত দরদ। আরো কিছুদূর এগোবার পর থেকে থেকে শেয়ালের ডাক, রয়ে রয়ে মলয় তান্ত্রিকের উচ্চারিত আহুতি মন্ত্র —"ওঁ ... সোয়াহা' (স্বাহা)। মাঝের মন্ত্র অবোধ্য, আরম্ভে 'ওঁ' এবং সমাপ্তি 'স্বাহা'। যেন প্রাচীন ভারতের তপোবনের হোমকুণ্ড"।

—"ভাবতে ভাবতে সাইকেলের ওপরেই ঝিমিয়ে পড়ি, হাত শুদ্ধ হাতল নড়ে যায়। আকর্ণ বিস্তৃত মুখব্যাদান করে হাই তুলি। ঘুম দেখছি বেশ পেয়ে বসেছে। এখন যদি জিরুতে বসি তবে এ বন্‌রাজ্যে নিদ্রার আবেশ নিরাপদ হবে না। রাত শেষ হয়ে এসেছে বোধ হয়। কতকগুলো মর্কট গাছে গাছে লম্ফ-ঝম্ফ করে খোঁ-ও-খোঁ-ও

কবছে"।

—"এখানকার শতকরা নব্বই জনই চীনা। চীনা মজুর, চীনা ঠিকাদার, চীনা মিস্ত্রী, চীনা ফেরিওয়ালা, চীনা দোকানদার, মায় চীনা রিকসাওয়ালা। এরা বেশীর ভাগই জুতোর বদলে পরে খড়ম। অভাবগ্রস্ত বলেই। তাই চারিদিকে কেবল খটাশ্ খটাশ্ পাদুকা-বাদ্য"।

লক্ষ্যণীয়—শেষ উদ্ধৃতিতে একই শব্দের একঘেঁয়ে প্রয়োগ, সাধু ও চলিতের গুরুচণ্ডালী এবং শব্দ ঝংকার সবকিছু মিলেমিশে একাকার করে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

আবাব মহৎ প্রাণ মানুষটি সাধারণের শোকে দুঃখে, অভাবে-অনটনে, আপদে-বিপদে, ও ভুলপথে চলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সমব্যথী এবং অতিরিক্ত মাত্রায় সংবেদনশীল ছিলেন বলে লেখার মধ্যেও দেখা যায় ভাবাবেগের প্রতিফলন। সে সময় তিনি কিছুতেই ধবে রাখতে পারতেন না সাহিত্যের রশি। মনে হোত, লাগামছাড়া সাহিত্য রথ এই বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

চিন ভ্রমণে সেবাব যাত্রা 'চাংসা' অভিমুখে। কদিন ধরে নৌকাযাত্রী হয়ে এই পথের এক মধ্যবর্তী শহর 'পিংসেক' চলেছেন। অদ্ভুত ব্যাপাব! দৈত্যসদৃশ মাঝিগুলি বামনাথ সমেত যাত্রীদেব সর্বস্ব কেড়ে নেয়। আবার কিছু পরেই সকলে একসাথে গলা মিলিয়ে হৈ-হুল্লোড এবং হাসি-ঠাট্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যাত্রী-মাঝির এই অভ্যস্ত কলা-কৌশলে যখন বিশ্বাসবাবুব চোখ ট্যারা, তখনও জানতে পাবেন নি, আরও কিছু বাকী আছে। হঠাৎ নজরে পড়ে, নদীর বুকে একখানা নৌকো আধ ডোবা অবস্থায় উপুড় হয়ে রয়েছে। আরোহীদের পাত্তা নেই। অথচ, ডোবা নৌকা হতে চিনা ছাতা, পুরাতন কাপড় জামা, কাঠের বারকোষ আরো কত কি ভেসে আসছে। পর্যটকের নৌকার মাঝি লম্বা লগি দিয়ে টেনে ধবে ফেললে একটা কচি মিষ্টি লাউ। তা দেখে বুক ফাটা ক্ষোভে ব্যাকুল কণ্ঠে রামনাথ জিজ্ঞেস করলেন—ডুবন্ত মানুষগুলা?

মাঝিদেব কাছে সে কথা পাড়তে জবাব এল—'নৌকোয় ভূত, কাউকে আর জীবন্ত পাওয়া যাবে না।' ভূত এসে মানুষগুলিকে টুঁটি টিপে মেরেছে। অথচ রসাল মিঠে লাউ ছোঁয় নি, এই অবাস্তব কাহিনীতে প্রথমে লেখক অস্বস্তিতে পড়েছেন। পরক্ষণেই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উগ্‌রে দিলেন শুদ্ধ ভাষার কালি—"হায়! কবে এসব কুসংস্কারের অন্ধ চোখে আলোকের স্নিগ্ধ অঞ্জন লেপনে বিমল মুক্ত দৃষ্টির উদয় হবে!"

দক্ষিণ আফ্রিকায় সকলের বারণ সত্ত্বেও 'লরেনসোমার্ক' শহরে গেট পার হয়ে ঢুকেছেন, কোটিপতি বিধবার অট্টালিকায়। উদ্দেশ্য, কিছু ভিক্ষা ও সুখ-দুঃখের কথা শোনা। ভূপর্যটক 'বাঙলা দেশের বাঙালি' পরিচয় দেওয়া মাত্র আঁৎকে ওঠেন, নারীর হুকুমদারী কণ্ঠে—"বেরোও বলছি, নইলে কুকুর লেলিয়ে দেব...শূয়ারের দল... বাঙালি... নিষ্ঠুর, বর্বর, বেরোও..."।

খোঁজ নিয়ে দেখেন, হায়রে জীবন! উনিও আদতে খাঁটি বাঙালি, বরিশাল জেলার। যখন ১২/১৩ বছরের কিশোরী, ভাব হয় গ্রামেরই এক মুসলমান যুবকের

সঙ্গে। সেদিনটা ছিল রমজান মাসের শেষে ঈদ মুবারকের পবিত্র তিথি। সমাজের ভয়ে, চোখ সারানোর অজুহাতে, শিয়ালদা ষ্টেশনে নাবালিকাকে নিয়ে গিয়ে ফেলে পালায় জ্যাঠা। পরামর্শদাতা স্বয়ং বাবা। এক শিখ যুবক সেই অসহায় অবস্থা থেকে শুধু উদ্ধারই করে না, সসম্মানে বিয়ে করে তোলে নিজ গৃহে। এরপর আফ্রিকায় এসে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে থাকে ব্যবসা। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাড়া করে ফেরে। কয়েক বছর পরে নিদারুণ বসন্ত রোগে স্বামী দুই পুত্র ও কন্যা সকলেই মারা যায়। আবার নিঃসঙ্গ জীবন। তখন যান নিজ দেশে। গ্রামের হিন্দু সমাজে না উঠে সাময়িক আস্তানা গাড়েন অন্যত্র। সেই মুসলমান যুবকের সংসার যাতে সুখে শান্তিতে কাটে, সেজন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করে আবার 'লরেনসোমার্ক' এ ফিরে এসে মন দেন স্বামীর ব্যবসায়। একাই।

ইনিই সেই স্বজাতিবিদ্বেষী রণংদেহী বিধবা। অতএব আর একটুও আহত বা ব্যথিত না হয়ে লেখকের অশ্রুসিক্ত কলম ঝলসে উঠল। এক্ষেত্রে মানুষটার মন বা কালির আঁচড় কোনটাই আর সংযমের তোয়াক্কা রাখে না। যেন বাঁধ ভাঙা কুলহারা বন্যা ছুটে চলল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে—"মনে হল ছুটে যাই দুখিনী বঙ্গললনার অশ্রুসিক্ত আশ্রমে। কিন্তু..যুগ-যুগান্তরের আদর-সোহাগ মাখা সোনার বাংলার দুলালীর 'বুক-ভরা-মধু-বুক' থেকে সকল দরদ সকল ক্ষমতা নিঃশেষে নিংড়ে নিয়ে যে অধম মহাপাপী বাঙালি বালিকার কোমলপ্রাণ করেছে শুষ্ক মরু, আর বাঙলাকে অস্বীকার করেছে মহিমাময়ী কন্যার মাতৃত্বের অমৃতধারা—শুধু তাই নয়, করেছে তাকে নীল সিন্ধু-জল-বিধৌত বঙ্গজননীর চরণতল হতে নিত্য কালের জন্য নির্বাসিত—করেছে তাকে করুণাময়ী মাতার মলয়-অনিল-বিকম্পিত স্নেহচঞ্চল হতে চিরবঞ্চিত, সেই অভিশপ্ত হয়ে আবার কোন মুখে তাকে আমি দেব দেখা-- কোন সম্বল আমি অঞ্জলি ভরে অর্ঘ্য দেব তার লক্ষ্যলেশহীন নিরালা জীবনের রিক্ততার মহাতৃষায়"।

অন্তঃসলিলা হৃদয়টি তাঁর বড়ই কোমল। মানুষই তাঁর কাছে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই মানুষের ট্র্যাজেডি যখন কোমলপ্রাণ মানুষটির সুক্ষ্ম হৃদয়তারে আঘাত করে, তখনই বেজে ওঠে আবেগমথিত করুণ রসের মূর্ছনা। তা সে কি ব্যক্তি জীবনের অন্দর মহলে, কি সাহিত্যে। তা বলে বাইরে নয়। সে জীবন খুবই কড়া ধাতের। কঠোর নীতিবাগীশ। এক্ষেত্রে আপস-রফা তাঁর জীবনে দেখতে পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। নিজস্ব নীতিতে অবিচল, অটল। যা একবার বুঝে নেবেন, 'এটাই ঠিক', সেখান থেকে তাঁকে নড়ানো বা সরানো প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে, কমনীয়তার একান্ত অভাব। ফলে, তাঁর বিশেষ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি কখনও কখনও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাধাময় হয়ে ওঠে। অকপট প্রখর ভঙ্গিতে বলে ওঠেন,—"আমি অপরের কথিত সুসমাচার আমার বই-এ লিপিবদ্ধ করব না। আমি নিজে যা দেখছি এবং আমার নিজের জীবনের উপর দিয়ে যা ঘটে গেছে, তারই কথা শুধু বলব। অনেকে হয়ত বলবেন, এ যে আত্মজীবনী হয়ে যাচ্ছে, আমরা আমেরিকা বা অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানতে

চাই। উত্তরে বলছি, ভ্রমণ কাহিনীতে নিজের ভ্রমণ কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আমার দৃষ্টিতে যা আসছে, তাই পাঠক সমাজকে ভাষার সাহায্যে বলতে চেষ্টা করছি। এর বেশী বলতে গেলেই অনধিকার চর্চা হবে। অনধিকার চর্চায় কুফল যেমন হয় তেমন অন্য কিছুতে হয় না।'' বুঝুন ঠ্যালা!

'নায়গ্রা' জলপ্রপাতের জন্মরহস্যের চাবিকাঠি ধরিয়ে নয়, দূর থেকে তা দেখিয়ে পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণায় ছাই দিয়ে বলছেন—''এর চেয়ে বিশদভাবে বলতে গেলে, ভ্রমণকাহিনী ভূগোলে পরিণত হয়। ভ্রমণ কাহিনীতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের স্থান নেই, শুধু ইঙ্গিত থাকে।''

আবার, কড়া ধাতের বা নীতির পথিক ছিলেন বলে কখনও ফেনিয়ে বলা পছন্দ করতেন না। চলার পথে অসংখ্য ধরণের আপদ-বিপদ পার হয়ে কখনও তা নিয়ে 'অ্যাডভেঞ্চার' বা 'নাটক' করা পছন্দ করতেন না। তা না করুন। কিন্তু কলমের সামান্য খোঁচায় পাঠককে তাঁর কাহিনীর মধ্যে আকৃষ্ট করে 'চনমনে' রাখতে তো পারতেন? না, সেখানেও লেখার সীমারেখা সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাত্রায় সজাগ।—''আমেরিকায় 'ওয়াই.এম.সি.' কে 'ওয়াই' বলা হয়। 'ওয়াই' দু'রকমের। একটা হল শ্বেতকায়দের জন্য, অন্যটা হল কালোদের জন্য। 'ওয়াই' এক জাতীয় হোটেল বিশেষ। ব্যবসা হিসেবে 'ওয়াই'এর ব্যবসা বেশ লাভজনক। 'ওয়াই' সম্বন্ধে এর বেশী যদি কিছু বলতে হয়, তবে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবার সম্ভাবনা বেশী। অতএব এ সম্বন্ধে নীরব থাকাই ভাল।''

পাঠকের তাবৎ উৎকণ্ঠায় জল ঢেলে ঢুকে পড়লেন একেবারে অন্য প্রসঙ্গে।

১৯৩৪/৩৫ খৃষ্টাব্দে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লিখে ফেলেন কাগজের পাতায়। সে সময় আর সকল পত্র-পত্রিকা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে হতাশ করলেও 'প্রবর্তক'এর রাধারমণ চৌধুরী নিজ পত্রিকায় কাহিনীগুলি ঠাঁই করে দিয়ে তাঁকে অশেষ উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। ১৯৩৬ থেকে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় চীন, আফগানিস্থান, আফ্রিকা, কোরিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলির ওপর তাঁর লেখা ভ্রমণ কাহিনী বের হতে থাকে। মাসিক বসুমতীতে ক্রমশঃ প্রকাশ পায়, 'হলিয়ুডের আত্মকথা' উপন্যাসটি। ভ্রমণের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠা করেন 'সারা ভারত পর্যটক সমিতি।' এরই মুখপত্রের নাম 'ট্র্যাভেলার' বা 'পর্যটক'। সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে মাসিক পত্রিকাটিতে নিজেকে সাধ্যমত উজাড় করে দিতেন। তাঁর অনেকগুলি বই নিজ ঠিকানার (১৫৬, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৬) পর্যটক প্রকাশনা ভবন থেকে বের হয়। যা ছিল নিজস্ব প্রকাশনা। অন্যান্য সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক পত্র-পত্রিকাতেও কম লেখা বের হয় নি। তবে 'দেশ' সাপ্তাহিকে ছিল রেকর্ড সংখ্যক। ৬০ সংখ্যারও বেশি। ঐ সময়ের লেখাগুলি বিভিন্ন পত্রিকা বিভাগে যাঁদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হোত একমাত্র তাঁরাই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন, সেই বিশৃঙ্খল লেখাকে সম্পাদনার মাধ্যমে বিষয়মুখী করা কি কঠিন কাজ। এমন ঘটনাও ঘটেছে, শুধু জট ছাড়িয়ে 'কারেকশান' করতে করতেই চোখের অবস্থা বারোটা বাজার দাখিল প্রায়।

রামনাথ তাঁর সমস্ত রকম ত্রুটির ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। একে চির উদ্যমী, তায় মাঝে মধ্যেই কুরে কুরে কামড় বসাত, সংবাদপত্র মালিকের উপহার দেওয়া 'ছোটলোক ছেলেটাকে পাবলিসিটি বেশী দেবেন না' বলা সেই দগ্‌দগে ঘা। ১৯৪০-এ বিশ্বযুদ্ধের চরম ডামাডোলের মধ্যে কলকাতায় থিতু হয়েই মন দিলেন লেখার উন্নতি সাধনে। তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টার ক্রমবিকাশ অনুসরণ করলে ধরা পড়ে ক্লাসিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) অনুশীলন করেছেন চাকরী জীবনেই। এগুলির সাথে রমেশচন্দ্র, শেকস্‌পীয়র ও ইউরোপীয় উপন্যাস পড়াশুনা চালু ছিল। ডি.এল. রায়ের নাটকগুলি তাঁর কণ্ঠে ঘোরাফেরা করত সব সময়। অর্থাৎ নাটক ভালবাসতেন গভীরভাবে। বাংলা দৈনিক তো খুঁটিয়ে পড়তেনই, ভ্রমণের সময় সেই সমস্ত দেশের ইংরেজি পত্রিকাগুলিও তাই করতেন।

'আজকের আমেরিকা', 'মলয়েশিয়া ভ্রমণ', 'সর্ব স্বাধীন শ্যাম' প্রভৃতি বইতে জানতে পারি, ভূতত্ত্বে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। 'মাইনিং-ইন্ডাষ্ট্রির' ব্যাপারে আগ্রহ-অনুসন্ধিৎসা দেখা গেছে আজীবন। স্বজেলাবাসী বিখ্যাত গুরু সদয় দত্তর সাথে দেখা করতে গিয়ে, সেবার দার্জিলিং-এ বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এমন কি কখনও যদি তাঁকে চলমান জীবন থেকে বসে পড়তে হয়, তাহলে বাকি জীবনটা এই লাইনে কাটিয়ে দেবেন, এমন বাসনাও প্রকাশ করেছেন।

'মলয়েশিয়া ভ্রমণ'-এ মালয় ও তার সন্নিহিত দ্বীপগুলি সম্বন্ধে যেভাবে গভীর ইতিহাস চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন,তা একজন ঐতিহাসিককেও ভাবিয়ে তুলতে পারে। 'বিশ্ব ইতিহাস'—তাও অর্জন করে নিয়েছেন শুধু সাইকেলের প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে, নিজ গুণে।

লেখা বইগুলি পড়লেই জানা যায়—বেদ-বাইবেল-কোরাণ-মহাভারত-রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণে দখল ছিল যথেষ্ট। যদিও ধর্মের ধার আদৌ ধারতেন না। লেখার সংস্কার ও শুদ্ধি ব্যাপারে সাহায্য-পরামর্শ নিতেন—শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আভিধানিক ভোলানাথ ঘোষ, বিমল ঘোষ (মৌমাছি), সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও যোগেশ বাগল প্রমুখের কাছ হতে। এছাড়া, জাতীয় ঐতিহ্যে আস্থা ছিল তাঁর রক্তের অনু-পরমাণুতে। ফলে সাহিত্যক্ষেত্রেও সে ঐতিহ্যের স্বীকৃতি ছিল অবশ্যম্ভাবী।

সম্প্রতি আনন্দবাজার' প্রমুখ পত্র-পত্রিকা শব্দের সরলীকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উনি সেই যুগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন একাজে। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের গাঁট ছাড়ানো শুধু ভাবতেন না, একের পর এক প্রয়োগ করতে লাগলেন, পরবর্তী লেখাগুলিতে। এবিষয়ে নিয়মিত আলোচনায় বসতেন শ্রদ্ধেয় ভাষা পণ্ডিত সুনীতিবাবুর সঙ্গে। বলতেন—"যাচ্ঞা" কে যাচনা লিখলে ক্ষতি কি? শব্দের ক্ষেত্রে আধুনিকতার পক্ষপাতী ছিলেন বলেই 'সঞ্চার'কে লিখতেন 'সন্‌চার'।

প্রয়োজনমত বিদেশী শব্দ সংগ্রহ করে বাংলা ভাষাকে পুষ্ট করা কেবল সমর্থনেই ক্ষান্ত থাকতেন না, ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন নিজ সাহিত্যে। ছোটদের—

বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের কথা ভেবে ভাষাকে করলেন আরও সহজ, আরও বোধ্য। বড়ো ব্যাপার-স্যাপারকে ছোট করে এবং ছোটো কাহিনীকে বড়ো পরিসরে সাজাতে রপ্ত হলেন। আসলে, ধাপে ধাপে সিঁড়ি করা ব্যাবিলন-এর শূন্য উদ্যান রামনাথের দৃষ্টিশক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিল—'মনের সঙ্কীর্ণতা ব্যাবিলন এক ঝাপটে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আরব সাগরে ফেলে দিয়েছিল।' সহায়ক এই সমস্ত গুণগুলি সাথী করে শুরু হলো তাঁর জয়যাত্রা। একের পর এক বের হতে থাকল ভ্রমণ পুস্তক, গল্প ও উপন্যাস। সে কি দু'চারটে? না না করে 'ছুঁই-ছুঁই' পঞ্চাশ হবে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও স্মারক গ্রন্থে কত যে রচনা বাড়িয়ে দিয়েছেন সহজাত উদারতায়, তার কোনও লেখা জোখা নেই। এই সমস্ত বই ও লেখাগুলি বড়দের ছাড়াও বিশেষ করে আদৃত হয়েছিল যুব সমাজে। সে সময় তাঁর লেখাগুলি শুধু চোখ বোলাবার জন্য পড়ে যায় কাড়াকাড়ি। যুব সমাজে উৎসাহ-অনুপ্রেরণার ঢেউ ওঠে। বেশ কয়েকটি বই এমনই সমাদৃত হয় যে, সংস্করণের পর সংস্করণ উড়ে যায়।

চুম্বক আকারে পেশ করা যাক, ছড়িয়ে থাকা কয়েকটি সাহিত্যে মুক্ত খণ্ড। মালয় দেশের 'সেরামবান' শহরে থাকেন ডাক্তার অযোধ্যাবাবু। পেশা ডাক্তারী হলে কি হবে, আসলে তিনি কবি। জাগতিক কাজে মন নেই--'তিনি যেন মাটির ধরার মানুষ নন, কাব্যজগতের পরাগরেণুতে গড়া অভিনব মূর্তি।'

মালয়েশিয়া ভ্রমণে চলেছেন 'কোয়ালাকাব্বু'র পাহাড়ী পথে। দেখেছেন প্রলয় প্রকৃতির রূপ—'চারিদিকে চেয়ে দেখি, কিন্তু ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রলয়-নর্ত্তনের ডম্বরু ডঙ্কায় ধরিত্রীর বুক খান খান।'

মোহময় পরিবেশের সঙ্গে রূঢ় বাস্তবের বৈপরীত্য ঘটাচ্ছেন—'মলয়ের অভেদ্য কণক-কানন ছাতা ধরেছে। স্নিগ্ধ পরিবেশ, পেটের ভাবনা নাই। ফূর্তিতে মেতেই চলেছি। সাইকেলের ঘূর্ণণের তালে তালে গানের সুর—ঘুমন্ত পুরীর স্বপ্নাবেশ। হঠাৎ ঝরঝর করে সাইকেলের বল-বেয়ারিং থেকে বলগুলো পড়লো ছড়িয়ে।'

মালাক্কা-র 'আলোর গাজা' শহরের মাঝে ভবঘুরের কাছ হতে মেলে রসবোধের স্ফূরণ—'রাস্তায় দেখলাম এক তামিল ভদ্রলোক ভৃত্যসহ। সবে তাঁর বাড়িতে যাব ভাবছি, একসাথে। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে এমন কতকগুলো অভিধানবর্জিত 'মধুরবচন' নির্গত হয়ে ভৃত্যকে হতভম্ব করলো যে আর তাঁর ত্রি-সীমায় দাঁড়ানো গেল না। কোনো ভদ্রলোকের মুখে এমন মধুর বুলি খুব কমই শুনেছি।'

রস-সমৃদ্ধ সফল ভাষা প্রয়োগেও কম যান না। আফ্রিকার অনাবিল প্রকৃতির মাঝে রামনাথ বুঝি বা ছাড়েন হাঁফ। কিন্তু কাকেই বা শোনান রামানন্দের গান। অতএব, মনের ফূর্তিতে প্রেমালাপ শুরু করেন নিজ বাহনের সাথে—'দেখ বাপু সাইকেল, আমার সঙ্গে নিমকহারামী করো না। অনেক তেল মাখানো অনেক দলাই-মলাই তোমায় করেছি বাছা। রাস্তা মালুম হচ্ছে তো? ঢালু, উঁচু, অযত্নে কাঁকরগুলো দাঁত বের করে ভ্যাংচাচ্ছে তোমায়। মোটরগুলোর কাছে অর্বিশ্যি সে বেয়াদবি চলে না। হাঁপিয়ে পড় না যাদু। তাহলে আমিও এলিয়ে পড়বো।

তোমায় তোয়াজ করতে গেলে, বুঝলে বাইক মশাই, বনদেবীর আদরের দুলাল ফুলের লতা-বিতান-রঞ্জিত মঞ্জুল কুঞ্জ-পুঞ্জ কিছুই লক্ষ্য করে চোখ জুড়ানো হয় না। আরে বাহবা, দেখেছ লতাটার রংবাহার, ফুল পাতার চটক!

—উঃ! এ করছো কি দরদী বাহনটি আমার। কাকরের আলগা ঢিবিতে ধাক্কা খেও না—বিষম ঝাঁকানি লাগে যে। পা দুটো টনটন করে। সুখে-দুখে তুমি আমার মরমী, তুমি বেফাঁস চলো না।'

বিপরিস্থিতির পরিবেশ রচনাতেও ছিলেন পটু। মাঝরাত, পরিষ্কার আকাশ। পাজী স্টেশন মাষ্টারকে রীতিমত জব্দ-শায়েস্তা করে সাইকেল ঠেলে ঢুকছেন প্রিটোরিয়া শহরে। কল্পনাতীত দুর্গন্ধ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু ভাষা প্রয়োগ সীমা ছাড়ায়নি—'মনে হল আবর্জনা-জঞ্জাল ফেলার ডোবায় (ডাম্পিংবগ-এ) পড়ে গেছি। প্রকৃতির প্রতিশোধ হয়তো। মাথার ওপরে অগণিত তারকার মোতির মালা—চোখে তাদের মধু-হাসি, আর মাটির ধারায় পূতি-গন্ধ-পিশাচ-মুখে তার নরকের নিঃশ্বাস। অসহ্য!'

কম যান না, দৃশ্যাবলীর বর্ণনায়। রাত তখন তিনটে। দাঁড়িয়ে আছেন জাহাজের ডেকে। ভারত মহাসাগর ও অতলান্তিকেব বিপরীতমুখী সংঘর্ষে জলস্তম্ভ হয়েছে আকাশচুম্বী। তার পিছনে হাজার মাইল দূর ব্যবধানের মেরুপ্রদেশে আলোর রঙবাহারি মায়াবী খেলায় মোহিত হয়ে, লিখছেন--'বিস্ময় চকিত হয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করতে হয়। কণ্ঠ হারিয়ে ফেলে ভাষা; চক্ষু, কর্ণ অনুভূতির তীব্রতায় নিথর নিস্তব্ধ। কী যেন এক মাদকতা শিরায় শিরায় স্পন্দিত করে তোলে পুলক-মোহাবেশ। গাম্ভীর্যের গভীরতায় সে সুন্দর ভূবন আকাশ-বাতাসহীন।'

কেপটাউন বন্দরে জাহাজ ভিড়বার আগে—'প্রকৃতই সাগরের বুক থেকে কেপটাউন শহরের বহির্দৃশ্য অমরার নন্দন-কানন। অতি মনোমদ সে সৌন্দর্য, অনির্ব্বচনীয়, তুলনারহিত। নিছক পাহাড়ের অত্যুন্নত আড়ম্বর-পরিসীমা দেখেছি ঢের। সীমাহীন সাগরের সদা চঞ্চল সমাবেশ দেখেছি অশেষ। কিন্তু, দুয়ের মিলনে এমন অপরূপ অপার্থিব শ্রী আর দুনিয়ায় কোথাও দেখি নাই। সে স্নিগ্ধ পরশে নয়ন-মন নেচে ওঠে।'

দেখা গেছে, প্রচণ্ড পবিশ্রমের মধ্যেও রসিক মেজাজটি ভোঁতা হয়ে পড়েনি। সময় এবং সুযোগ এলেই তা মেলে ধবে। পিকিং শহর দেখতে বেরিয়ে একদিন যখন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত ও অবসন্নপ্রায়, তখন এক ভদ্রলোক নানা অন্যায় সম্বন্ধে পাখী পড়ালেন, "সকল বালাইয়ের মূলে আছে টাকা। এই টাকা যদি ব্যক্তিবিশেষের হাতে থাকে, তবেই এসব পাপের সৃষ্টি হবে।" আরো বোঝালেন—"এই অর্থকে সর্বসাধারণের সমান ভোগ্য করতে হবে। দেখবে, শান্তি আপনা হতে এসেছে। যত বাজে সম্প্রদায় তা লোপ পেয়েছে, অধর্ম চিরতরে বিদায় নিয়েছে।"

মন দিয়ে শুনলেন, লিখলেন এবং তার সঙ্গে নিজ ঘরানার ব্যঙ্গাত্মক রসবোধে জুড়ে দিলেন—'ভদ্রলোকের কথাটা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় তো লিখে দিলাম। কিন্তু,

এখনও বুঝে উঠতে পারি নাই, তা হয় কিসে এবং কি করে'।

ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়েছেন। বুলগেরিয়াতে তখন সবে 'ন্যাশনাল সোসিয়ালিজম' এর পত্তন হয়েছে। কড়া নিয়ম কানুন চালু হয়—'এখানকার অর্থ এদেশেই খরচ করে যেতে হবে'। সেটাই ওনার কলমে বের হলো—'সীমান্তের কাষ্টম অফিসার বুঝতে পেরেছিল, আমি ভিক্ষা করেই ভ্রমণের খরচ যোগাচ্ছি। ভিক্ষার ধন যাতে চর্বন করেই শেষ করি—কিছুই যেন সঞ্চয় করে অন্য দেশে নিয়ে না যাই, সে সুব্যবস্থার জন্য আমার সঙ্গে যে ধনরত্ন (সামান্য টাকা) ছিল তার লিষ্ট করা হয়েছিল।'

অভিযাত্রীর শ্রেষ্ঠ সম্বল ধৈর্য, পিকিং-এর পথে বারবার বেতালা হয়ে তাও বুঝি খোয়াতে বসেন। কয়েকটি লোককে হোটেলের খবর জিজ্ঞাসা করায় তারা একটি গোপন নির্জন আড্ডায় তুলল। গভীর রাতে ভাল করে খাইয়ে বিল দিল ইংরেজি ফ্যাশনে। লিখে দিল তাতে সাত ডলার নব্বই পয়সা। হিসাবটা দিতে মনিব্যাগ খোলা মাত্র—'সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নিল আমার হাত হতে। তারপর যে সব ভাল দু'একখানি কাপড়-জামা ছিল তাও কেড়ে নিয়ে বের করে দিল আমায় উন্মুক্ত প্রান্তরে, যেখানে উপরে আছে নক্ষত্রখচিত আকাশ, আর নীচে শুধু পথের ধূলি। চলে গেল টাকার দেমাক, জ্ঞান চক্ষু খুলে গেল স্বচ্ছ দৃষ্টি ফুটিয়ে। এখন আমি পথের ভিখারী।'

তারপর ক্ষিধে শুধু ক্ষিধের জ্বালায় পাগল প্রায় অবস্থা। পকেট উল্টে মানুষজনকে দেখাচ্ছেন, 'কিছুই নেই, কিছু খেতে দাও। আমি পর্যটক।' এমন করে ক'দিন অভুক্ত থাকার পর এক জায়গায় কিছু মানুষ মিলে-জুলে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। তারা যাওয়ার সময় কটি মাত্র পয়সা দান কবতে উনি ভাবছেন, নিঃস্বার্থ এ দান তাঁর বিশাল যাত্রাপথে সিন্ধুতে বিন্দু হলেও দরকারের সময় এটুকুরও আছে মহামূল্য। বিশেষ করে পয়সার অভাবে অভুক্ত থাকার সময়। যোগ করলেন সরল মন্তব্য—'কাঞ্চন কলুষে এ দান মলিন নয়, বরং ভাব-কৌলিন্যে উজ্জ্বল'।

স্বপ্নদৃশ্য। লক্ষ্যণীয়, নিজের বিবাহ বাসরের কাল্পনিক পরিবেশ চয়নে ভাষা ও 'স্টাইলে'র কি নিপুণ প্রয়োগ। এখানে একযোগে উপহাব দিচ্ছেন—স্বকীয় ব্যঙ্গাত্মক রসিকতাবোধ, গ্রাম্য 'হ্যাছেদ্যা'র কর্তৃত্বময় জীবন্ত সংলাপ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, অকপট স্বীকারোক্তি, গ্রামবাংলার বাসর ঘরের চকিত ইঙ্গিত, অবচেতন রোমান্স-মনের সুপ্ত আকাঙ্খা এবং সে বাসনাকে রূঢ় প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে নাটকীয় স্বপ্নভঙ্গের অনুপম চিত্র।

সিঙ্গাপুরের 'পাঞ্জাম তাগাড়' পল্লীর বাসায় রাত্রে আশ্রয় নিয়েছে, পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো অশনি নামে এক 'টেররিষ্ট'। শুতে যাওয়ার সময় তাকে —'একটা কথা না বলে পারছি নে ভাই। নাম তো অশনি, কিন্তু শনি যে দেখছি তোমার আষ্টে-পিষ্টে। তাকে অস্বীকার করবার জন্যেই তো এ নাম তোমার, ও-ঠাকুরটির সঙ্গে পেরে উঠবে না। আজকের মত বিদায়....।

বিয়ে হয়ে গেল। পড়শীর এক মেয়ের সঙ্গে। সেই যে মানি, যাকে এই টুকুন দেখে

গিয়েছিলাম, ফ্রক গায়ে নাক দিয়ে সিগ্‌নি গড়াত। কাজেই কোন ঝামেলা হয় নাই।

বাসর ঘরে মেয়েরা গিস্‌গিস্‌ করছে। কত মশ্‌করা, কত ছড়া, বাংলার নিজস্ব। আমার কাছে চিব-নতুন। কনে বসে আছে এক কোণে বেনারসী শাড়ী দিয়ে মুখ ঢেকে। আমি সহসা বাচাল হয়ে পড়লাম—

—এই যে মানি রাণী, কাছে এস না।

চারিদিকে খিল খিল হাসি, টিট্‌কারী!

—জীবন সঙ্গিনী মানি!

তার বেশী বলতে হলো না, সে কী মূর্ত্তি!

—নির্লজ্জ বেহায়া, পরদেশে ভাড়াটে নারী নিয়ে বদ্‌খেয়ালী, লজ্জা করে না কথা বলতে, মুখ দেখাতে!

—লজ্জা! কেন? সে সব তো আমার মানে আমার আত্মায় স্পর্শ কবে না, এ দেহটাই নকল 'আমি' বই তো নয়। আসল 'আমি' ও সবের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

—লম্পট কোথাকার, নিজের মুখে স্বীকার কবে আবার কথার প্যাঁচে অপবাধ মোচনের চেষ্টা। তাহলে, আমারও আজকের বিয়ে আমার প্রাণে দেহে কোন স্পর্শ দেয়নি। এ বিয়ে আমি স্বীকার করি নে। লম্পট্‌কে জীবনসঙ্গী করবো না কখনো।

বলে কি মানি! সেদিনকার পুঁচকে ছুঁড়ি! আমার নেশার আমেজ ভরপুব —মুখে ফুটে ওঠে নাটকীয় ছন্দ—'নারী-সভা মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহে মানি রাণী, লম্পটে বরিব না কভু! ছি, ছি, ছি!.......

(ছুটে যাই মানির হাত ধরতে!)

ঝলাৎ করে ছুরি ঝলমলিয়ে উঠলো মানির হাতে, আঁচলে ঢেকে এনেছিল হয়তো, আবার ক্রুদ্ধস্বর মানির বাবার, মানির দাদার--হাতে তাদের লাঠি বাগানো! বেগতিক। চোখ বুজে এল ভয়ে। হুঁচোট খেয়ে পড়ে গেলাম।...

.....এ কি! এতো লাঠির ঘা নয়, ছোরার খোঁচাও নয়, কে যেন ঝাঁকানি দিচ্ছে। চোখ মেলে চাইতে হলো— সদ্য আশ্রয় দেওয়া তরুণ অশনি!'

মুক্তমনা মানুষটির স্বাভাবিকভাবেই চিন্তাভাবনার ক্ষমতা ছিল সুগভীব। তার উপরে দু'চাকায় দ্বিগ্বীজয় করে এবং বিশ্বজোড়া মানুষেব সঙ্গে মিশতে আগ্রহী থাকার ফলশ্রুতিতে হলেন বহুদর্শী। ফলে, সৃষ্ট বিশাল সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে মুক্তা-সদৃশ কিছু বিস্ময়কর মূল্যবান উক্তি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উপহার রেখে গেছেন; যা আজও অক্ষয়, অম্লান ও চিরন্তন—(১) 'শুধু "প্রগতিশীল প্রগতিশীল" করে চেঁচালেই হয় না। যে অহংবোধ ও অন্ধ রাজভক্তি বর্জন করে সকল মানুষকেই আত্মজভাবে, সমান জ্ঞান করতে পারে, সেই প্রগতিশীল'। (২) 'সতীত্ব শব্দের যেমন সৃষ্টি হল, তেমনি ব্যভিচারের পথও খুলে গেল'। (৩) 'রাজ্য পরিচালনা যখন ক্রমাগত একই শ্রেণীর লোকের হাতে থাকে, তখন জনসমাজের আর্থিক এবং নৈতিক অবনতি ঘটে'। (৪) 'বিপ্লব হল আগুন। সেই আগুনে মানুষের মনের বিভীষিকা পুড়ে

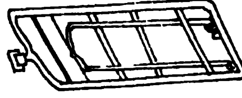
ছাই হয়'। (৫) 'যে দেশের অ-বিপ্লবাত্মক কাজ বিপ্লবী নামে পরিণত হয়, সেই দেশের তথাকথিত বিপ্লব—ক্ষণস্থায়ী এবং মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়'। (৬) 'জাতীয়তাবাদের পেছনে একটা লেজুড় থাকে, সেই লেজুড়টি হল পুঁজিবাদী—যার অপর নাম ধনতন্ত্রবাদ। যতক্ষণ জাতীয়তাবাদের লেজুড় ধনতন্ত্রবাদ না থাকে, ততক্ষণ জাতীয়তাবাদ খুবই ভাল, খুবই প্রশংসনীয়, খুবই আদরণীয়; কিন্তু যেই নেশনেলিজমের পেছনে লেজুড় লাগে তখনই জাতীয়তাবাদ দেশের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়'। (৭) 'হ্যাট কোট পরলে এবং মদ খেলেই যদি ইউরোপীয়ান মেজাজ হোত, তবে গাধাও সিংহ হয়ে যেত।' (৮) 'যাদের আত্মসম্মানবোধ নাই, তারা মোটেই বুঝতে পারে না অনুনয়-বিনয় মানসিক অধোগতির একটা প্রত্যক্ষ ফল'। (৯) 'পৃথিবীতে তিন রকমের ভিখিরী দেখতে পাওয়া যায়, নামের ভিখিরী, ক্ষমতা লাভের ভিখিরী এবং অর্থের ভিখিরী'। (১০) 'কৃষ্টির সৃষ্টি সহজে হয় না। অনেক খড়কুটো পুড়াতে হয়।' (১১) 'ভারতের বাইরে ইন্ডিয়ান কেবল অর্থ উপার্জনের মেশিন, অন্য কোন কর্ত্তব্য তাদের দৃষ্টির অতীত। তাদের চোখ ফুটিয়ে জাতীয়তা শিক্ষাদান সকল ভারতীয়েরই কর্ত্তব্য।' (১২) 'মানুষের মন দুর্বলতায় ভর্তি! একটু সমবেদনা পেলেই দুর্বল আপন হৃদয়ের দরজা খুলে দেয়। যেখানে তার যত ক্ষত তা দেখিয়ে দেয়। জিজ্ঞাসা করে প্রতিকারের কথা'। (১৩) 'সাধুদের আমরা প্রতিপালন করি পাপ হতে মুক্ত হব বলে। অনেক বিদ্বান লোক সাধু সেবা করে ধন্য হন। কিন্তু এই অশিক্ষিত বিদ্বানের দল জানে না, এরাও আমেরিকার 'হবো'দের মত জেলে বাস করারই উপযুক্ত'। (১৪) 'মানুষের যখন অর্থলিপ্সা বেড়ে যায়, তখন তার হিতাহিত জ্ঞানও লোপ পায়।' (১৫) 'কিছু শিখতে গেলে চোরের মত পালিয়ে ফিরে হয় না। সেটা চাইলে, আগে শিখতে হবে এগিয়ে চলা'। (১৬) 'আত্মবিস্মৃত হয় তারাই যারা মেরুদণ্ডহীন এবং জাতীয় গৌরব সম্বন্ধে সচেতন নয়'। (১৭) 'বনের আইন কানুন প্রায় মানুষের মতোই। যার যত শক্তি সেই তার চেয়ে হীনবলকে হত্যা করে খেয়ে ফেলে'। (১৮) 'রাজভক্তি হল পদদলিত জাতির পৈতৃক সম্পত্তি।' (১৯) 'ব্যবসায়ীরাই হল রাজনীতির চাই'। (২০) 'নদীর তীর যেমন করে একদিক ভাঙে এবং অন্যদিকে গড়ে সাম্রাজ্যবাদীদেরও ভাঙা এবং গড়াই হল গতানুগতিক'। (২১) 'যারা টাকার ওপর বসে থাকে তারা ভয় উৎপাদনকারী গল্প বলতে বড়ই ভালবাসে। (২২) 'প্রাচুর্যের মধ্যে আনন্দের বিকাশ হয়। খালিপেটে অথবা অর্থাভাবের মধ্যে আনন্দের পেছনে দুঃখ লুকিয়ে থাকে'। (২৩) 'যাঁরা স্বদেশবাসীকে মুর্খ এবং অপদার্থ ভেবে দূরে রাখতে চান, তাঁরাই সমাজের এক নম্বর শত্রু'। (২৪) 'কৌতূহল না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ হয় না'। (২৫) 'প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশেই চোর, জোচ্চোর, বাটপাড়, পকেটমার আছে এবং যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে ততদিন তাদেরও অস্তিত্ব বজায় থাকবে।' (২৬) 'আপন স্বার্থ ছাড়া শুধু পর হিতে কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ওঠে বসে না। যদি সাহায্য করে তবে তার বিনিময়ে সাহায্য

গ্রহিতাদের অধীন করে রাখবে, কোন না কোন উপায়ে। ইতিহাস তার সাক্ষী'। (২৭) 'দেশের প্রগতি ও বিপ্লবের কণ্টকিত পথে ছাত্র সমাজই হয়ে থাকে অগ্রণী'। (২৮) 'যারা মাইনরিটি মেজরিটি নিয়ে চিৎকার করে তারা একদম অবুঝ। তারা জানে না পৃথিবীতে সর্বদাই মাইনরিটি মেজরিটির উপর কতৃত্ব করে আসছে এবং যে পর্যন্ত মানুষের মাঝে প্রকৃত শিক্ষার প্রসার না হয় সে পর্যন্ত মাইনরিটি মেজরিটির উপর কর্তৃত্ব করবেই'। (২৯) 'যেখানে বাজে কথার আড়ম্বর নাই, সেখানেই লোক কাজ করতে সক্ষম হয়।' (৩০) 'রাজনীতিতে স্বার্থের গতিপ্রকৃতি বড়ই নিদারুণ। ব্যক্তিগত স্বার্থের পরই দলগত স্বার্থ। এটা আরও মারাত্মক। দল বজায় রাখতে গিয়ে 'পুকুর চুরি' পর্যন্ত হজম করা হয় এবং পুকুর চোরের মান রক্ষার্থে তাকে কিছু না বলা বড়ই মারাত্মক'। (৩১) 'যারা নিজের দোষ বোঝে না, তাদের কাছে ভালোমন্দ বলা চলে না।' (৩২) 'মানুষ বুজরুকী ভালবাসে, যতক্ষণ প্রাচুর্য থাকে।' (৩৩) 'ভদ্রলোক অর্থাৎ কেরাণী শ্রেণীর মানুষেরা পাছে লোকের উপকার হয়, এই আশঙ্কায় সর্বদা শঙ্কিত'। (৩৪) 'যথার্থ শিক্ষায় ও জ্ঞানে মানুষকে সত্যই ভদ্র, উদার ও মহৎ করে। অশিক্ষায় ও কুসংস্কারে মানুষকে একেবারে পশুর মত অবনত করে দেয়। বিদ্যাহীন, জ্ঞানহীন, অমার্জিত লোকের সংসর্গ তাই নরকের মতন যন্ত্রণাপূর্ণ ও অশান্তিময়। জ্ঞানী, বিদ্বান ও মহৎপ্রকৃতি ব্যক্তির সংসর্গই স্বর্গ।' (৩৫) 'মনের মধ্যে ফাঁকিবাজী ও দুষ্টুমী থাকলে মানুষ সময় থাকতেও কাজের অর্ধেক করে পরের দিনের জন্য বাকি কাজ ফেলে রাখে'। (৩৬) 'দেবতা হয়ে কেহই জন্মগ্রহণ করে না। দেবত্ব অর্জন করতে হয়।' (৩৭) 'এক শ্রেণীর লোক আছে তারা সাহায্য করে কিন্তু বলে না কেন সাহায্য করল। সেই শ্রেণীর লোক প্রকৃতই বকধার্মিক। প্রকৃতপক্ষে যাকে সাহায্য করা হল তাকে যদি বুঝিয়ে বলা না হয়, কেন সাহায্য করা হয়েছে, তবে সুফলের পরিবর্তে কুফলই হয় বেশী।' (৩৮) 'কামনাই মানুষের জীবনের উৎস এবং কামনার শেষই মানুষের জীবনের শেষ। কামনা সকলেরই আছে, কিন্তু মানুষের কামনা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে মনের ওপর। মন হল শরীরের 'By Production'। (৩৯) 'পুঁজিপতিরা কারো মিত্র নয়, তারা স্বদেশে এবং বিদেশে সর্বত্র সমানভাবে মানুষের সর্বনাশ করে'। (৪০) 'যারা মরণ ভয়ে ভীত, অর্থে অতিলোভী, সংসারে অসামাজিক কাজ করে অর্থের মালিক হয়েছে, তারাই বুজরুকি পছন্দ করে এবং প্রশ্রয় দেয়'। (৪১) 'আন্তর্জাতিক আসরে ডিপ্লোমেটিক সারভিস ছাড়া উপায় নেই। এসপিয়নেজ (গোয়েন্দাগিরি ও গোপন সন্ধান) যে জাতের যত সেবা, সে জাতই ততটা উন্নতি করে, ততটা শক্তির আধার হয়'। (৪২) ''লাল চীন''-এর শুরুতেই বললেন—'আজ যাকে সাদা দেখেছি, কাল যদি সেটা লাল হয়ে যায় তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। ইভলিউসন্ এবং রিভলিউসিন্-এ দুটোর সঙ্গে কি কেউ বাদ সাধতে পারে? কেউ বাধা দিতে পারে না। কিন্তু এই পৃথিবীতে কতকগুলি লোক দেখা যায় যারা নূতন বলতে যা বুঝায় সেটাকে মোটেই পছন্দ করে না। ইভলিউসন্ এবং রিভলিউসনের তোয়াক্কা

রাখে না। তাদের পরাজয় হয় অতি সত্বর। নূতন কিন্তু এই প্রকারের লোকের বাধা মানে না। পুরাতনের দরজায় বার বার ধাক্কা দিতে থাকে। পুরাতন নূতনের মুখ না দেখবার জন্য ভিতর হতে দরজা বন্ধ করে রাখে। অবশেষে নূতন যখন বারবার দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে, তখন পুরাতন ধৈর্য রাখতে পারে না। নূতনকে যথাশক্তি আক্রমণ করে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয় পুরাতন। ঐতিহাসিক নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্বকে নানামতে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন।'

মুগ্ধ করে দেওয়া এইরকম আরও অসংখ্য প্রবাদতুল্য নিজস্ব মুক্তার মালা গেঁথেছেন সৃষ্ট সাহিত্যে, যা যুগ যুগ ধরে অমর হয়ে থাকবে।

একথা আক্ষরিকভাবে সত্যি, আপন নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও সাধনার জোরে রামনাথ লেখা ও ভাষার উন্নতি করছিলেন একটু একটু করে। শেষের দিকের রচনাগুলি জট ও দুর্বোধ্যতা মুক্ত হয়ে অনেক বেশি সহজ-সরল-প্রাঞ্জল হতে থাকে। কিন্তু, একটাই অভাব। তা হলো, কল্পনাশক্তির কারিগরী বা রচনার কলাকৌশল ও গঠনশৈলীর দিক। সব মিলিয়ে ৩টি উপন্যাস, ২টি গল্প সংকলন ও ৩০টার বেশি ভ্রমণকাহিনী পড়ে আমার মনে হয়েছে, বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা এবং ওনার ছিটকে ওঠা বাড়তি ধারণাগুলি উপড়ে ফেলে দিয়ে, সম্পর্কযুক্ত কিছু কল্পনামূলক অংশ জুড়ে, সমগ্র রচনাকে টানটান করে বাঁধতে পারলেই হয়ে উঠত সোনায় সোহাগা। কারণ, তথ্যসূত্রে এবং বিষয়ের সম্পদে বইগুলি ছিল অমূল্য। কিন্তু রামনাথের ক্ষেত্রে মুশকিল হচ্ছে, যা নিজে বোঝেন নি বা দেখেন নি, তা বানিয়ে কালির আঁচড়ে এক বর্ণও বেরুবে না। এখানেও সেই 'গোঁয়ার রামা'। অথচ, যা একজন লেখকের বড়ো কাম্য ও সারা জীবনের সাধ্য সাধনা, সেই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল সীমাহীন। বাড়তি সংযোজন—নিজস্ব প্রজ্ঞার রশ্মি। পেটুক ঠাকুরের উদরটি ভর্তি থাকলে চিন্তাশক্তি বা স্বচ্ছ দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ পর্যায়ের। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। অভিজ্ঞতার মাটি ও দূরদৃষ্টির বীজে কলা-শৈলীগত জলবায়ুর মেলবন্ধন ঘটাতে সক্ষম হলে আপনিই মেলে ধরবে হৃদয় জুড়ানো সাহিত্যের গাছ। তাব অভাবে, রামনাথ উন্নতমানের জাতে ওঠা সাহিত্য রচনা করতে পারেননি, ঠিক কথা। কিন্তু যা করেছেন তা একেবারে 'ব্রাত্য' বা ফেলনা মোটেই নয়—পাতে দেওয়া যেতে পারে অনায়াসে। না হলে, সংস্করণের পর সংস্করণ উড়ে গিয়ে, দেড় যুগের চেয়েও বেশি তরুণ সমাজকে টগ্‌বগে উৎসাহে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারত না। সম্ভব হত না, এত ব্যাপকভাবে তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করা। তার চাইতে বড়ো কথা, মনে রাখতে হবে সমস্ত কল্পনার অতীত প্রচণ্ডরকমের অমানুষিক কষ্ট স্বীকারের পরও নিজ প্রচেষ্টায় তুলে নিয়েছেন সরস্বতীর কলম। যা সাহিত্যধর্মেব বিরোধী। এ কী ধরনের সব্যসাচী! পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—সরস্বতীর বাঁ হাতি আশীর্বাদ পেয়েছেন। কিন্তু, কিছুতেই ডান হাতের ছোঁয়া গ্রহণ করবেন না। বাঁ হাতে ধরা বীণাটিতে ডান হাতের শিল্পী সুলভ আঙুলের ছোঁয়া পেলে তবেই না শিল্পের মূর্ছনা।



আড্ডাধারী

অধিকার হারানো, পায়ে ঠেলা বঞ্চিত মানুষগুলোর জন্যে প্রাণ কাঁদতো বলেই ভদ্রলোক জীবনের শুরু থেকে কমিউনিজমে গভীর আস্থা পোষণ করতেন। তথাকথিত নয়, সত্যিকারের কমিউনিজম এসে পৃথিবী থেকে অন্যায়-অসাম্য দূর হোক, এ সৎ বাসনা তাঁর মনে সদা জাগরুক ছিল। অন্তর থেকে কামনা করতেন, সমস্ত মানুষই বিবাদ ও স্বার্থপরতার ঠুলি সরিয়ে শান্তিতে থাকুক। সুখে ভরে উঠুক তাদের ঘব-দোর। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সর্বহারাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় শুধুমাত্র দূর থেকে নয়; তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই চালিয়ে গেছেন, সারাজীবন। সেইসময় পৃথিবীর প্রায় তাবৎ কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে ছিল তাঁর যোগাযোগ। তবে লক্ষ্য করার ব্যাপার, নিজে কখনও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হননি, কৈশোর পরবর্তী জীবনে। আসলে, এখানেও সেই স্বাধীনচেতা স্বভাব। সভ্যপদের বাধ্য-বাধকতা তাঁর কাছে মনে হত, কলুর বলদের শামিল। নির্দিষ্ট একটি দণ্ডকে কেন্দ্র করে কেবল একঘেয়ে নিয়মমাফিক ঘুরে চলা। বিপুলা এ প্রকৃতির উদার-অতিথির কাছে সে আরও দুঃসহনীয়। তাঁর চাইতে অ-সভ্য থেকে মাটির স্পর্শে কাজ করে যাওয়ার স্বভাব-স্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশি পছন্দ করতেন। তবে সদস্য নন বলে কমিউনিস্টদের কোনও রকম ভুলত্রুটি এবং অন্যায়-নীতিহীনতা সমর্থন বা হজম করার পাত্র ছিলেন না মোটেই। যা আজকের রাজনীতির দুষ্ট-অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেরকম কিছু দেখলে, শুনলে বা জানতে পারলে রামনাথ কঠোর ভর্ৎসনায় স্তব্ধ করে ছাড়তেন। সে জোর তাঁর ছিল। সে সম্মান-অধিকার তিনি অর্জন করে নিয়েছিলেন, নিজেকে কাজের মধ্যে উজাড় করে। ফাঁপা বুলির কচকচিতে নয়।

মনের মিল ছিল বলে, প্রায়ই চলে যেতেন, ভারতে সাম্যবাদী ভাবধারার প্রচারক ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পথিকৃৎদের অন্যতম প্রবাদ পুরুষ মুজফ্ফর আহ্মদ-এর কাছে। যিনি আবার 'কাকাবাবু' নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ। মাঝে-মধ্যে কাকাবাবুর আবাহনে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সেরে ওখানেই জমে উঠতো দুনিয়ার আলোচনা। উনিও আসতেন ভূপর্যটকের ঘরে। একান্তে গল্প আলোচনা হতো, কত কি! রাজনীতি থেকে শুরু করে পৃথিবীর তাবৎ আটঘাটের। কিছু একটা মনের মিলে দুজনে দুজনকে টানতো চুম্বকের মতো।

এতো গেল দুজনের একান্ত আসরের কথা। এছাড়া, সম্মিলিত জমপেস্ আড্ডা ছিল অনেকগুলি। তখন আর তিনি বিশেষ নন, সকলের রামনাথ। 'আড্ডা' তাঁর বড়োই প্রাণের। আসর জমানোর একটা দিল খোলা মেজাজ শিশুকাল থেকেই গড়ে

উঠেছিল। ভ্রমণেও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। কারণ, তিনি সার বুঝে নিয়েছিলেন-- জ্ঞান-অমৃত দেওযা-নেওয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে তরতাজা করার এমন মাধ্যম আর হয় না।

কাকাবাবু, নিজস্ব বাসাবাড়ি এবং একটি চা-দোকান ছাড়া তাঁর বৈঠকি আসরগুলি ছিল মূলত বইপাড়াকে কেন্দ্র করে। তাব মধ্যে একটি ছিল 'বর্মণ পাবলিশিং'-এ ব্রজবিহারী বর্মনেব সঙ্গে। যেখানে আসতেন স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ব্রজবিহারী সাহিত্যপ্রেমী হয়েও নিজে ছিলেন আদর্শ বিপ্লবীমনা। নানা বিপ্লবী তাঁব আশ্রয়-সাহচর্যে ধন্য হতেন। ফলে ঝড-ঝাপ্টা হয় বর্মনবাবুর নিত্যসঙ্গী। সাহিত্য ও বিপ্লবী মনের তারে বাধা পড়েছিলেন রামনাথও। সুতরাং তাঁদের দু'জনকে ঘিরে এ মজলিস ঝলমল করে উঠত, উভয় পথের উজ্জ্বল মনীষীদেব নিয়ে। ক্রমে তাঁদের এই আসরে যোগ দেন মন্মথ সরকার, ত্রৈলোক্য বিশ্বাস, মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, হেম কানুনগো, আবদুল হালিম, মন্মথ বিশ্বাস, রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জী, বিনয় চৌধুরী প্রমুখ। সাধারণতঃ এই সান্ধ্যবাসরটি জমে উঠতো শনি ও রবিবার।

মূখ্যত সাহিত্যমুখী আসর বসত বেঙ্গল পাবলিশাস-এ, মনোজ বসু ও শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে। যে মজলিসে যোগ দিতেন সারা ভারতের গর্ব ভাষাপণ্ডিত সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত গজেন্দ্রকুমার মিত্র, এবং আরও কযজন জ্ঞানী-গুণী অনেক ঔৎসুক্য নিয়ে এসে বসতেন পর্যটকের পাশে। মনোজবাবু ও শচীনবাবু প্রতিষ্ঠিত সেকালের এই সেরা প্রকাশনা সংস্থার আড্ডায় ক্রমশঃ আলো করে গেছেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, নাবায়ণ গাঙ্গুলি এবং আরও অনেকে।

এরপবই জমাতেন হৃষীকেশ বারিকের 'ভাবতী বুক স্টল'-এ। পরে নাম হয় 'অশোক পুস্তকালয়'। অমায়িক এই ভদ্রলোকের সঙ্গ ছিল রামনাথের খুবই প্রিয। হয়তো বা নিজেও দারুণ অমায়িক ছিলেন বলেই এমন মনের মিল। এছাড়া নিয়মিত যাতায়াত ছিল 'ডি.এম লাইব্রেরী', 'ভট্টাচার্য সনস্ লিমিটেড্', 'মিত্রালয়', 'অভ্যুদয় প্রকাশনী', 'নিউ বুক স্টল' এবং 'ইন্ডিয়ানা লিমিটেড'-এ। এই সমস্ত পুস্তক বিপণিতে এসে তিনি যেমন হাঁফ ছেড়ে খোলা-মেলা হতেন, পুস্তক বিক্রেতারাও তেমনি অর্গলমুক্ত হতেন তাঁর কাছে। জিজ্ঞাসু মন নিয়ে জেনে নিতেন পৃথিবীর হাঁড়ির খবর। আর উনি তো পরমানন্দে বিলিয়ে যেতে বরাবরই পঞ্চমুখ।

তৎকালীন কলকাতার একটি মূল্যবান সাহিত্যবাসর ছিল বইপাড়ার গায়ে বেনিয়াটোলা লেনে চৌধুরীবাড়ির বৈঠকখানায়। যে আসরে ঝলমল করতেন কবিশেখর কালিদাস রায়, অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী, 'শনিবারের চিঠি' খ্যাত সজনীকান্ত দাস প্রমুখ গুণিজন। একসময় কথা সাহিত্যিক শরৎ চাটুয্যেও জমিয়ে গেছেন। রামনাথ বিশ্বাস এখানে সশরীরে বর্তমান থাকতেন। মোটেই কবিকুলে টোকো কুল হয়ে নয়, অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হয়েই জাঁকিয়ে বসতেন, সসম্মানে।

আবার এও সত্যি, সেই সময়কার 'এলিট' সম্প্রদায়ভুক্ত নাক উঁচু সাহিত্যিকগণ তাঁকে এড়িয়ে চলতে পছন্দ করতেন, অতি সযত্নে। কারণ, মেকি পালিশহীন, মারপ্যাচের বাক্‌চাতুর্যে অক্ষম, পায়ের ওপর পা তুলে সোফায় গা এলিয়ে দার্শনিকের ভাঁড়ামোতে অপটু, এমন দুনিয়া চষা সরল-সিধে চাষার গায়ে গা লাগিয়ে জাত খোয়াতে হবে না কি? অথচ কি আশ্চর্য! 'রবি' প্রভার কিরণ স্নেহে বঞ্চিত হননি তথাকথিতদের আক কষা 'বুনো গেঁইয়াটি'। হয়ত বা রবি প্রতিভা বলেই, সরাসরি রশ্মিপাতে মানুষ রতনকে চিনতে ভুল হয়নি।

বইপাড়ার 'ব্যাপার স্যাপার' চুকিয়ে সন্ধে পার করে এবার যে যাওয়া চাই দিনের শেষ ঈপ্সিত আড্ডাটিতে। তখনকার মির্জাপুর স্ট্রিট এখন নাম নিয়েছে সূর্য সেন স্ট্রিট। এ রাস্তায় 'কর্পোরেশন বিল্ডিং'-এর প্রায় বিপরীতে ঁনূতন চন্দ্র বড়ুয়া প্রতিষ্ঠিত 'ফেভারিট কেবিন' আজও সুখ্যাতির সঙ্গে চালাচ্ছে তাঁর ছেলেরা। নূতন বাবুর সময়ও চলত রমরম করে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'ফেভারিট কেবিন' নামটিকে গল্পকথার মাধ্যমে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থায়ী আসনে বসিয়েছেন। কাজী নজরুল, ভোলা চ্যাটার্জী, স্বনামখ্যাত সুরেশচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সাহিত্যিক সমাজের পরম দরদী অথচ গভীর স্নেহপরায়ণ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অনেক লেখকই এখানের শ্বেতপাথরের টেবিল ঘিরে জমিয়ে গেছেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসত বিপ্লবী সদস্যরা। ফলে, মাঝে মাঝেই চায়ের পেয়ালা ঝনঝনিয়ে আছড়ে ফেলে, ইংরেজ পুলিশ শিকারী বেড়ালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে এক একজনকে তুলে নিয়ে যেত।

এখন এখানে ঢুকলেই কেমন একটা যেন আগেকার দিনের পরিবেশে পৌঁছাতে হয়। চেয়ার-পায়ার ডগাগুলি ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে ক্রমশ ছাঁটতে ছাঁটতে মেঝেতে বসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। শ্বেতপাথরের নীচে টেবিল গুলিরও সেই অবস্থা প্রায়। মেঝে থেকে দেওয়াল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের হালও একই রকম। সব মিলিয়ে ধারণা হয়, 'পুরানো কালকে' ধরে রাখার চেষ্টা বা যত্ন আত্তি।

এখানকার গম্ গম্ করা আসরটিতে পৌঁছনোর জন্য ভূপর্যটকের কর্মব্যস্ত মন বলতে গেলে সারাদিনই 'হাঁসফাঁস' করত। খোশগল্পের এমন নির্বাধ আসর একদিনের জন্যও মাটি করা তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল। কেবিনে ঢুকে বাঁদিকের তিন নম্বর চা টেবিলে বিশ্বের তুফান তুলতে তাঁকে ঘিরে জড়ো হতো জ্ঞানপিপাসু সব মৌমাছির দল। তদানীন্তন কালের বিখ্যাত চারুশিল্পী ভোলা চ্যাটার্জীও (ভি.সি. নামে খ্যাত) মৌতাতের সে টেবিল ঘিরে প্রায়শই জমে উঠতেন। সম্পূর্ণ বিপরীত দুই প্রান্তের দুই যশস্বী ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও একই টেবিল ঘিরে দেখা গেছে ভোলা বাবু হয়ত বিশেষ 'মুড'-এ গান ধরেছেন দরাজ গলায় এবং ততোধিক খোশ মেজাজে রামবাবু টেবিলে তাল ঠুকছেন দরাজতম হাতে। নয়তো বা দেখা গেল ভূপর্যটক নিজেই কীর্তন ছাঁচে ঢেলে সাজিয়ে সুর ধরেছেন, সুন্দরীমোহন (অ্যাভিনিউ খ্যাত) দাস-এর সিলেটি রামায়ণ থেকে—

বান্দর গুষ্টি লইয়া রাম যুদ্ধ করলা ভীষণ।
রাবণ মারি সীতা আনলা ঔত রামায়ণ।।

ঢুকেই ডানদিকের প্রথম টেবিলটি ঘিরে বাজি মাত করতে হাজির থাকতেন কাজী নজরুল। তাঁর গান-বাজনা, নৃত্যচপল বাগ্মীতা, দিলখোলা মেজাজ, ভরাটগলা, রূপ ও উচ্ছ্বসিত যৌবন সব মিলিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করার প্রতিভা ছিল স্বভাবজ। ...বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে ঝরঝর ধারায়। নির্জন রাস্তা দিয়ে হয়তো কোনও রূপসী এক হাতে মাথা আর হাতে শাড়ি বাঁচাবার চেষ্টায় সন্তর্পণে পা ফেলে চলেছেন। তা দেখে, কবি গুনগুনিয়ে উঠলেন—'কে বিদেশী মন উদাসী.....'।

লক্ষণীয় পার্থক্য, একজনের আকর্ষণী ক্ষমতা মূলত অর্জন করা— অপরজনের প্রায় প্রকৃতিদত্ত। তবু, দুজনার মধ্যে ছিল ভাব ভালবাসা ও হৃদ্য সম্পর্ক। তন্ত্রে আসক্তি দেখে, প্রথমে নজরুল ইসলাম এবং পরবর্তীকালে ভোলাবাবুকে রামনাথ বারংবার নিষেধ করেছিলেন, ও পথে না যেতে। দুজনেই গিয়েছিলেন। ফল হয়েছিল খুবই শোচনীয়। অনেক কাণ্ডকারখানা করে কলাকার মশাই পাগলপ্রায় জীবন থেকে কোনও রকমে সামলে উঠেছিলেন, কিন্তু ইসলাম ঐ পথের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে পড়েন জটিল রোগের মহা কবলে। একথা অতি সত্য, ভদ্রলোকের ছিল বহুমুখী সৃষ্টিশীল প্রতিভা। বাঙ্ময় থাকলে সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্যে বঙ্গদেশকে আরও নানাভাবে ভরিয়ে ও মাতিয়ে দিতে পারতেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি আর সবাক হলেন না। শুধু যা আখ্যা পেলেন- -'নির্বাক কবি', আমৃত্যু।

এই সমস্ত আসরে সদাচঞ্চল রামনাথ ঢুকলেই প্রাণের সাড়া পড়ে যেত। যেন একটি চলমান 'ম্যাগনেট্'। সে চুম্বক শক্তির সাহায্যে যে কোনও মানুষের মধ্যে 'যৌবনের টগবগানি' আওয়াজ তোলার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন, স্বীয় কর্মের মহিমায়। সে কারণে যেখানেই তিনি পৌঁছতেন, অল্প ক্ষণের মধ্যেই আপন স্বাতন্ত্র্যে হয়ে উঠতেন আর সকলের মধ্যমণি। কলকাতার কথ্যভাষার সাথে সিলেটি 'বাঙাল' ভাষার মিশ্রণে তাঁর অনাড়ম্বর বাগ্মীতা এতই ধারাল ও শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠতো যে তাঁর দিক থেকে চোখ বা মন ফেরানো কারুর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এমনকি আশেপাশের ছেলে-ছোকরারাও এসে জড়ো হতো—এই সব বৈঠকে, নানা দেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে। বাসাবাড়ি থেকে শুরু করে আড্ডা হয়ে স্কুল কলেজ পর্যন্ত তিনি তখন সকলের 'দাদু'। অনেক বয়স্করাও সম্মান দিয়ে 'দাদু' বলে ডাকতেন, তাঁর বিশ্বজোড়া অভিজ্ঞতার কারণে। ছোটরা স্বাভাবিকভাবেই আবদারে-দাবীতে অতিষ্ঠ করতে চাইত। দল বেঁধে গলা চড়িয়ে বলতো—'গল্প বলো দাদু, দেশবিদেশের গল্প বলো'।

প্রথমে ছদ্ম বিরক্ত হওয়ার অভিনয় করে পরে হয়তো দুষ্টুমী করে বললেন—'আইচ্ছা বেশ, ঠিক আছ (আছে)। সেরা গল্পের সন্দেশ পাইবার (পাবে)। কিন্তু একটা 'যদি' আছ। যদি দাদুরে কব্জির লড়াইতে হারাইতে পারস্। আয় দেখি বেটা, দেখা যাউক্, কার কত হিম্মতের জুর (জোর)। শুরু হয়ে গেল দুই অসম কচি-পাকা-র

দ্বন্দ্বযুদ্ধ। বহুক্ষণ যুঝে, গলায় 'হোঁৎকার' তুলে, অনেক উৎকণ্ঠার মুখে ছাই দিয়ে হেরে গেলেন দুম্ করে। আরম্ভ হলো তোলপাড় করা জীবন্ত কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ—

"এক্কেবারে চুপটি কইরা শুন আমার ছুট্ট বন্ধুগণ। হেইকালে (সেকালে) জয়ের নেশায় পাগল হইয়া রুমানরা (রোমানরা) ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে একটা ছুট্ট অঞ্চল জয় কইরা লয়। বিজিত এলাকাটুকুর নাম দিল আফ্রিকা। আরও পরে, ক্রমশঃ তারই সীমারেখা বাইড়তে বাইড়তে রূপ অইল (হইল) আইজকার আফ্রিকা মহাদেশের। তুমরা শুইনলে বড় আশ্চর্য্য হইবা, বজ্জাত সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচার কইরছে— 'আফ্রিকাতে নরখাদক আছে, ইয়েলো ফিভার রইছে, আর রইছে বুনা জানোয়ার। আফ্রিকাতে গেলেই মৃত্যু।' তুমরা তাই পড়িয়া ভাবো, তাইতো, আফ্রিকা নিশ্যই (নিশ্চয়ই) নরক ছাড়া আর কিছুই নয়। জানবা, ঔত হতচ্ছাড়া সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার। মনে রাখিও, এই আফ্রিকাতেই মহাত্মা গান্ধীর কর্মজীবনের শুরু। তবে ইটা বড়ো সত্য কথা, আফ্রিকার তুলনা আফ্রিকাই। রোমাঞ্চকর বিশালতা ও রহস্যময়তার বৈচিত্র্যে আফ্রিকার তূল্য দ্যাশ (দেশ) আর কুথায় পাবা? তা হইলে একদিনের অভিজ্ঞতায় কথা কই শুন।

—আরিঃ বাপ্‌রে বাপ্, সে কী গভীর জঙ্গল। দিনেই ঘন অন্ধকার। তায় চলছি অমাবস্যার রাত্রে। নিঃশব্দে। হাতের টিপ্‌বাতি (টর্চ) জ্বাইলতে গেলে সঙ্গী নিগ্রো তিনজন আংগুলের ইশারায় বন্ধ রাইখতে কয়। অর্থাৎ এইখানকার স্বাদ অনুভবের পর্দায় ধইরা রাইখতে হইলে তমাগো (তোমাদের) ঐ টা শহুরে আলো চলবা না। অগত্যা 'ফট্' কইরা নিভাইয়া দেই। তো কি আর বলবোরে 'দাদু' তুদের। আগাইয়া চলছি পা টিপে টিপে। সেই যে কত্‌তো রকমের অদ্ভুত শব্দ ভাস্যা আসতাছে!

—ফ্যাসর-ফুঁস্, কুট-কুট্-কুড়ুর, মট্-কড়মড়-কড়াৎ, ঘ্যাসর-ঘ্যাস, কিচ-কিচ-কুউচ, কিচির-মিচির, ঢকাৎ-ঢাঁই-ধুপ, ঘটাৎ-ঘড়-ড়-ড়-ঘোঁ:, ঘট-ঘট-ঘটর, হিস্-হিস্-স্-স্, ফোঁস্-ফোঁস্-স্-সলাৎ, আরও যে কত, হেইটা কি আর মনের মধ্যি ধইরা রাখা যায়? অবাধে ঘুইরা বেড়াইতাছে হক্কল জন্তু-জানোয়ার। ঘুট-ঘুট্টি আন্ধারে (অন্ধকারে) উয়াদের চোখ যেমুন জ্বলতাছে, তেমনিই শুনা যায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ডাকা-হাঁকি। আরে বাপুরে, যতই ডাকাবুকো হই না কেন, কলিজার মইধ্যেতো লাগতাছে হাতুড়ির পিটানি। অমন সময়, পিছন থেইক্যা ধাইয়া আইল ভয়ঙ্কর সর্বনাশা 'হোঁয়াক্' শব্দের হুঙ্কার"।

সত্যি কথা বলতে কি, ছেলেপুলেদের আবদার কক্ষনো ঠেলতে পারতেন না। এতই তাদের ভালবাসতেন অন্তর দিয়ে। মনের একেবারে অন্তঃস্তল থেকে পোষণ করতেন, এই সমস্ত কুঁড়িই বিকশিত হয়ে একদিন সবাকার চোখে পরাবে সতেজ দৃষ্টির কাজল। তাঁর সবচাইতে বড় কৃতিত্ব, নিজে সারাটা জীবন শুধু তরুণদের সামনে তুলনাহীন আদর্শ তুলে ধরেছেন এক এক করে। সে আদর্শ— আত্মনির্ভরতার, জাতীয়তাবোধের ও মনুষ্যত্বে উত্তরণের।

শেষের সঙ্গীত

'সাহেব! সাহেব!' খাঁটি ইটালিয়ান স্যুট ও হ্যাট-কোট-টাই পরা মানুষটি চুরুটমুখে যখন বুক চিতিয়ে কলকাতার রাস্তা দিয়ে গট্‌মট্ করে হাঁটেন, তখন আশপাশ থেকে সবাই বলে ওঠে, 'ঐ সাহেব যাচ্ছে।' চলনে-বলনে, আচারে-আচরণে, স্বভাবের বাহ্যিক প্রকাশে পুরোদস্তুর সাহেব। কেবল যাঁরা চেনেন তাঁকে, জানেন—অন্তরের ফল্গুধারায় বইছে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, তাঁরাই মাত্র আঙুল তুলে বলতে পারতেন, 'না, উনি আমাদের। বাঙালির গর্ব, ভারতের গর্ব, রামনাথ বিশ্বাস'।

পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় করে দিগ্বিজয়ী বীর যখন কলকাতায় থিতু হলেন, কেবল কয়েকটি মাস তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তারপর নাম-যশ, সম্মান, অর্থ-প্রতিপত্তি সব কিছুই করায়ত্ত। সিংহের বাচ্চা আপন স্বভাবে খেলে-দেলে ঘুরে-ফিরে বড় হয়ে সিংহবিক্রমই দেখায়। রামনাথ ছিলেন মনুষ্যকুলে সিংহ। সিংহের মতোই রাজকীয় তাঁর বাইরের স্বভাবটি। অন্দরে কিন্তু ঠিক উল্‌টো। সেখানে বয়ে চলেছে অন্তঃসলিলা কোমল হৃদয়ের স্রোতোধারা। 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে', দুর্লভ এই কবি কথাটির সাক্ষাৎ স্বরূপ তিনি। মানুষের জন্য দরদ তাঁর উথলে উঠতো, সদাই। তাঁকে চিনতেন, জানতেন বা সংস্পর্শে এসেছিলেন, এমন কয়েক ডজন ব্যক্তির সাথে কথা বলে বুঝেছি, মানুষের প্রতি ঘৃণা বা নিজস্ব উন্নাসিকতা একেবারেই ছিল না। বরং সব মানুষের প্রতিই ছিলেন অসম্ভব রকমের স্নেহশীল। যা পিতৃ-মাতৃ তুল্য। ধন্য তাঁরা, যাঁরা এহেন মহৎ মানুষটির সান্নিধ্যে আসতে সুযোগ পেয়েছিলেন।

এমনই আশ্চর্য বিপরীতধর্মী স্বভাবের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে উদার-মহতী রামনাথ ব্যক্তিত্ব। ঠিক যেন হিমালয়। আপন মহিমায় আপনি ভাস্বর। একদিকে আকাশ-ছোঁয়া শৃঙ্গ; মাথা উঁচু করে, সু-কঠিন, সু-মহান, দৃপ্ত সে ভঙ্গি। অপরদিকে, তারই মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত প্রাণশক্তির কোমল-মধুর ফল্গুধারা। যা বেঁচে থাকতে শেখায়, উৎসাহ আনন্দের উদ্দীপনা যোগায় এবং ধী-শক্তিকে বিকশিত করে মনুষ্যত্বে উত্তরণ ঘটায়।

তাঁর লেখা বইগুলি তখন বাজারে চলছে 'হট্ কেকের' মতো। যদিও গোড়ার দিকে হন্যে হয়ে ফিরতে হয়েছে প্রকাশকদের দরজায় দরজায়। শেষে কোথাও না ঠাঁই পেয়ে, বই ছাপতে শুরু করলেন নিজস্ব প্রকাশনার দায়িত্বে। তার খরচ-খরচা ও ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার হ্যাপা কম পোয়াতে হয়নি। কিন্তু ক্রমে জনপ্রিয়তা এমন স্তরে পৌঁছে দেয় যে খ্যাত এবং অখ্যাত প্রকাশকেরাও বই ছাপাতে তাঁর দরজায় লাইন ফেলেছেন। দায়িত্ব নিয়েছেন নতুন নতুন সংস্করণ ছাপতে।

অসংখ্য পাড়া, ক্লাব, সংগঠন ও স্কুল-কলেজ থেকে সনির্বন্ধ ডাক আসছে তাঁর সেই উজ্জীবনী বক্তৃতার পক্ষে। এজন্য সর্বক্ষেত্রেই পেতেন হৈ হৈ করা সম্মান। এবং অনেক সময় মিলত কিছু না কিছু পারিশ্রমিক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা নিয়েও মন্দ জুটত না। মোটের ওপর পয়সা-কড়ি একেবারে উপচে পড়ার অবস্থা। পথে-প্রান্তে, ঘরের আনাচে-কানাচে, আকাশে-বাতাসে শুধু তখন 'রামনাথ' আর

'রামনাথ'। সে সময় তাঁর ঘরে ঢুকলে চোখে পড়ত, 'ওয়েল ডেকরেটেড এন্ড ওয়েল ফারনিশ্ড্ রুম'। হালকা মিষ্টি সুগন্ধীর সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে ঘরটি ছাপিয়ে সামনের বারান্দা পর্যন্ত। বিরাট টেবিলটির একপাশে বইপত্র আর একপাশে খাতা ও লেখার সরঞ্জাম সাজানো। মাঝের পিছন দিকে নান্দনিক 'চাইনিজ' প্লেটে থরে থরে সাজানো নিউমার্কেট থেকে আনা সেরা কোয়ালিটির আপেল, ন্যাশপাতি ও আঙুর। 'ঢুকু-ঢুকু বিলিতির' ব্যবস্থাও যে ছিল না, এমন নয়।

এই সময় অবস্থা এমনই পর্যায়ে ওঠে যে, তাঁকে শুধু চোখের দেখা, তাঁর সাথে দুটো মুখের কথা বলার জন্যে বহু লোকে পাগল হয়ে উঠত। না। তিনি কাউকে নিরাশ করতেন না। অহং বা ব্যস্ততার 'কোল্ড সোলডার' কখনও ব্যাকুল মানুষকে দেখান নি। 'বড়' হয়ে অন্য মানুষের সঙ্গে এখানেই তাঁর তফাত। আসলে মানুষটার অননুকরণীয় দ্বৈত-স্বভাব-বৈশিষ্ট্য সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে, আপন সত্তার গভীরে। যা আর কারুর সঙ্গেই তুলনা করা যায় না। একেবারে নিজস্ব। একদিকে সাহেব-সিংহ'র রাজকীয় দাপটের মূর্তি, অন্যদিকে পাতা আছে বাঙলা মাটির শ্যামলিমায় ভরা স্নেহের আঁচল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঠাঁই সেখানে সবাকার। আর এই স্বভাবের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল মানুষটির শেষ সঙ্গীতের চাবিকাঠি।

ভরা জোয়ারের মতো রোজগারের পাশাপাশি ছুটে চলে রসিক বাউন্ডুলের দিল দরিয়া মেজাজ। তাঁর কাছে কোনও কিছু চেয়ে হতাশ হয়েছেন কেউ, এমন ঘটনা শুনেছেন বা দেখেছেন—একজনও সাক্ষ্য দেয়নি। ভদ্রলোকের নিয়ম-নীতি 'ভায়োলেট' না হলে সব সময়েই উদার হস্ত। পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে যেমন হাত পেতে ভিক্ষা নিয়েছেন কেবলমাত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে, তেমনিই অপরের জীবন ধারণের জন্য নিজের সর্বস্ব দিয়ে হয়েছেন রাস্তার ফকির। আজকের নামমাত্র প্রয়োজনটুকু রাখবার পক্ষপাতি ছিলেন, বরাবর। কিন্তু তার জন্য কাল কি ছিল, আগামীকালই বা কি করে চলবে, এ চিন্তায় দানবীরের হৃদয় মুহূর্তও কাঁপেনি। একমাত্র সহায়-সম্বল কবচকুণ্ডল খোয়ানোর দুর্ভাবনায় পৃথিবীর দাতা-কর্ণদের হৃদয়ও হয়ত বা ক্ষণিকের জন্য চমকে উঠতে পারে, কিন্তু আলোচ্য ফকির সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া। কবির ভাষায় বলা যেতে পারে—"পট্টাম্বর ত্যজি রাজা পরিয়া কৌপীন। ফকির করিল বিধি দশা হৈল হীন"। হলেও বা রক্তমাংসের মানুষ। সংকল্পে এমনই স্থির-অবিচল। স্বভাবে এতই বেপরোয়া উদার।

একদিনের ঘটনা। সমাজ উন্নয়নমূলক একটি সংগঠনে ভাষণ দিয়ে ফিরছেন। বক্তৃতার সম্মান-মূল্য দশ টাকা পকেটে গজগজ করছে। সম্ভবতঃ লক্ষ্মী আগমন দুনিয়ার মুসাফিরের হজম হত না। কেমন একটা 'কুট্‌কুট্‌' অনুভব করতেন। তাই কাছে টাকা এলেই ভাবখানা হত—'ওরে, তোরা কে নিবি ভাই, আয় না, প্রাণ খুলে দিই।'

সন্ধে প্রায়। হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছেন ফুটপাত দিয়ে। হঠাৎ আকুলি বিকুলি কণ্ঠের নারীকান্নায় থমকে দাঁড়াতে হয়। হাওড়ার দূর অঞ্চল থেকে কলকাতা দেখে মুগ্ধ হতে

এসেছে ছাপোষা পরিবারটি। স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আছে তিনটি কাচ্চা-বাচ্চা। কলকাতার অভিজ্ঞ গাঁটকাটা গ্রামগঞ্জের অনভিজ্ঞকে মুগ্ধ-র বদলে স্তব্ধ করে ছাড়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্বামীটি উদাস নয়নে দূরের বাতিটির দিকে দৃষ্টি স্থির করেছে। একটা বাচ্চা মায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খিদের চোটে চেঁচাচ্ছে, তারস্বরে। পর্যটক একটুও সময় নষ্ট না করে, তড়িঘড়ি পাঁচ টাকা হাতে তুলে দিয়ে বললেন, —'মাইয়া, তড়িঘড়ি ছুট্টগুলানকে খাইতাইয়া আগে হাওড়া স্টেশনের ট্রেনটা ধইরা ফেলন ত বাপু। না অইলে রাইত্যের কলকাতায় আহাম্মোকি খেসারত লাগবা বড়, হুম্।'

ফুটপাত ছেড়ে রাস্তা ধরলেন। হরি সাহা মার্কেটের নীচে পৌঁছতেই এবার পড়তে হয় উটকো ঝামেলার খপ্পরে। আলু বিক্রেতা খরিদ্দারের কলার ধরে বাপান্ত করছে। একজনের বক্তব্য—'পয়সা না দিয়ে বলছে, দিয়েছি। বেটা চোর'! অপরজনের—'নিশ্চয়ই দিয়েছি। থলের নীচে স্যুট করে ঢুকিয়ে এখন বলছে, পাইনি। শালা বাটপাড় কোথাকার।'

সমস্যা জিইয়ে রাখার পাত্র আমাদের ইনি নন। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে এক টাকা ফেলে দিয়ে 'চোর-বাটপাড়ে'র মধ্যস্থতা করলেন। সিঁড়িতে উঠতে যাবেন, চোখের সামনে ওপর থেকে পা হড়কে নীচে গড়িয়ে পড়ল এক সহবাসিন্দা। দলা পাকিয়ে সে একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। আর কি দাঁড়িয়ে দেখতে পারেন? সঙ্গে সঙ্গে পাঁজাকোলা করে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে হাজির। চিকিৎসামূল্য দিতে হল এক টাকা। সেখান থেকে বেরুতে যাবেন, 'ঠং' করে রিকশাওয়ালার ঘণ্টাধ্বনিতে দাঁড়ালেন। মলিন মুখখানি দেখেই বুঝলেন অভুক্ত বেচারীর আজ সারাদিন কিছু রোজগার হয়নি। সঙ্গের পেশেন্টকে রিক্শায় তুলে, প্রাপ্য চার আনার (পঁচিশ পয়সা) বদলে পুরো এক টাকা দিয়ে বললেন, বাবুকে সাবধানে আমাদের বাসায় পৌঁছে দিও। অতিরিক্ত পয়সা ফেরতের চিন্তায় রিক্শাওলা থতমত খেলে, সোহাগ জড়ানো মৃদু ভর্ৎসনা ছুঁড়লেন—'ধুৎতরি! আরে, আগে তো বেটা পেট ভরিয়া খাতো দেহি ঐটা পয়সায়।'

এবার নিশ্চিন্তে পা বাড়ানো যেতে পারে। ধরলেন বাসার পথ। যদিও পকেটে এখনো আছে দু'টাকার গুরুভার। তা সে আর কি করা যাবে? আকাশে তো আর ছুঁড়ে দেওয়া যায় না। সিঁড়ি দিয়ে উঠে পূর্বোক্ত সহ-ভাড়াটিয়া 'পেশেন্ট'টির খোঁজ-খবর নিয়ে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় মোড় নিলেন। দরজার সামনে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে বাড়ির মেথরাণী। সদাশয় দর্শনে গলা চড়িয়ে বক্তব্য রাখে—'এ বাবু, কাঁহা গিয়া থা রে? মেরা সুখিয়া কো বহুৎ বোখার আয়া। কল্‌সে বিস্তারা মে শো গ্যয়া। ডাগ্‌দার দেখানা পড়েগা, দাওয়া-উয়া খরিদ করনা হোগা। দোঠো রূপাইয়া দে। মাহিনা মাহিনাসে কাট্‌কর চুক্তি করে লিবি, হাঁ। জলদি দে। এক ঘন্টা তক্ তুরাকে লিয়ে বৈঠা হ্যায়'।

দাবীর ভঙ্গিতে বোঝা মুশকিল, কে পাওনাদার কে দেনাদার। আসলে, সবরকম মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারটাই ছিল বড়ো মধুর এবং হৃদ্য।

যাই হোক, বাবুও তুরন্ত পকেট থেকে বার করে হাতে ফেলে দেখলেন সব মিলিয়ে দু টাকাই মোট আছে। তার থেকে সামান্য কিছু পকেটের মধ্যে ফের পাঠিয়ে বাকি সবটা মেথরানীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন—চাইর আনা কম দিলেম রে। ওইটা আজ রাত্তিরে খাইবার পয়সা। তুরে আর উস্তাদি কইরা মাস-কাবারি কাটান দিতে অইব না। সুখিয়ার ভাল হওনের লইগ্যা দিলেম। যা, ওউরে ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া ঠিক কইরা দেখাতো আগে।'

সুখিয়া ভাবের আবেগে সাষ্টাঙ্গ হতে গেলে হুঙ্কার শোনা যায়—'এ্যাইও, তোরে প্রণাম করতে কুন শালায় কইছেরে? দূর হইয়া যা সামনা থাকিয়া ছুঁচা কুনখানোর'। মেথরাণীকে প্রায় তাড়া করে নামলেন ফের নীচে। পকেটের পয়সা কটি উজাড় করে একটা দোকানে রুটি-তরকারী খাওয়া গেল পেট ভরে। এক ঘটি জল ঢক্ ঢক্ করে গলায় ঢেলে 'আঃ' বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। হলফ্ করে বলা যায়, এ স্বস্তির প্রকাশ যতটা না খাওয়ার তৃপ্তিতে, তার চাইতে অনেক বেশি শরীর হতে পয়সার ভারমুক্ত হওয়ার।

ফুরফুর করছে মেজাজ। মুক্ত বিহঙ্গের মত উঠে গিয়ে বসলেন টেবিলের সামনে। সারা রাত ধরে আগামী বইটির বাকি অংশ শেষ করার সুবর্ণ সময়। খাতাপত্র মেলে বাগিয়ে ধরলেন কলম। রাস্তা দিয়ে শেষ গাড়িটাও চলে গেছে। চারিদিকে নির্জন। নিস্তব্ধতা বিছিয়ে দিয়েছে তার সুনসান আসন। মহা শান্তির মধ্যে শুরু হলো লেখা। বইটির নাম—'প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি'।

আমরা বরাবর জেনে এসেছি, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। একই অর্থের অপর পিঠ হচ্ছে—প্রাচুর্যের গন্ধে মাতাল হয়ে ধেয়ে আসে হাজারো কিসিমের জীব। ভদ্রলোক এমনিতেই ছিলেন হাটখোলা স্বভাবের। তার ওপরে গুরুভার হয়ে এলো সচ্ছলতা। মানুষের একটা আন্তর স্বভাবই হলো, অপরের প্রাচুর্যকে কমিয়ে আনার গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া। এ উদাহরণ যেমন প্রকৃতির ক্ষেত্রে, তেমনি মেলে নিজ সমাজের ক্ষেত্রেও। আবার বাঙালির এটি একটি নিজস্ব ঘরানা। ছারপোকা, জোঁক প্রভৃতি জীব-জগৎ অপরের রক্ত চুষে নিজেদের হৃষ্টপুষ্ট করতে অভ্যস্ত হলেও নিজ জাতির ক্ষতিসাধনে আদৌ উৎসুক নয়। বাঙালির ক্ষেত্রে এর ঠিক উল্টো। সে নিজ জাতির মানুষকে আঁচড়ায়, কামড়ায়, ল্যাংমারে, চকিত-চমকে ক্যারাটে ঝাড়ে এবং সুযোগ পেলে ছিবড়ে করে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়।

রামনাথের জীবনেও নেমে এল তেমনি সর্বনাশা অভিশাপ। সাধারণ জীবনে তাঁর দ্বার ছিল সদাই উন্মুক্ত, সর্বসাধারণের জন্য। কোন অভুক্ত বা আশ্রয়প্রার্থী কোনও দিন তাঁর কাছ হতে বিমুখ হয়ে ফিরে যায় নি। অভুক্ত কেউ তাঁর কাছে গেলে তিনি পাঠিয়ে দিতেন হোটেলে, যেখানে তাঁর নামে শুধু অভুক্তদের খাওয়াবার জন্য আলাদা 'অ্যাকাউন্ট' ছিল। প্রয়োজন বুঝে হঠাৎ হঠাৎ দান-ধ্যান তো ছিলই, উপরন্তু ছিল নিয়মিত গোপন দান। গোপন—তার কারণ, জানালে প্রিয় ও পরিচিতজনেরা বকাঝকা শুরু করবে। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষটি তা এড়িয়ে যেতে চাইতেন। এগুলি

সাধারণত ছিল বিশেষ বিশেষ দুঃস্থ পরিবার ও ছোটখাটো ব্যবসাবাণিজ্য করে দাঁড়াতে চাওয়া মানুষজনকে। এছাড়া সুদূর গ্রামগঞ্জ থেকে শহরে পড়তে আসা বহু ছাত্রকে সাহায্য করতেন, খোরপোষ বাবদ। ওপার বাংলা থেকে আসা নিপীড়িত শরণার্থীদের ব্যাপক সাহায্য করেছেন। এই সমস্ত এবং সারাদিনের কাজে দোসর ছিল রমেশ সাহা নামে তাঁর এক পোষ্যপুত্র। সে আদতে ছিল খুদে এক ঘুরে বেড়ানো শিশু। 'ইকমিক কুকারে' রান্না করে রাখা থেকে ক্রমে অন্য অসংখ্য কাজে হয়ে উঠেছিল অপরিহার্য। এইভাবে মহাভবঘুরের আশ্রয় ও সাহচর্যে খুদে ভবঘুরে রমেশ তিল তিল করে বড় হয়। পরে তাঁরই দাক্ষিণ্যে চাকরি পায় 'স্মিথ' কোম্পানিতে। বাবা এবার ঐ হরি সাহা মার্কেটেরই দ্বিতলে আলাদা বাসার ব্যবস্থা করে ছেলের বিয়ে থা দিয়ে সংসারী করিয়ে তবে ক্ষান্ত হন। রমেশ সাহা আজও ওখানেই সংসার করছেন চুটিয়ে। এবং ঐ বাড়ির নীচেই চালাচ্ছেন হোটেল ও রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, রম্‌রম্‌ করে। ভাগ্যবান এই বিশেষ পুত্র ছাড়াও সারা পৃথিবী জুড়ে পাতানো ছিল পুত্র কন্যা। যাদের শিরে তাঁর উদার হস্ত দূর থেকেও ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত।

'হরি সাহা মার্কেট' টি ছিল উত্তর কলকাতার বিশালতম বাড়ি। নীচে ও উপরে মিলে কত যে ভাড়াটিয়া ছিল, তার ইয়ত্তা নেই। তিনি ছিলেন ঐ বাড়ির ভাড়াটিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। ফলে এই সংক্রান্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান কল্পে সকলেই তাঁর শরণাপন্ন হতেন। বিশ্বজোড়া কাজকর্মে খ্যাতনামা হওয়ার কারণে আশেপাশের মানুষজনও ছুটে আসত তাদের বিবাদ-বিসম্বাদে মধ্যস্থতা মানতে। তখনই ছুটে যেতেন শান্তির দূত। আবার বায়োকেমিক ও হোমিওপ্যাথি চর্চা বেশ কিছুটা করেছিলেন বলে গরিব-গুর্বো ও সাধারণ মানুষের কাছে ছিলেন তাদের প্রিয় ডাক্তারবাবু। এটিও মন্দ জমেনি। তবে লক্ষ্মী-কড়ি কিছু আসতো না, সবটাই দাতব্য।

কিন্তু এ সমস্তও বাইরের কথা। অন্দরের কথা হল আত্মীয়-পরিজন। তাঁর বিশাল নাম-যশ ও সচ্ছলতাকে কেন্দ্র করে একে একে ঘিরে ধরল নিকট ও দূর জ্ঞাতিজনেরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং দেশভাগের সামাজিক ও জাতিগত সমস্যা এ অবস্থাকে আরো ত্বরান্বিত করে দিল। ওপার বাংলা থেকে তাঁর কাছে পিল পিল করে আসতে থাকল আত্মীয়-পরিজন। কে নিকট, কে দূর, কাকে গ্রহণীয় কেই বা বর্জনীয়, এ সমস্তই বাছ-বিচারে তখন বসেননি আমাদের বিশ্বপথিক। ঠাঁই দিতে তিলমাত্র কুণ্ঠিত হননি শরণার্থীকে। ব্যথিত মানবাত্মা স্মরণ করেছে যে তাঁকে। হৃদয়ের ব্যাপ্তি যার বিশ্বজোড়া সে কি ফেরাতে পারে আশ্রয়প্রার্থীকে। দু'হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিলেন সকলকে। তখন তাঁর অবস্থা ঠিক যেন বানভাসির সময়কার বৃহৎ বনস্পতি। সকলেই ডালপালার খাঁজে-খোঁজে আশ্রয় নিতে ব্যস্ত। সাপ, ব্যাঙ, পশু ও মানুষে নেই কিছু পার্থক্য। তফাতের মধ্যে, জল কমে মাটি জেগে উঠলে অন্য সকল প্রাণীই নিজ নিজ আশ্রয় ও খাবারের সন্ধানে নেমে ছড়িয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে সকলেই পাকাপোক্ত ঠিকানা করে নিল 'রামনাথ' নামে আজব অথচ মহতী বৃক্ষটিকে। যেখানে শুধু আশ্রয়মাত্র নয়, খাবার, নিরাপত্তা ও আরো অন্য কিছু মিলবার সম্ভাবনা। তাঁকে

ঘিরে এই বিশাল আত্মীয়-পরিজনচক্রের মধ্যে এক-আধজন ছাড়া প্রায় সকলেই ছিল শুধু দোহন নীতিতে বিশ্বাসী। যার প্রবল ধাক্কায় নিঃশ্বাসের গতি ও ক্ষমতা দুটোই তিলে তিলে হারাচ্ছিলেন আমাদের বিশ্বাসবাবু। এদের মধ্যে যেমন মদোমাতাল হাজির, তেমনিই উদয় হয়েছিলেন এক অদ্ভুত গেরুয়াধারী ত্যাগী; যাঁর কাছে টাকা-পয়সা বিষবৎ পরিত্যাজ্য, কিন্তু পিলে চমকানো বাকি গ্রহণীয় সর্বনাশা বিষয়গুলি রামনাথকে সর্ব অর্থে হালকা করতে ছিল যথেষ্ট।

ক্রমে সব দিক হতে কেবল 'চাই-চাই'-এর বাড়ানো হাত অক্টোপাসের মত ছেঁকে ধরে চেপে বসল। উঁচু গাছে শকুনের পাল বসলে গাছটির কি হাল হয়, কেউ কেউ দেখেছেন নিশ্চয়ই। বিষাক্ত তীব্র অ্যাসিড যুক্ত বিষ্ঠার প্রকোপে সবুজ প্রাণের পাতাগুলি প্রথমে ছিট-ছিট ফ্যাকাশে সাদায় পরিণত হয়ে ক্রমে ঝরে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই নজরে আসে চারদিকের আর সব সবুজের মাঝে ন্যাড়া, শুকনো ও খটখটে একটি কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। রামনাথকেও ঠেলে দেওয়া হলো সেই পরিণতির দিকে। যিনি পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়ে গেলেন শুধু মৃত্যুঞ্জয়ী সবুজ সঙ্কেত তাদেরই কিছু জন মানুষটার'কাছ হতে সবরকম সাহায্যে নাদুস-নুদুস ও তেল চুকচুকে হয়ে তাঁর সামনে জ্বেলে ধরল জীবন গাড়িটিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার লাল 'সিগন্যাল্'।

অথচ কি নিদারুণ আশ্চর্যের ব্যাপার! অমায়িক রামনাথ 'না' কথাটুকু কারুকে বলতে পারেননি। সে অভ্যেস ছিলও না স্বভাবের মধ্যে। কেউ কখনো তাঁর কাছে চেয়ে ফিরে গেছে, সে রকম ঘটনা ঘটেনি। এমন কি, অভিযোগের ব্যাপারেও অবলম্বন করতেন অদ্ভুত নীরবতা। ভাবুন তো একবার অতলান্তিয় সহ্যের ক্ষমতা!

দেখতে দেখতে কেটে গেল বেশ কয়েকটা বছর। পর্যটকের লেখা বইগুলি অনেকেরই পড়া হ'য়ে গেছে। পুনর্মুদ্রণের চাহিদা আর তেমন করে জমছে না। প্রথম দিকের বিশাল কাটতির টাকাকড়ি একটুও সঞ্চয় করলেন না। করবেন বা কি ভাবে? সঞ্চয়' ব্যাপারটাতেই যে তাঁর আজন্ম বিতৃষ্ণা ছিল। 'ছেঁদো ভবিষ্যৎ' চিন্তা তাঁর বিদ্রোহী বর্তমান মনোজগতে তিলমাত্র আঁচড় বসাতে সক্ষম হয়নি। শুধু গরিব-দুঃখী ও আত্মীয়-স্বজনদের বিলিয়ে গেলেন, দুঃখহরণ। এভাবেই গলায় তুলে নিলেন নীলকণ্ঠের যন্ত্রণা।

এইসময় যখন 'অন্ধকারের আফ্রিকা' বইটিকে ঢেলে সাজাবেন চিন্তা-ভাবনা করছেন, ঠিক তখনই আর এক গভীরতম অন্ধকার তাঁর জীবনে উঁকি দেয়। গুটি গুটি পায়ে দু-দুটি অসুখ কামড় বসাল দেহে। ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ। নিজে চর্চা করা বায়োকেমিক চিকিৎসায় মাঝে মধ্যে একটু কমলেও আবার চেপে বসত, ভ্রূক্ষেপহীন শরীরে। এই অবস্থায় ক্লান্তিহীনভাবে লিখে চলেছেন 'বিলাত ভ্রমণ'। অন্তিম ইচ্ছার এই ফসলটি এক প্রকাশকের চালিয়াতিতে ধামা-চাপা পড়ে যায় চিরতরে। এমনও ঘটেছে—কোনও বই নিজ দায়িত্বে প্রকাশ করে বাঁধাতে দিয়েছেন, 'বুক বাইন্ডার' রাতারাতি সেই বইয়ের বেশ কিছু সংখ্যক নকল করে বাজারে ছেড়ে দিল গোপনে। প্রকৃত বইটি বাজার পেতে 'ল্যাজে-গোবরে' অবস্থা। এছাড়া তখন পর্যন্ত প্রকাশিত

অন্য বইগুলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকাশক সংখ্যাতত্ত্বের দোহাই পেড়ে ক্রমাগত শোনাতে থাকে হতাশার বাণী। প্রকাশনার ক্ষেত্রে 'লেখক না মেরে বড়লোক হওয়া যায় না' এই দুষ্ট প্রবাদটি তখন বইপাড়ায় বিভিন্নভাবে ও ভঙ্গিতে ঘুরত ফিরত। কখনও উল্লাসের চাপা স্বরে, কখনও বা দীর্ঘশ্বাসের মোচড়ানো সুরে।

কিন্তু, এক্ষেত্রেও কারুর প্রতি রামনাথের ছিল না কোনও রকম অভিযোগ বা অনুযোগ। ফিরে আসতেন নীরবে। চেয়ারে বসে টেবিলের ওপরে দুটি কনুই ঠেকিয়ে দু'হাতে কপাল চেপে ধরে চিন্তা করতেন—দুনিয়ার হাল-হকিকত!

এটা আমাদের কতখানি লজ্জায় বিষয়, যে এমন একজন দেশ-বৎসল দুঃখব্রতী পর্যটক তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়টা শুধু অভাব ও ব্যাধির মধ্যে কাটিয়ে গেলেন সম্পূর্ণ নীরবে।

হাতী পোষার মতো বিশাল ব্যয়-নির্বাহের দুশ্চিন্তায় এবং রোগের প্রকোপে ক্রমে ভেঙে পড়া শুরু হলো শারীরিকভাবে। কেবল ধরে রেখেছেন মনের জোরটুকু, চেষ্টা করে। শেষের দিকে, ভাঙা শরীর নিয়েই জোর করে বেরিয়ে পড়তেন, ব্যাগে নিয়ে নিজস্ব বই। পুস্তক বিক্রেতাদের দরজায় দরজায়। যেন, শেষ রাতে ট্রেন এসে পড়ায় স্টেশনের হকার ঘুম জড়ানো কণ্ঠে ধীর লয়ে হেঁকে চলেছে—চাই-ই-ই চা-আ-আ-আ...।

অনেক যন্ত্রণার মধ্যেও এসময় আর একটি কাজের কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। জনসাধারণ যাতে দেশ ভ্রমণের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারে, সে উদ্দেশ্যে সত্যিকারের উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত করার জন্যে স্থাপন করলেন 'সারা ভারত পর্যটন সমিতি'। এর মাসিক মুখপত্র'র নাম 'পর্যটক'। যার সম্পাদক হিসেবেও লেখনী ধারণ করেছিলেন বিরামহীনভাবে। লক্ষ্য একটাই—পর্যটনের মাধ্যমে দেশ ও জগৎ সম্বন্ধে মানুষকে ওয়াকিবহাল ও উৎসাহিত করা। দেশ-বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে অনেকেই তথ্যের জন্য ব্যাকুল চিত্তে শরণাপন্ন হলে, তিনি যেন তৎক্ষণাৎ কোলে তুলে নিতেন। শত কষ্টেও স্বভাব কল্পতরু মানুষটি সবরকম সাহায্যের ডালি বাড়িয়ে ধরতেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভ্রমণার্থীরা সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত হয়ে চতুর্গুণ অশ্বশক্তির টগ্‌বগে স্ফূর্তিতে বেরিয়ে পড়ত। এমনই ছিল তাঁর সাহচর্যগুণ।

অভাব-অনটন ও ব্যাধি এবার একযোগে কুরে কুরে খাচ্ছে। আয়ের সঙ্কোচন হেতু দুশ্চিন্তা, অসুস্থতা ও সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম দ্রুত হারে ঘটাচ্ছে শারীরিক ক্ষয়। তবু, শত কষ্টেও কর্তব্য-কর্মে ছিল না এতটুকু গাফিলতি। নিজে আজীবন অকৃতদার থাকলেও সংসারের আয়তন তখন রীতিমত বিরাট। অথচ একজনকেও জানতে দেন নি, কি নিদারুণ আত্ম নিগ্রহের মধ্য দিয়ে টেনে চলেছেন সংসারের ঘানি। অবশ্য কেউ তা জানতে আগ্রহীমাত্র ছিল না। ফলে, এগিয়ে এসে সামান্যতম দায়-দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার প্রশ্নও আসেনি। সকলেই তখন পাওয়ার সুখে বিভোর। বিস্ময়ের ব্যাপার, এত সীমাহীন গ্লানির মধ্যেও মানুষ রামনাথের প্রদীপখানি ছিল অমলিন। সদালাপী মেজাজ ও ঠোঁটের কোণে অমায়িক হাসি লেগেই থাকত।

এরই মধ্যে খবর এল ভারত সরকারের স্বীকৃতি। দুঃস্থ লেখক হিসেবে মাসিক বৃত্তির। প্রতি মাসে ৭৫ ০০ টাকা। শেষ দুবছর এটি পেয়েছিলেন। বিশাল প্রয়োজন-সিন্ধুতে বিন্দু হলেও প্রাপ্তি যা হোক।

এই পাওয়ার মাঝেই একে একে আসতে থাকে হারানো সংবাদ। পর পর দুই প্রিয়তম ভাইপোর মৃত্যুতে মর্মাহত হন। জরাজীর্ণ দেহে ও ক্রমাগত ধাক্কা খাওয়া মনে শেষ আঘাত আসে ১৩ই অক্টোবর, ১৯৫৫ তে। খবর পান—একমাত্র ভাই (বড়) কৃপানাথ মারা গেছে আগের দিন। বাবা-মায়ের কোল বুঝবার সুযোগ হয় নি কখনও। আবাল্য যাঁর ঘেরাটোপ স্নেহে ও শুভেচ্ছায় ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে আজ হতে পেরেছেন ভূপর্যটক রামনাথ, সেই প্রিয়তম দাদাকে হারিয়ে একেবারে ধ্বসে পড়লেন রাতারাতি। ক'দিন চুপচাপ ঘরে বসে থেকে শ্রাদ্ধ-শান্তি ইত্যাদি সেরে বের হলেন। সঙ্গে এই প্রথম নিলেন লাঠি। পরিচিত জনেরা সেই কালো ছায়াঘন মুখ দেখে চমকে উঠলেন। এ কোন রামনাথ!

শোনা যায়, এই পৃথিবীর কৃতী সন্তানেরা শেষ যাত্রার আগে তাঁদের মহাকালের ডাক শুনতে পেয়ে কোনও বিশেষ ভাবে বা ভঙ্গিতে সে কথা প্রকাশ করে যান। শেষের দিকের কর্মধারা অনুসরণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, আমাদের ইনিও সে মহা-আবাহন পেয়েছিলেন, নিশ্চিতভাবে। কেবল তফাত—কারুকে টেরটি পেতে দেননি, আগেভাগে। তার কারণ, সাধারণত নিজের জন্য অপরকে সামান্যতম বিব্রত বা চিন্তিত করার পক্ষপাতি ছিলেন না। এমন স্বভাব নির্বিরোধী, এমনই আপনাতে আপনি ফোটা, আপনি ঝরা মানুষ।

শরতের কাশফুল তার ভেলভেট-চিকণ দেহে ধরিয়ে দিয়েছে শির-শিরানির দোলা। এসে গেছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। ঢাকের চামড়ায় চটপট্ সুরে ছড়ির বোল উঠেছে....ঢ্যাম্ কুড়-কুড়...।

মহা ডাকহরকরার হাত থেকে কালো খামটি নেওয়ার অপেক্ষা না করে ঝটিতি সেরে নিতে থাকলেন বাকি কাজগুলি। যার যেখানে যা পাওনা-গণ্ডা ছিল সমস্ত চুক্তি করে বিশাল সংসারটি গড়িয়ে যেতে পরবর্তী ব্যবস্থার খুঁটি গাড়লেন, ছোটোখাটো অথচ দৃঢ় কয়েকটি পদক্ষেপে। প্রকাশিত বইগুলি থেকে রয়ালটি বাবদ অর্থ কোন কোন ভাইপো বা ভাইপো-বৌ পাবে তার ক্রম অনুযায়ী দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। 'আর পারছি না বাপু'—এই কথা বলে, সাধ্যমত এককালীন কিছু দিয়ে, নিয়মিত সাহায্যগুলি একেবারে বন্ধ করলেন। 'ঠাকুর থার্কাব কতক্ষণ, ঠাকুর যাবি বিসর্জন' ঢাকির বাজনার বোলে এসে গেল বিজয়া দশমী।

এবই ফাঁকে, জীবনের শেষ প্রান্তে একটি সুখবর মিলল। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের তখন খুবই হাঁকডাক। কলকাতার শ্রেষ্ঠ কটি প্রকাশনা সংস্থার মধ্যে একটি। অনেক নামী-দামী সাহিত্যিকের বই ছেপে থাকেন সংস্থা হতে। তাঁদের একান্ত সৎ প্রচেষ্টায় সমগ্র পাঁচটি নির্বাচিত বই-এর (নামগুলি আগেই উল্লিখিত) সঙ্কলন 'রামনাথ গ্রন্থাবলী' সদ্য প্রকাশিত। ১৯৫৫-এর ২৯শে অক্টোবর বসুমতী অফিসে

পৌঁছে, লেখক-কপি হিসাবে বইটি স্বয়ং নিয়ে আসেন। এহেন স্বনামধন্য প্রকাশক সংস্থা থেকে তাঁর বই সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ সসম্মানে বের হওয়ার আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন। পরিচিত যার সঙ্গে দেখা হয়, একেবারে শিশুর আনন্দে দেখাতে থাকেন ঝকমকে নতুন বইটি।

৩০শে অক্টোবর। দিনটি ছিল লক্ষ্মীপূজার। মূর্তিপূজার কট্টর বিরোধী হলেও বাড়ির মেয়েরা তো মানে। সেখানে নানা আচার-আয়োজনে প্রস্তুতি চলছে নারায়ণ পত্নীর আবাহন। পুরুষ শাসিত বাইরের দুনিয়ায় কঠোর নীতি-বাগীশ হলেও মেয়েদের জগতে প্রবেশ সাধারণত এড়িয়ে চলতেন। 'যা করতে চায় করুক ছাই' ভঙ্গিতে অন্দরমহলের জমপেস্ চার না ঘেঁটে বেরিয়ে পড়লেন। সারা দুপুর ধরে বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত সেরে ক্লান্ত দেহে শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিয়ে সামান্য বিশ্রামে ব্যস্ত। সময় সন্ধে। মেয়ে মহলে তখন ধূপ-ধুনো কাঁসর ঘণ্টা সহযোগে চলছে রীতিমত লক্ষ্মীবন্দনা। এমন সময়, ঐ বাসাবাড়ির অপর বাসিন্দা দীর্ঘকালের বন্ধু সাহিত্যিক-গবেষক যোগেশ বাগল ঘরে প্রবেশ-মাত্র প্রায় লাফিয়ে উঠে বিছানায় বসলেন। যথারীতি সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থাবলীটি দেখিয়ে কলকল করে উঠলেন, 'যোগেশবাবু, আমার জীবন ধন্য। বসুমতী সাহিত্য মন্দির আমার কয়েকখানি বই নিয়ে এই রামনাথ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন। কত বিখ্যাত বিখ্যাত সাহিত্যিকের বই তাঁরা বার করেন। এ শ্রেণীতে তাঁরা আমাকে ফেলেছেন। আমি সাহিত্যিক নই, আমার জীবনে আর কি কাম্য থাকতে পারে।' সামান্য আর কিছু প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরেই মুহূর্তে রামনাথ পরিণত হলেন ঝাঁ-চক্চক্ বিশ্বপথিক-এ। শুরু হয়ে গেল বিলাত তথা দেশ-বিদেশের অনন্য সাধারণ ভ্রমণ কাহিনী। ঘরের আলো যেন অকস্মাৎ মায়াবী হয়ে যায় কোনও এক অচিনপুরের যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায়। ছোট্ট এই গৃহ পরিবেশ ততক্ষণে পৌঁছে গেছে বৃহত্তর ঐন্দ্রজালিক জগতের বর্ণালি আঙিনায়। এক একটি দেশ এগিয়ে আসে তাদের মানুষ, সমাজ, পরিবেশ, ও আচার-ব্যবহারের বিচিত্র ডালি নিয়ে। আবার মিলিয়ে যায়। ভূগোলকের গোলকধাঁধা আপন অক্ষে ঘুরতে থাকে, মনের তারে কাঁপন তুলে। বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই বুকে তখন বেজে চলেছে শত শত অশ্বক্ষুরের 'টগবগ্-টগবগ্' ধ্বনি। সেই ধ্বনি সুষমার মায়াজালে কখন দুজনেই হয়ে যায় আত্মহারা।

জীবনের শেষ দিনটির এই অমূল্য সাক্ষাৎকারে সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'একজন ট্যুরিস্টের প্রধান আদর্শ হওয়া উচিত 'Non saving' বা অসঞ্চয়। এই আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটলে ট্যুরিস্টের ধর্ম নষ্ট হবে।'' 'Non saving' বা সঞ্চয়ের অ-প্রবৃত্তি প্রত্যেক ভূপর্যটকের ধর্ম হওয়া উচিত। তবেই তাহার উচ্চাশা সফল হবে। আপনি যেসব অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন, তা বর্ণনা করে প্রচুর অর্থ রোজগার করতে পারেন। কিন্তু একবার যদি সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জেগে উঠল, তখনই তার মৃত্যু। কেননা ভূপর্যটকের স্বাভাবিকী মনোবৃত্তির পদে পদে ঘটবে স্খলন।'

অত্যন্ত উল্লাসের সঙ্গে পথিক তাঁর পথের সঠিক হদিস দিয়ে গেলেন,

'যোগেশবাবু—আমি পদ ও অর্থের সঞ্চয় নিয়ে দেশে দেশে ঘুরিনি, তা ভালভাবেই জানেন। পকেট সম্পূর্ণ গড়ের মাঠ অবস্থায় পিঠে একটা ঝোলা ও হাতে একখানা সাইকেল নিয়ে দুনিয়ার পথে পথে বেরিয়ে পড়েছি। প্রায় এক দশক পরে বিশ্ব পরিক্রমা সেরে যখন দেশে ফিরি, তখনও নিঃসম্বল'।

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে যোগ করলেন—'আরো পনেরটা বছর চাবুক ঘুরিয়ে জীবন সায়াহ্নে দেখুন...।' হাতের তালু দুটি সামনে উল্টে ধরে সেদিন সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছিলেন, যাত্রা শুরু ও অন্তের মতো আজও সেই একই অলক্ষ্মীর দশা। যদিও দিনটি ছিল শুভ লক্ষ্মীপূজার। এরপরই হঠাৎ কি ভেবে দমকা অট্টহাসিতে বললেন—'ভো কাট্টা...'।

শ্বাসরোধ করা পরিবেশে হাসির অনুরণন মিলিয়ে গেলেও সেদিনের প্রাণ নিঙড়ানো শেষ শব্দটি আজও আমাদের চাবুক মারে। কেবলই মনে হয়, যুগে যুগে মহৎপ্রাণ মানুষগুলি বোধ হয় এভাবেই নিজেদের নিঃশেষ করে। আমরা কিই বা করতে পারি?

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। মেয়ে মহলে পুজো-আচ্চার ব্যাপার মিটে গেছে। মানুষটা পুজো ব্যাপারটাই যেহেতু মানেন না, সেহেতু প্রসাদ দিতে এসে সিংহগর্জনের সামনে পড়ে নাস্তানাবুদ হতে কেউই বোকামি করেনি। বদলে, তাঁর অতি প্রিয় বিলাসভোজন খিচুড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। পরিমাণে সেদিন একটু বেশিই খেলেন, মহাতৃপ্ত হয়ে। আর সেটাই হলো কাল। প্রথমে 'গ্যাস' বৃদ্ধি হয়ে পরে ধাক্কা দেয় রক্তচাপে। অন্যদিন রমেশের শিশুপুত্রটি দাদুর সঙ্গে এক বিছানায় শুলেও ঘটনাক্রমে সেই রাতে পৃথিবীর একক পথিক ছিলেন ঘরটির নিঃসঙ্গ বাসিন্দা। নিস্তব্ধ কালো রাত্রির বুকে ঢং ঢং শব্দে দেওয়াল ঘড়ি তার কর্তব্য করে জানিয়ে দিল, সময় বারোটা। এ বাড়ির প্রাত্যহিক নিয়ম অনুসারে ঠিক এই সময় দপ্ করে নিভে গেল ইলেকট্রিক আলো। শুরু হয় ইংরেজি তারিখ ১লা নভেম্বর, ১৯৫৫ খৃটাব্দ। নভেম্বরের শুরু থেকেই মহান জীবন প্রদীপটি দ্রুত গতি নিল 'না'-এর দিকে। অসহ্য কষ্টের মধ্যেও হাতড়ে বেড়িয়েছিলেন নিজস্ব হোমিওপ্যাথি বাক্সটিকে খুঁজে বার করতে। ভূ-সন্ধানী বাক্সটিকে ঠিক নামাতে পেরেছিলেন। অতো কষ্টের মধ্যেও সম্পূর্ণ অন্ধকারে নির্দিষ্ট ওষুধটি তুলে নিয়ে 'কর্কের' ছিপিটিও খুলে ফেলেছিলেন। অর্থাৎ জীবনের চরম মুহূর্তেও লক্ষ্যভেদ-এ সমর্থ। কেবল মুখে দিতে পেরেছিলেন কি না, জানা গেল না। বিছানাময় 'গ্লোবিউল' দানা ছড়িয়ে থাকার মাঝে লুটিয়ে পড়লেন। রাত্রি তখন সাড়ে তিনটা। দেদীপ্যমান প্রাণবায়ু সম্ভবত অন্য কোনও মহা পর্যটনের লক্ষ্যে ছুটে চলল। মেরুণরঙা বেড কভারের উপর শায়িত দেহটির চারপাশে ছড়ানো ওষুধের কণাগুলি দেখে মনে হচ্ছিল বীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শেষ মুহূর্তে যেন অসংখ্য ফুলকণার অর্ঘ্য সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আরও কত শত মানুষের একান্ত আশা ছিল, ভূপর্যটককে একদিন না একদিন তাঁদের মধ্যে পাবেন। যিনি আসর সাজিয়ে জমপেস্ ভঙ্গিতে শুরু করবেন—

'তারপর বুঝলে তো, নিজেদের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে পায়ের 'টো'-এ ভর করে এগুচ্ছি। দিনেই সূর্যের আলো ঢোকে না, তায় রাত্রে! সে ভয়ঙ্কর অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে কোথা থেকে আসবে আলো?'

শুরু আর হলো কৈ? হরিধ্বনির মধ্য দিয়ে শবদেহ যখন কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে পৌঁছল, সূর্য তখন অস্তগামী। পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, যোগেশ বাগল, প্রমুখ সাহিত্যিক, অগণিত গুণমুগ্ধ, বন্ধুবান্ধব, ও আত্মীয়স্বজনের দীর্ঘশ্বাসের মাঝে মুখাগ্নি করলেন ভাইপো বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী প্রিয়লতা দেবী। আগুনের দাউ দাউ শিখা দেখে সকলের মনে পড়ে, জীবন্ত মানুষটাও যে এমনই প্রজ্বলিত তেজে সদা-সর্বদা উদ্ভাসিত ছিলেন এবং অপরের মধ্যেও অনুপ্রাণিত করতেন অগ্নিতেজ। আর ছিল বলেই প্রমাণ করতে পেরেছিলেন—স্বপ্ন থাকলে, সাধনা থাকলে, একটা মানুষ লক্ষ্য স্থির রেখে নিরন্তর চেষ্টা ও কল্পনাশক্তির সাহায্যে একেবারে সামান্য অবস্থা থেকে সাফল্যের হিমালয় শিখরে পৌঁছতে পারে।

এইভাবে সারাটা জীবন কর্মকে যোগ হিসাবে গ্রহণ করে হাজার হাজার তরুণের বুকে মৃদুমন্দ বাতাস নয়, কালবৈশাখীর ঝড় তুলে চলে গেলেন বাঙলা মায়ের দামাল ছেলে—ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস। এমন ত্যাগী মানুষটিই তো তাঁর "TOUR ROUND THE WORLD WITHOUT MONEY"—গ্রন্থটির উৎসর্গপত্রে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন—'Dedicated to those persons who do not care for name and fame and help the needy in exchange of nothing'.

সকলকে আলোর হদিস দিয়ে নিজে চলে গেলেন কোন অজানা এক অন্ধকার লোকে।

